দিব্যামৃতবর্ষী কথামৃত

অহীভূষণ বসু

মৌসুমী সাহিত্য মন্দির
১৫ বি, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৫৭

প্রকাশক :
প্রশান্ত তালুকদার

প্রচ্ছদ :
রণজিৎ হীরা

মুদ্রক :
দি নিউ কমলা প্রেস
প্রো:   এস. সি. ঘোষ
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বনফুলে গাঁথা, বর্ণালি এ বর্ণমালা,
অর্ঘ্য করে দিলাম তুলে,
অনন্তশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর
চরণ কমলে ।

প্রণত অকৃতী সন্তান
অ. ভূ. ব

সূচীপত্র

১	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠের নিয়ম ও তাৎপর্য	...	১
২	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের নামকরণ ও তাৎপর্য	...	২
৩	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের গঠন, রূপ ও ভাষা	...	৫
৪	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের বৈশিষ্ট্য	...	১০
৫	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অমৃত কেন	...	২১
৬	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে মাষ্টারমশায় (শ্রীম)	...	৩৪
৭	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদা দেবী	...	৩৮
৮	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে প্রার্থনা	...	৪৫
৯	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ভক্তি ও ভক্ত	...	৫২
১০	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ত্যাগ	...	৭২
১১	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে সংসার ও সংসারীর কর্তব্য	...	৮৪
১২	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বিশ্বাস।	...	১০৪
১৩	**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে মনীষী মিলন**	...	**১১৬**
(ক)	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২০
(খ)	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন	...	১২৩
(গ)	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীদয়ানন্দ সরস্বতী	...	১৩১
(ঘ)	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়	...	১৩৫
(ঙ)	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত শশধর	...	১৪৭
(চ)	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র	...	১৫৩
১৪।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	...	১৭১
১৫।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট	...	১৮৩
১৬।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব	...	১৮৭
১৭।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে কী পেলাম	...	১৯০
১৮।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কে তিনি	...	১৯৬
১৯।	ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানুষী বিগ্রহ	...	২০২

নিবেদ্যনিবন্ধ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এ কালের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সাহিত্য ও জীবনী সাহিত্য। বইয়ের বাজারে সবচেয়ে বেশী বিক্রী। তেমনি কথামৃতের পাঠ আলোচনা খুবই দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে, শ্রীম ওরফে মাষ্টারমশায়কে বলেছিলেন, "তিনি জগতের আদর্শ, তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধনা আর অন্য সাধনা দরকার হইলে তিনিই করাইয়া লইবেন।"

চারদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলন দেখে মনে হয়, বুঝিবা তিনিই স্ব-ইচ্ছায় করিয়ে নিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত, তাঁর ভাবধারাও অনন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সেই অনন্ত ভাব রাশির কিছু অংশ মাত্র। মাষ্টারমশায় যেমন বলতেন, আমি আর কি করি, কেউ তৃষ্ণার্ত হ'য়ে এলে, রামকৃষ্ণ সমুদ্র থেকে তোলা জল পান করাই। আমি ঘড়া করে তুলে রেখেছি, শ্রান্তি, ক্লান্তি অপনোদনের জন্য। এই জল শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। যত চিন্তা করা যাবে পড়া যাবে মঙ্গল। শ্রীমদ্-ভাগবতগীতা, উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারতের পাশে নিজের স্থান করে নিয়েছেন কথামৃত। এ গ্রন্থের আবেদন ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর দূর দূর দেশের লোকের হৃদয় স্পর্শ করেছে। এবা সাহিত্য। ভগবান লাভের রাজপথ। সংসারে নিত্য দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্ত থাকার চাবিকাঠি। মৃত্যু ভয় থাকে না। রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা শ্রীম, মাষ্টারমশায় এই সাক্ষ্য বহন করছেন স্বীয় জীবনে। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ভগবান লাভ করেছেন। বর্তমান লেখকও এর ব্যতিক্রম নয়।

এক মহা দুর্দিনে ঝড়ের পাতার মত-ই বেলুড় মঠে উড়ে গিয়ে পড়েছিলাম, ইং ১৯৪৮ সাল। মনে আছে মায়ের ঘাট দিয়ে উঠেছিলাম। অঘটনের মতই সেই ক্রান্তি লগ্নে শ্রদ্ধেয় স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের সাথে দেখা হয়েছিল। একদিন আত্মস্থানন্দজী আমার সহপাঠী ছিলেন। পূর্বাশ্রমের নাম সত্যকৃষ্ণ, মহারাজ বর্তমানে বেলুড় মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক। দিনাজপুর জিলা স্কুলে একই সাথে ক্লাস ফোর-এ ভর্তি হয়েছিলাম। খুবই বিস্ময়বোধ করেছিলেন পূজনীয় সত্যকৃষ্ণ মহারাজ। কতকাল পর দেখা, দু-একটি কথার পর আমার মনের কথা খুলে বললাম। বেশী কথা ব্যয় না করে হাত ধরে নিয়ে গেলেন

পুরানো মঠ বাড়ীর গঙ্গার দিকের বারান্দায়; সেখানে একজন বৃদ্ধ তাপস বসেছিলেন, অপূর্ব দেহকান্তি। দুজনেই প্রণাম করলাম। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পূজনীয় সত্যকৃষ্ণ মহারাজ বললেন, "মহারাজ আমার বন্ধু··· । ওকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। আমরা একসাথে দিনাজপুর জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। ওর অনেক কথা আছে। আপনাকে দিয়ে গেলাম।" এক গাল হেঁসে মহাতাপস বললেন—"তাই নাকি? তোমার বন্ধু, তবে তো আমাদের লোক। এখানেও নাম লিখিয়ে নাও, কি বলো, বেশ বেশ।" পূজনীয় সত্যকৃষ্ণ মহারাজ নিজের কাজে চলে গেলেন। তারপর সুদীর্ঘ দু-বছর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের পদপ্রান্তে বসে কথামৃত পান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই দুর্লভ দিনগুলির সবাক চিত্র মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছি অতি যত্নে। হঠাৎই একদিন ৩০শে নভেম্বর ১৯৫০, ১৪নং হ্যারিসন রোডে (বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) এক ভক্তের বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করতে আদেশ করেন। অনেক আপত্তি করেছিলাম, তিনি কান না দিয়ে কেবল বলেছিলেন—"তুমি করবে, ত্রিশ বৎসর পর বুঝবে।" আমি—কেউ শুনবে না আমার কথা। মহারাজ :—"কেউ শুনুক আর নাই শুনুক আমাদের মা, ঠাকুর, স্বামীজী শুনবেনই শুনবেন—যাও আমি বলছি।" সেই বাণী আজও শুনতে পাই। সেই আশীর্বাদ মাথায় রেখে ৩৫ বৎসর পাঠ আলোচনা তাঁর ইচ্ছায় চালিয়ে যাচ্ছি। আমার দীক্ষা হয় ১৯৭০ সালে বেলুড় মঠের সদ্য প্রয়াত দশম অধ্যক্ষ পরম কারুণিক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে। দীক্ষার পর তাঁকে বিস্তারিত সকল ঘটনা জানাই। তিনি যাৎপর নাই প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, "হ্যাঁ তুমি করবে, তবে যখনই পাঠ করবে চুম্বক চুম্বক অংশ, কিন্তু নিজেরা আলোচনা করবে বেশী।" এর সাথে দু-চারটি তাঁর কথা তুলে দিচ্ছি,—"এমন কোন আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নাই যার সদুত্তর কথামৃতে মিলবে না। শ্রীশ্রী ঠাকুরের মানস সন্তান, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একদিন তাঁর পাদমূলে উপবিষ্ট উপদেশ প্রার্থী সাধুদের বলেছিলেন তিনি তাঁদের এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন—"প্রতিদিন কথামৃত পড়ো।" বাস্তবিক-পক্ষে কেউ যদি ধারাবাহিক ভাবে এই উপদেশ অনুসরণ করে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তার, গোটা ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটবে এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আয়ত্তে আসবে।

সযত্নে রক্ষিত আলোচনা অংশ বিশেষ এই প্রকাশনের জন্য কথা। মহা-

পুরুষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর অমোঘ আশীর্বাদেই, ছত্রিশ বছর পর হঠাৎ-ই এই প্রেরণা অনুভব করছি।

স্বীকার করতে বাধা নেই, এ লেখা কোন মৌলিক রচনা নয়, বা বড় রকমের কোন সাহিত্য সৃষ্টিও না। নিছক গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা। এই পূজার নৈবেদ্য সাজাতে আমি জান্তে ও অজান্তে বহু বিদগ্ধ, জ্ঞানী-গুণীজনের ভাব, ভাষা, ধ্যান ধারণা অকৃপণ ভাবে গ্রহণ করেছি, তাদের সকলের কাছে অকুণ্ঠ হৃদয়ে স্বীকার করছি মহতী ঋণ, কৃতজ্ঞতা, যা কোন কথা দিয়ে পরিশোধ অসম্ভব।

একাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন, শ্রীমতীতৃপ্তি ব্যানার্জ্জী ও শ্রীমতী মনীষা-ব্যার্বত্তা। এদের ঋণ উল্লেখযোগ্য। এরা প্রতিলিপি তৈরী করে দিয়েছেন অনেক কষ্ট স্বীকার করে। আমার গুরু বোন এরা, এদেরকে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এরা ছাড়া আরো অনেকে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন যেমন শ্রদ্ধেয় শ্রীরমাপতি বসু মহাশয়, মূল পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ পড়ে বিভিন্ন ব্যাপারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে, প্রকাশক জুটিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বের কাজ করেছেন, তার কাছে ঋণ তো রইলই, তবু ধন্যবাদ একটা দিলাম।

রণজিৎ দত্ত, রাজেন ব্যার্বত্তা ও সুভাষ সাহা, এদের সাহায্য ভোলবার নয়। দৌড় ঝাঁপ করা, প্রুফ পড়া ইত্যাদি এরাই করেছে।

এদের সাথে আমার হৃদ্যতার কথা মনে ক'রে,—ধন্যবাদ দেওয়া-টা নিছক লৌকিকতা মনে করছি। তাই সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ নয়। ওরা গুরুভাই, ওদের সার্বিক মঙ্গল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি।

রাজেন, প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীরণজিৎ হীরাকে জোগাড় করে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে, তাকে আর একটা ধন্যবাদ না দিলে নয়। শিল্পীকে প্রাণের থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আরটা ঠাকুর করবেন। প্রেসের কর্মীদের সকলকে আমার অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

যিনি এই কর্মের উৎস ও প্রাণশক্তি, বেলুড় মঠের অষ্টম অধ্যক্ষ পরম পূজ্য-পাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী, তাঁকে বন্দনা করছি, বলছি—"হে মহাতাপস বন্দি তোমায়। দেখুন আপনার অমোঘ আশীর্বাদ শব্দের আলোতে পাখা মেলতে চলেছে।" এর সাথে স্মরণ করছি মদীয় আচার্যদেব বেলুড় মঠের সদ্য প্রয়াত দশম অধ্যক্ষ পরমারাধ্য শ্রীমৎস্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কৃপা ও আশীর্বাদের কথা—আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, তাঁর ইচ্ছাতে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা রূপ পাচ্ছে।

পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কথা ইতিপূর্বে বলেছি তাঁর ঋণ পরিশোধ করা যায় না। ঋণ পরিশোধের কথা বলতে গিয়ে বেশী করে ঋণী বোধ করছি। আমি তো সত্য বলতে কি, তাঁর গৌরবে সর্বদাই গৌরবান্বিত বোধ করি। আজ তিনি বেলুড় মঠের সহ সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করে আছেন, আমি তাঁকে কেবল কৃতজ্ঞতার প্রণাম জানিয়ে ক্ষান্ত থাকছি। একেই বোধ হয় প্রকৃত Friend, Philospher, Guide বলা হয়। এমন বন্ধু জন্ম জন্মান্তরের কাম্য।

উপসংহারে, ধূলা অবলুণ্ঠিত মস্তকে সাষ্টাঙ্গ জানাচ্ছি বেলুড় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণ কমলে। তিনি এই অতি সামান্য প্রকাশন চেষ্টার সার্বিক সাফল্য কামনা করে অতি সুন্দর একটি আশীষপত্র দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। সমৃদ্ধশালী করেছেন বইটিকে। পত্রটি বইয়ের একটি গৌরবময় অংশ হয়ে রইল।

দিব্যামৃতবর্ষী কথামৃত প্রকাশের একটাই উদ্দেশ্য, ভাগবৎগীতা যেমন বলেছেন,

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তি চ ॥"

(গীতা ১০।৯)

সব মিলে কবির ভাষায় বলি, "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরের" মত পবিত্র একটি প্রকাশন মাত্র।

অ. ভূ. ব
(লেখক)

উপক্রমণিকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে শুনতে বা আলোচনা করতে বসে আমাদের কতগুলি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। নিত্য মনে রাখতে হবে, বর্ত্তমানে চারদিকে ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবনে যে আধ্যাত্মিক অবক্ষয়, এই অবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবন বা তাঁর প্রাণদ শিক্ষা ও উপদেশ যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। মানুষের তথা পৃথিবীর এই মহা-দুর্দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও তাঁর প্রদর্শিত পথ-ই যে একমাত্র বাঁচার পথ দেশ বিদেশের বিশিষ্ট চিন্তানায়কেরা ক্রমেই বুঝতে পারছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার দরকার সত্য, কিন্তু এই প্রচার যেন সঠিক পথে হয়, যেন কেবলই হুজুগ না হয়। যেন মন গড়া কোন কিছু করে না বসি, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে অপব্যবহার না করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবন অনুধ্যান। আমরা শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণদেবকে দুই-ভাবে নিতে পারি—(১) ব্যক্তিকে বা (২) ভাবকে। আমাদের পক্ষে ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধরা-ই সহজ। ভাব-আশ্রয় করা একটু কঠিন। তবে যার যেমন পুঁজি ও রুচি। স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, অনুধ্যান করাই ভাল। তারপর ভুলত্রুটি থাকে ঠাকুর নিজে যেমন বলেছেন— "ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করলে তিনি নিজে-ই জানিয়ে দেবেন তিনি কেমন।"

মনটিকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে বা ভাবে তন্ময় করতে চেষ্টা করতে হবে। একটি প্রার্থনার ভাব সর্ব্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে, জাগ প্রদীপের মত। কেবল পড়া বা শোনার সময় নয়, সর্বদা।

আমরা অনেক সময়-ই আড়ম্বরের দ্বারা হুজুগের দ্বারা মূল উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ সাধনাকে ঢেকে রাখি, চাপা দিই। এইটি যে আমাদের মনের দৈন্য-ভাব তা বুঝি না। কিছুদিন বেশ পাঠ করলাম, পাঠ শুনলাম, আবার ছেড়ে দিলাম সামান্য অজুহাতে। আদতে ভাল লাগাটা ছিল, ভালবাসা ছিল না। ছিল সাময়িক হুজুগ, নিজের রুচি নয়; তাই অরুচি হতে-ই সামান্য একটা অছিলায় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রুচি, রতি-মতি লেগে থাকলে-ই হয়। এই লেগে থাকাই যে সাধনা এটি শ্রীরামকৃষ্ণ কথা-মৃতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও উপদেশ। আমরা দেখবো, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ খানদানী চাষার উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন।

যত-ই খরা হোক না কেন, খানদানী চাষা চাষ ছাড়ে না। ঈশ্বরের গুণ-গান শুনতে-শুনতে-ই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তসঙ্গ, ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন-ই ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। নারদীয় ভক্তি সূত্রে এই কথা-ই আছে। শাস্ত্র যেমন বলেছেন, "শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন" মনের দ্বারা শুনা, যা শুনলাম তাকে মনে ধরে রাখা তারপর ঘরে গিয়ে তাকে ডাকবো ধ্যান করবো। গরু যেমন জাবর কাটে, যা খেয়েছে, পরে অবসর সময় সেইগুলি মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। ঐটি খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। মনে গেঁথে দেবার জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রীকথামৃতে একই কথা পুনঃ পুনঃ ব্যক্তি বিশেষে অবস্থা বিশেষে বলেছেন। আমাদের মন তো পাথরের দেওয়ালের মত। হাজার চেষ্টা কর পেরেক বসে না। এমন কি লোহার মুখ ভেঙ্গে যায়। তাই পৌণঃপুনিকতার সাহায্য নিতে হয়েছে। শাস্ত্রে এক কথা বার বার বলায় দোষ নেই, উপকার হয়। একই সত্য ভগবান বার বার অবতার হয়ে মানুষকে শোনান, কারণ কালক্রমে অজ্ঞানতার জন্য মানুষ সব ভুলে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে অর্জুনকে বলেছেন, "তোমাকে যে যোগের কথা বলেছি তা প্রাচীনকালে বহুবার আমি বলেছি।" পুনরাবৃত্তির দোষ হয় না। "শাস্ত্রেষু ন জামিতা অস্তি।" শাস্ত্র বাক্য আমাদের মনে রাখতে হবে। এতে আমাদের কল্যাণ হয়। শাস্ত্রের কোন আলস্য নাই বার বার বলতে। কারণ কল্যাণকর কথা কিনা! ঈশ্বরেব কথা "স্বাদুঃ স্বাদুঃ পদে পদে।" দুটি যোগের কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—মনোযোগ ও কর্ম্মযোগ। আমাদের জন্য মনোযোগ। কর্মের, বাসনায়-আসক্তি যাদের শুকিয়ে গেছে তাদের জন্য নিষ্কাম কর্ম বা সন্ন্যাস যোগ।

আমরা যখন শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠ করবো—বা শুনবো তখন মনোযোগের সাহায্য নেব: মন যুক্ত করে শুনলে বা দেখলে বা পড়লে ধ্যান হয়ে যায়। কথামৃত পড়া, শোনা ও দেখা এক সঙ্গে হয়। শ্রীশ্রীকথামৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নানা ছবি দক্ষ চিত্রকরের মত মাষ্টারমশায় তাঁর সোনার তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছেন। শুনলে, পড়লে, সেই সকল চিত্র মনের পর্দায় পুণর্বার দেখতে পাব। মনে করতে হবে আমরা ঐ দৃশ্যে আছি। ঐ দৃশ্যগুলি নিত্যকালের। উপলব্ধি করতে হবে প্রতিটি কথা। মাষ্টারমশায় এই কারণেই নাটকের আঙ্গিক বেছে নিয়েছেন ডায়রী লেখার সময়। স্বামীজী বলেছেন "আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমরা যাহা বুঝিব তাহা উপলব্ধি করিব।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এতো উপদেশ দেবার কি কারণ ছিল? তিনি তো

ঈশ্বর। নিজে-ও অনেক সাধনা করেছেন, আর দরকার কি তাঁর? তিনি চেয়েছিলেন মানুষ ঈশ্বর হোক; কেবল শুনা নয় যাতে মানুষ নিজে কিছু করে। উপদেশ শুনে যাতে হাতে নাতে সাধনা করে। সিদ্ধি-সিদ্ধি মুখে বললে নেশা হয় না।; সিদ্ধি ঘোঁট, খাও তবে হবে। সাধনা কর, উপদেশ তবে কাজে আসবে। উদ্যমহীন সাধনা, শিথিলভাব ঠাকুর পছন্দ করতেন না।" "তেরে বনত্ বনত্ বনি যাই।" না। খুব খেটে নাও, তারপর পেনশন্ খাও। ঈশান মুখার্জ্জীকে—বলেছিলেন, "শালিশী, মোড়লী, এসব তো অনেক হলো। এখন পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও। লোকে জানুক যে ঈশান এখন পাগল হয়েছে, আর পারেনা ...

কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও। ঈশান নাম সার্থক কর।" (কঃ মৃঃ ২/৬১/৬)। শ্রীশ্রীকথামৃত একাধারে সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও সাধন শাস্ত্র। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক বৈরাগ্য নাই, দু-চারটে কথা শিখে অমনি লেকচার— তাতে কি হবে?

আমাদের বার বার মনে রাখতে হবে, কথামৃত পাঠ করা বা শোনা মুখ্যত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন অনুধ্যান করা। তাঁকে মানা বা ভক্তি করা কিনা তাঁর উপদেশে জীবন গঠণের চেষ্টা করা।

আমাদের সামনে রাখতে হবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীযুক্ত মাষ্টার মশায়ের ও অন্যান্য গৃহী ভক্তদের জীবন, যাদের উপলক্ষ্য করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সব কথা বলেছিলেন। মাষ্টারমশায় তাদের অন্যতম। ভয়ংকর অন্ধকার দিনে, সকল পথ হারিয়ে হতাশায় আত্মহত্যা ক'রে মুক্তি পেতে সংকল্প করে ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছায় তা করত হয় নি। পরিবর্ত্তে ঈশ্বর লাভ করে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন সকল মানুষের জীবনে একদিন না একদিন এসে থাকে। কথামৃতের সংবাদ যে কোন মানুষকে এই দুর্দ্দিনে পথ দেখাবে, রক্ষা করবে। করে আসছে, এটি ধ্রুব সত্য। শ্রীশ্রী-কথামৃত পাঠে বা আলোচনায় আমরা লক্ষ্য রাখবো—মাষ্টারমশায়ের সাথে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের বহু ছোট-বড় ভাগ্যবান চরিত্রের কথা, যারা শ্রীশ্রী ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন আর কেমন ভাবে তাদের জীবনে রূপান্তর ঘটেছিল। শ্রীযুক্ত মাষ্টারমশায় শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে আসেন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮২, ২৭/২৮ বৎসর বয়সে। ১৮৮৬, ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ায় বসে কথামৃত পান করেছেন, কোঁচড় ভরে আহরণ করেছেন আধ্যাত্মিক

মণি মুক্তা। কিভাবে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে, তাঁর স্পর্শে কি অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছিল। রামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতি নিয়ত পাঠের ও আলোচনার পর হিসাব মিলাবার পাঠ যেন ভুল না হয়। নিত্য কি হলো? নিত্য এগোলাম কিনা! স্বামীজী যেমন বলেছেন "ধর্ম মানে প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ে ওঠা।" যদি সাত তলা বাড়ীর ছাদে উঠতে হয়, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে হবে, একটার পর একটা সিঁড়ি। তেমনি প্রতিদিন পাঠ বা আলোচনা হবে এই সিঁড়ি ভাঙ্গা। লক্ষ্য ছাদে উঠা। আমাদের-ও উঠতে হবে, লক্ষ্য ভগবান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বার বার জনে জনে বলেছেন, "ঈশ্বরলাভ মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য।" উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে চলার পথ ঠিক হয়ে যায়, বেচালে পা পড়ে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ শুনব, আলোচনা করবো ঠিক; কিন্তু নিজেকে নিত্য কিছু কিছু পাঠ করতে অভ্যেস করতে হবে। যেমন তেমনভাবে না, দায় সারা মত করে না; পরন্তু গভীর শ্রদ্ধার সাথে। এই পড়াকে স্বামীজী বলেছেন, meditative study. এটি সাধনার বড় অঙ্গ। কথামৃত এ যুগের ধর্মক্ষেত্রে সর্বোত্তম গ্রন্থ। সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর-এর মধ্যে আছে। যখনই অবসাদ আসবে, সংশয় দেখা দেবে, নানা সমস্যায় বিব্রত বোধ করবো, মনে রাখতে হবে, শ্রীশ্রীকথামৃতে আছে অফুরন্ত প্রেরণা। তাঁর কাছে গেলে-ই আমার উপায় মিলবে, শক্তি, সাহস, শান্তি সব পাব। এ বিশ্বাস যেন না হারা-ই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন বলে একদিন সাধুদের বলেছিলেন, "প্রতিদিন কথামৃত পড়ো। কথামৃত ব্রহ্মজ্ঞানের খেই।" অন্য আর কি কথা? কথামৃত জীবনীশক্তির উৎস।

আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে, আমাদের সকল কথার কেন্দ্রবিন্দু থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন। কোন ভাবেই তাঁর কথাকে যেন হাল্কা না করে ফেলি। তিনি কথামৃতে অনেক হাসি ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু ধর্মকে, আদর্শকে কখনই খাটো করেন নি। তাঁর কথা বা জীবন আলোচনা করতে গিয়ে প্রয়োজন বোধে গীতা উপনিষদের মত মূল শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু খুব বেশী নয় বা নানা দর্শনের অবতারণা নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশকে অবান্তর কথা বা সমালোচনার মধ্যে গুলিয়ে না দিই। আজকাল অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, আলোচনা না করে সমালোচনা করা হয় বেশী এবং তা-ও কঠিন কঠিন শব্দের জাল বুনে, যা অতি কথন বা

মিথ্ দিয়ে। দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের মতবাদ টেনে এনে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের উপজীব্য : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিজে। আর যদি কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যা দরকার হয় আমরা শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের কথা নেব। দরকার হয় শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কথা খুব বেশী প্রয়োজন বোধ করলে নেব। স্বামীজী বলেছেন "His life is His best commentary."

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মন্ত্র। মন্ত্র নিজে নিজে জপ করতে হয়, তা থেকেই ইষ্ট লাভ হয়। বেশী জানার ইচ্ছা থাকলে তাঁর কথা বা উপদেশ নিয়ে ধ্যান করলেই আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে যাব। শাস্ত্রজ্ঞানের ফল ধ্রুবাস্মৃতি লাভ। অজ্ঞান মোহনাশ ও আত্মস্মৃতি লাভ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলে ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হবে-ই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথা তাঁর প্রিয় সন্তানপূঃ কালী মহারাজকে (স্বামী অভেদানন্দ) বলেছিলেন। গীতার একটি শ্লোকের অর্থ তিনি বুঝতে পারছিলেন না, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করতেই বললেন,—"কথাটার উপর ধ্যান কর। ক'রে পূঃ কালী মহারাজ সত্যসত্যই অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন। কি হবে শুনে অমুকে কি বললো ? তমুকে কি বলল ? আলোচনা লেকচার যেন না হয়। মনে রাখতে হবে—আলোচনা বা উপদেশ দেওয়া নয়। আমি শিক্ষা দিচ্ছি তুমি শোন, তাও নয়। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা যেমন বলেছেন—"মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।" (১০/৯) ঠাকুরের কথা নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ করে পাওয়া যাবে ? না, কথামৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সবটা নয়। শ্রীম যে কদিন তাঁর সঙ্গ করেছেন, সেই দিনগুলির একটি দিনলিপি এবং যেমন যেমন দেখেছেন, শ্রীমুখে শুনেছেন তাই টুকে রেখেছেন তারই কতক অংশ। আর একটি কথা আছে, অনন্তকে কে সীমার মধ্যে আনবে ? দরকার-ই বাকি ? এক গ্লাস মদে নেশা হয়ে যায়, শুঁড়ি বাড়ীতে কত মদ আছে জানার দরকার কি ? একেবারে বেশী পড়া নয়, চুমুক চুমুক অংশ পড়ে, সেই অংশটুকু নিজের মত করে ঠাকুরের জীবনের আলোতে, আলোচনা করতে হবে। তাঁর জলন্ত জীবনের আলোতে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। বাইরে থেকে অপরের কথা ধার করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা সহজবোধ্য করা যায় না, এই কথা দৃঢ় ধারণা করতে হবে। যদি ব্যাখ্যার দরকার হয় স্বামীজী আছেন। কোন অবস্থায়ই যেন ঠাকুরের কোন কথার অপপ্রয়োগ না হয়। নিজেদের মনগড়া কথা দিয়ে—

ঠাকুরের কথা ভরে না দিই। আদর্শ আদর্শ-ই থাকবে।

স্বামীজী নিজেই এ বিষয়ে নিজ গুরু ভ্রাতাদের নানা পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও শিক্ষার ভ্রান্ত অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে সাবধান করেছেন—বলেছেন, "নাম নয়—কাজ, উচ্ছ্বাস নয়—জীবন, দুর্বলতা নয়—সাহস ও আত্মপ্রত্যয়, মূঢ়তা নয়—সমীক্ষা, দল নয়—সম দৃষ্টি।" স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবন শিক্ষার কতগুলি দিক্ নির্ণয় করে দিয়েছেন। এই রেখারূপের মধ্যে-ই আমাদের থাকতে হবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের মাপ-কাঠিতে মানুষকে বিচার করতেন; অর্থাৎ মানুষ হওয়ার জন্য এই গুণগুলি অপরিহার্য্য। লক্ষ্য রাখতে হবে কথামৃত পাঠ করে, আলোচনা করে আমরা তাঁর দিকে কতটা এগোতে পেরেছি। তিনি কথামৃতে বলেছেন, ৯ই নভেম্বর ১৮৮৪—"যে যাঁকে চিন্তা করে সে তাঁর সত্তা পায়।"—আমরা তাঁকে চিন্তা করবো, আর তাঁর সত্তা পাব না তা কি করে হবে? যদি না হয় তখন বুঝতে হবে আমরা ঠিক ঠিক পথে এগোয়নি। হতাশ হবার কিছু নেই, শুধরে নিতে হবে, দৃঢ় নিশ্চয় করতে হবে। আবার লাগতে হবে। স্বামীজী জোর দিয়ে বলছেন—

"নির্ভয়, গত সংশয় দৃঢ় নিশ্চয় মানসবান্।
নিষ্কারণ ভকত শরণ ত্যজি জাতি কুলমাণ॥"

তিনি তো বিনা কারণে ভক্তকে আশ্রয় দেন। আমরা যদি মনটা তাঁর দিকে ফেলে রাখি, তাঁর দিকে এগোবার চেষ্টা করি তা'হলে তিনি নিজে দশ পা এগিয়ে আসবেন। এ তাঁর প্রতিজ্ঞা।

আর একটি কথা, পাঠের আসরে হয়তো বেশী দিন-ই ভক্ত বা শ্রোতা থাকবেন না। শুরুতে বেশী সংখ্যা হলে-ও যতদিন যেতে থাকবে দু'একজন ছাড়া আসর ফাঁকা থাকবে—তাতে কিন্তু এসে যায় না। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের একটি সতর্কবাণী। পঞ্চাশের দশকে এই প্রতিবেদককে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করতে আদেশ দিয়ে বলে ছিলেন, "আসরে কেউ না থাকুক, জানবে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ থাকবেন-ই। তুমি তাঁদেরকে শোনাবে,—লোকের কি দরকার!" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এই কথা-ই আছে, নাথের বাগানে কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ীতে ঠাকুর গিয়েছিলেন—সেই আসরে বলেছিলেন—"যেখানে ঈশ্বরের কথা সেখানে তিনি উপস্থিত থাকেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে বেদমূর্ত্তি। সমস্ত শাস্ত্র কালের আবর্তে পড়ে লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, যা ছিল তা নামমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে তাঁর জীবনের আলোতে আর একবার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্য দিয়ে-ই শাস্ত্র-মর্ম জানতে হবে। তিনি শ্রীমুখে বলেছেন—"তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে। আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ—তাঁহাকে চিন্তা করা-ই মুখ্য সাধনা। আর সাধনা যদি দরকার হয়, তিনি-ই সমস্ত করাইয়া লইবেন।" (১ম ভাগ ৪র্থ সংস্করণের উপক্রমণিকা ১৩১৪)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মূর্ত্তি।

"ওঁ তৎসৎ"

॥ শেষ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠের নিয়ম ও তাৎপর্য

শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের কতগুলি নিয়ম আছে। নিয়ম রক্ষা করে পাঠ করলে সহজে ফল লাভ হয়। পাঠ অর্থ পড়া বা শোনা দুই হ'তে পারে। আমরা যখন বলি আজ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ হ'লো তখন দুই অর্থই বুঝি। একজন হয়ত পড়ছেন আর অনেকে শুনছেন। একটি শব্দার্থ আর একটি ভাবার্থ বলা যেতে পারে।

এখন পড়া অর্থে আমরা কি বুঝি। একখানা বই-এর শব্দ দেখে দেখে উচ্চারণ করে পড়ে গেলাম। মোটামুটি বিষয়বস্তু জানলাম। স্কুল কলেজের বই পড়া ও এমনি পড়া তার উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এরপর কর্মজীবনে কর্মের জন্য পড়া আছে, উচ্চশিক্ষার জন্য পড়া আছে, নাটক নভেল পড়া আছে, ধর্মের জন্য পড়া আছে। কিন্তু এই পড়ার সাথে গীতা ভাগবত বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ একই শ্রেণীর পাঠ বা পড়া নয়। এ পড়া একটু আলাদা।

বেশীর ভাগ পড়া শব্দার্থে সীমাবন্ধ থাকে, মর্মার্থ পর্য্যন্ত এগোয় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বা গীতা, ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রাদি মর্মার্থের জন্য পড়া। শব্দে যা বলেছে তার চেয়ে অনেক বেশী আছে শব্দের গভীরে। মর্মকথা খুঁজতে কেবল শব্দে আটকে থাকলে চলবে না। অভিধানের অর্থে বোঝা যায় না। আর একটু বেশী ডুব দিতে হয়। ধ্যান ধারণা দরকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পড়া অর্থে বলেছেন, "ধারণা করা।" স্বামীজী বলেছেন, আমাদেরকে কেবল পড়লে বা শুনলে-ই হবে না, "আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আর যাহা বুঝিব, তাহা উপলব্ধি করিব।" স্বামীজী ইংরাজীতে এই কথাগুলি এইভাবে বুঝিয়েছেন —Assimilation, Realisation পড়ার শব্দার্থ, ভাবার্থ ও মর্মার্থ—তিন অর্থ পাওয়া গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, গীতা, ভাগবত এই জাতীয় গ্রন্থ কেবল তো চোখ দিয়ে পড়া নয়। চোখ দিয়ে যেসব বই আমরা পড়ি চোখের আড়ালে গেলে মুছে যায়। অনেক সময় মনে কিছুই থাকে না। আর যে পড়ার বস্তু মনে স্থান পায় তা কি সহজে মুছে যায়। আবার মনের গভীরে যে পড়া রেখাপাত করে তা মর্মকথা। এ পড়া বুদ্ধির ক্ষেত্রে কেবল নয়, হৃদয় ক্ষেত্রে দাগ কাটে। হৃদয়ক্ষেত্র মর্মক্ষেত্র অনুভূতি ক্ষেত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকে অনুভব করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, চরিত্রে রূপায়িত করতে হবে, সেটাই হবে সত্যি সত্যি পাঠ। 'শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাষিতব্য'। শুনবো আলোচনা করবো আর ধ্যান করবো। তাতে কি হবে? সংস্কার সৃষ্টি হবে—সংস্কার থেকে চরিত্র গঠন হবে—মানুষ আর মানুষ থাকবে না। দেবতা হবে। একে রূপান্তরিত হওয়া বলে। কথামৃত পড়ে রূপান্তরিত হবে না, তা হয় না। ধর্ম-অর্থ, প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ে ওঠা। বিন্দু বিন্দু করে দেহ গঠিত হয়েছে। মুহূর্ত্তে করে বয়স বেড়েছে। কথামৃত পড়ে একটু একটু করে ভগবান হতে হবে। তবেই ঠিক পড়া হবে।

'ওঁ তৎ সৎ'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের নামকরণ ও তাৎপর্য

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টারমশায়) ছিলেন শ্রৌত ঋষি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে দৈব নির্দেশে উপনীত হয়েছিলেন বিশেষ কাজ নিয়ে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গণেশ। তাঁর কলম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে আশ্রয় লাভ করেন ১৮৮২, ২৬ ফেব্রুয়ারী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির দিন পর্যন্ত সম্ভব মত পূতঃ সঙ্গ করতে ভুল করেন নি। সময় ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬, ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি যেমন যেমন ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখেছেন, যেমন যেমন তাঁর কথা, উপদেশ শুনেছেন, নিজের ডাইরীতে চুম্বক চুম্বক লিখে রেখেছেন। এই দিনলিপি যে একদিন এমন আদরের ও

আদর্শের হবে, এ যে একদিন বহুশাস্ত্রের আকর গ্রন্থ হবে, মানুষকে আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশ দিবে, এমন কথা ভেবে মাষ্টার-মশাই, দিনলিপি রাখেন নি। দিনলিপি রাখাটা তার নিজের স্বভাবগত ছিল। আট বছর বয়স থেকে তিনি দিনলিপি লিখতেন। কথামৃতের দিনলিপি সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন, "আমি সংসারের নানা কাজে আটকে থেকে নিয়মিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতে পারতাম না। তাঁর সঙ্গসুখ লাভে যাতে বঞ্চিত না হই, তারজন্য পুনরায় তাঁর কাছে যাবার আগে অবধি, এই লেখাই হতো আমার তাঁর সঙ্গসুখ।"

প্রথম অবস্থায় মূলত নিজের জন্যই লেখা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাকে কোনদিনই লিখতে বলেন নি, কিন্তু তিনি যখন অনেক দিন বাদে আসতেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুপস্থিত কালের নানা ঘটনা, দিন, ব্যক্তি সমস্ত উল্লেখ করে পুনরাবৃত্তি করতেন। আবার কখন কখন "ঐদিন আমি কি বলেছিলাম, কি কি বলেছিলাম বলো দেখি?" এইভাবে পরীক্ষা করতেন। মাষ্টারের সব ঠিক ঠিক মনে আছে কিনা জানবার জন্য। এইসব যখন চিন্তা করা যায়, তখন মনে হয়, এই পাঁচখণ্ড বইয়ের নাম, "আমার 'ডাইরী' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন দেখেছি' অথবা 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিসংগ্রহ' ইত্যাদি নামকরণ না করে একেবারে গোপীগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নাম দিলেন—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।" এ কি আকস্মিক? না, তাৎপর্য্য আছে। নাম অবশ্য মাষ্টারমশাই অনেক পরে নিজের জীবনের উপলব্ধির সাথে মিলিয়ে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথা পান করে, তাঁর সঙ্গলাভ করে কি রূপান্তর নিজের ঘটেছে তাকে স্মরণে রেখেই এই নামের ব্যবস্থা এতে কোনো ভুল নেই। তিনি উপলব্ধি করেছেন, দীর্ঘ পাঁচ বছর শ্রীরামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে বসে তিনি কি পাঠ করলেন? কৃতজ্ঞতার স্মৃতি মোছা যায় না। অমৃত পান করলে অমর হয়। অমর কে কোথায় আছে কেউ দেখেছে কি? অমৃতত্ব লাভ করাই অমর হওয়া। মৃত্যু একটা অবস্থা। মৃত্যু অমর আত্মার যাত্রা-পথের এক একটি তোরণ। এর মধ্য দিয়ে জীব-আত্মা অখণ্ড চলার আস্বাদন করে। মাষ্টার কথামৃত পান করে এই অমৃতত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন এই কারণে নামকরণের সময় তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল,

গোপীদের "কৃষ্ণনামামৃত পানে তন্ময়তা, গোপীগীতার শ্লোকটি যার শুরুতে আছে—"তবকথামৃতম্"—তোমার অমৃত কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা আর শ্রীকৃষ্ণকথা এক। এর চেয়ে ভাল নাম আর কি হতে পারে? নিজে এই কথামৃতে মুক্তিস্নানের আস্বাদ পেয়েছেন। ধন্য হয়েছেন। চেয়েছেন সকলে ধন্য হোক। আত্মহত্যার পরিবর্তে আত্মজ্ঞান লাভ। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগীতার ১০ম স্কন্দে, ৩১ অধ্যায়ে ১৯টি শ্লোক আছে তার নবম শ্লোকে,

"তব কথামৃতম্, তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভবকে বলেছেন, গোপীরা আমাকে আসক্তি দ্বারা পেয়েছে। গোপীরা আমার প্রিয়। কৃষ্ণগত প্রাণ, প্রাণের প্রাণ তবু একদিন তাদের মনের কোণে একটু অহংকারের মেঘ দেখা দিলে, ভগবান তাঁদের মধ্য থেকে উধাও হলেন। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করে গোপীরা পাগল হলেন। সারারাত কৃষ্ণকে খুঁজে যখন পেলেন না তখন কৃষ্ণ বিরহে, কৃষ্ণে এতই তন্ময় হয়ে গেলেন যে তাঁদের মনে হলো তাঁরাই কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। আর তাঁদের কোনো বিরহ জ্বালা নেই। তপ্তজীবন সুশীতল হয়ে গেছে। সবই মঙ্গল, সব মালিন্য দূর হয়ে গেছে এখন কেবলই শান্তি, প্রশান্তি সবই মধুর।

মাষ্টারমশাই এই শ্লোকের মধ্যে খুঁজে পেলেন জীবের পরিত্রাণের, আনন্দের চাবিকাঠি। কৃষ্ণকথার অনেকগুণ আছে। শ্রীরামানুচার্য যেমন বলেছেন, "অশেষ কল্যাণগুণ সম্পন্ন, নিখিল হেয় গুণ বর্জ্জিত ভগবান, তাঁর কথায় কেবলই মঙ্গল, শান্তি, স্বাদু, স্বাদু পদে পদে। এই শ্লোকে পাঁচটি বিশেষ গুণের কথা বলা হয়েছে (১) তোমার অমৃতময় কথা শুনলে ক্লিষ্ট জীবন অমৃতময় হয়। দুঃখ-কষ্ট নিমেষে চলে যায়, জীবন মধুময় হয়। কত লোকের হয়েছে। রাজা পরীক্ষিৎ-এর হয়েছে, মাষ্টারমশায় নিজের কথাও ভোলেন নি। কিভাবে এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে, আর কি হয়ে গেলেন। চোখের সামনে দেখেছেন শ্রীগিরিশচন্দ্রকে। অমানুষ কেবল মানুষ নয়, দেবতা

হয়ে গেলেন এই কথাই তো যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি রাজা জনককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "অভয়ং প্রাপ্তোষি রাজন ?" আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ 'অভয়'। তুমি পেয়েছো ! তাই বলেছেন, তপ্তজীবনে শীতল জল-সম তোমার কথা স্নিগ্ধতা ঢেলে দেয়। (২) কবিরা; মনীষীরা, জ্ঞানীগুণীরা তাই তোমার নামের গুণকীর্তন করেন। (৩) আলো এলে যেমন অন্ধকার নাশ হয়, তোমার নামে আলোর গুণেতে জীবনের সকল কালীমা মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। কল্মষাপহম্ অর্থাৎ তোমার নামের গুণে মলিনতা নিমেষে নাশ হয়, মানুষ পবিত্র হয়। (৪) শ্রবণ-মঙ্গল তুমি মঙ্গলময়, তুমিই শিবম্ তুমি সত্যম্ তুমিই সুন্দরম্—কোন বিশেষ গুণের দরকার হয়না, কানে শ্রবণ করলেই নামের গুণে মঙ্গল হয়। এমন কি কীর্তনও দরকার হয় না। (৫) শ্রীমদাততম্—অফুরন্ত মাধুর্য রয়েছে তোমার নামে তবে আকৃষ্ট হয় না কেন ? জন্মজন্মান্তরে কিছু করা না থাকলে কান বধির হয়ে থাকে, ও নাম কর্ণে প্রবেশ করেনা।

উপসংহারে বলা চলতে পারে এ নামকরণ সার্থক। এর তাৎপর্য্য অনেক। শোন, গুণকীর্তন কর, জীবন তৃপ্ত হবে। অমৃত লাভ কর। নিসংশয় হবে নির্ভয় হবে আরো দৃঢ় নিশ্চয় হবে ঈশ্বর দূরে নয়, আমার মধ্যে আছেনই। ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হবে ও নষ্ট মোহ হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের গঠন, রূপ ও ভাষা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অমৃত কুম্ভ। গঠনে শ্রীম যে আঙ্গিক বেছে নিয়েছেন তা নাটকের আঙ্গিক। কিন্তু এর মধ্যে আছে দলিলের মত বাস্তব বিবরণ, দিনক্ষণ। পড়ার সাথে সাথে একটি বাস্তবরূপ মনে ফুটে ওঠে ; পাঠকের মনে সহজেই দৃশ্যের পুনরাভিনয় হয়, নিজেকে দৃশ্যের একান্ত অংশ বলে মনে হয়। সময়-সীমা মুহূর্তে খসে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীর রস আস্বাদ করতে পারে। এইটি গঠনের বিশেষ তাৎপর্য্য। শ্রীম (মাষ্টার মশায়) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাবার প্রথম দিন থেকে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত (২৭-৭৮ বৎসর) যে ভূমারস আস্বাদ করেছেন, তিনি

চেয়েছিলেন, আগামী দিনের মানুষ, যিনি এই মহাগ্রন্থের সংস্পর্শে আসবেন তিনিই যেন এই ভূমানন্দের অধিকারী হতে পারেন। তাই দেখতে পাই কথামৃত গঠনে সেই চাহিদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

এই কথামৃতকে কোন শ্রেণীর বই বা মহাকাব্যের সাথে তুলনা করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইকে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ জিজ্ঞাসা করেছেন, "আমার সাথে কি কারুর মেলে ?" কি করে মিলবে, নিরুপম তিনি—তাঁর কথা, জীবন সবই নিরুপম। ভারতে সাধক জীবন অনেক, জীবনীও অনেক কিন্তু এমন করে শতাব্দী পেরিয়ে ধ্রুপদী মহিমায় কোন বই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কি ? এই বই-এ ধ্রুপদী সাহিত্যের গুণ ও সমকালীন সাহিত্যের রীতি ও প্রকরণ উভয়ই পাশাপাশি প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্য ও দৃশ্য-কাব্যের সমন্বয়। এই বইটির গঠনের মহৎগুণ পড়তে পড়তে মন আটকে যায়। চোখ দিয়ে পড়া জিনিষ, চোখের আড়াল হলেই মুছে যায় কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে কেবল পড়া নয়, অতিরিক্ত আর কিছু বেশী হয়। পড়ার চেয়ে দেখার আনন্দ এখানে অনেক বেশী। এর ভাষা আছে বলে মনেই হয় না। এই বই পড়ার জন্য কোনো বিশেষ যোগ্যতাও প্রয়োজন হয় না। পড়ার বা শোনার সাথে সাথেই ভূমার স্পর্শ। মুহূর্তেই উপলব্ধি জাগিয়ে দেয়। অজানা এক মহাপুরুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেন পাঠককে স্বাভাবিক-ভাবে স্পর্শ করে। চিত্রটা বুঝতে না পারলেও অস্তিত্বকে ভুলতে পারে না। এমনই গঠন পড়তে পড়তে মনে হয় ঈশ্বর বুঝি বা আমারই আসে-পাশে আছেন। হাত বাড়ালেই হয়তো মিলবে। ঈশ্বর খুবই কাছের মানুষ বলে মনে হয় তা নয়, সত্য সত্য প্রতীতী হয়। বিংশ-শতাব্দীর বিরাট পুরুষ, মহাত্মাগান্ধী বলেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানকে মানুষের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন।" কথামৃতে এটি সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পাই। এই গঠনের মধ্যে মানুষের মহত্ত্ব ও মানুষ ও ঈশ্বরের একত্ব জুড়ে আছে, অভিন্ন হয়ে আছে। তাই এতো রস, এতো মধুর। এইটি ধ্রুপদী সাহিত্যের গুণ ও শক্তিমত্তা। রামকৃষ্ণকথামৃত আত্ম-আবিষ্কারের বিস্ফোরণ। একটি স্ফুলিঙ্গ-ই যথেষ্ট। এইটি স্পষ্ট ভাবে কথামৃত গঠনে রূপে ফুটে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ কথামৃতের রূপের কথা বলে শেষ করা যায় না। আর আমরা কতই বা বলতে পারি। বিদেশী মনীষী রোঁলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে ভারতের মহাসঙ্গীত বলেছেন। তাঁর কথামৃত সেই মহাসঙ্গীতের স্বরলিপি। এরই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে রামকৃষ্ণ ঘরানা।

গঠনের বিশেষ দিক হলো, একাধারে রামকৃষ্ণ কথামৃত বক্তব্যধর্মী ও বাস্তবধর্মী কিন্তু তাই বলে কাহিনী রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

উপমা, গান, গল্প এমন ভাবে জড়িয়ে আছে, কোনটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণের মূল ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ফুল তুলতে গিয়ে অনুভব করলেন, আলাদা ফুল তুলে আর পূজা কি করবেন, প্রতিটি ফুলের গাছ যেন এক একটি ফুলের তোড়া, এইমাত্র কে যেন সব দিয়ে জগৎপতি ঈশ্বরের পূজা করে গেছেন। দেখতে পাব আলাদা হলেও একেরই গুণ গাইছে, একের পূজার সামগ্রী সব। কেউ আলাদা কিছু বলে না, করে না, কথামৃতে সব মিলে এক মহা ঐক্যতান সৃষ্টি করে দিব্য সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

যখন কথামৃতের ভাষার দিকে তাকাই, তখন সর্ব প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের কথাই মনে পড়ে। তিনি বলছেন, ঠাকুরের ভাষা ছিল দিব্যভাষা। তাঁর মুখ দিয়ে এক অপূর্ব সুন্দর কথ্য ভাষা বেরিয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধই করেনি সাহিত্য জগতকে মহিমান্বিত করেছে। এই ভাষায় মানুষ কথা বলতে জানতো না ইতিপূর্বে। একটি পৌরাণিক রূপকথা আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথ ভূমি স্পর্শ না করে আকাশ পথে চলতো, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের ভাষাও মাটি স্পর্শ না করে শ্রীরামকৃষ্ণ ওষ্ঠ থেকে জীবন্ত অবতরণ করে পাঠকের ও শ্রোতার মন স্পর্শ করে। মনে হয় যেন একটি শক্তি, শব্দ নয়। এটি কোনো রচনা নয়, প্রভুর ওষ্ঠ থেকে যেমন পড়েছে তেমনি মাষ্টার মহাশয় ধারণ করেছেন স্বীয় পাত্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন ভাবে কথা বলতেন তার একটু পরিচয় না দিলে, কথামৃত গঠনের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হবে না। সমসাময়িক একজন বিজ্ঞব্যক্তি, যিনি নিজে ছিলেন খ্যাতিমান একটি পত্রিকার

সম্পাদক, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত। কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর কথাতেই বলি, "রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন—এই দুই বিখ্যাত পুরুষকে একত্রে অবস্থিত ও সংলাপরত অবস্থায় দেখেছেন উভয়ের এমন কোন শিষ্য এখনো জীবিত আছেন কিনা জানিনা। সেই বিরাট সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কেশবের জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভুপের একটি ছোট স্টিমারে কেশব ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে উঠেছিলেন, আমিও তাতে ছিলাম। স্টিমার দক্ষিণেশ্বরে পেঁছিলে রামকৃষ্ণ তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে তাতে উঠেন। স্টিমার স্রোতের উপকূলে চলিতে শুরু করে......। আমি তাদের একেবারে পাশে প্রায় কেশবকে স্পর্শ করে বসেছিলাম। পরমহংসদেব স্টিমারে প্রায় আট ঘণ্টা ছিলেন। অল্প যে কিছুক্ষণ সমাধিতে ছিলেন, (তা বাদ দিলে) তাঁর কথা বলার বিরাম ছিল না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সময়ে (১৮৮২—১৯৩৩) আর কোনো মানুষকে তাঁর মত করে কথা বলতে শুনিনি। বাক্যবিনিময় বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ঘটেনি। এই দীর্ঘ আট ঘণ্টা সময়ে অসাধারণ বাগ্মী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত কেশব ডজন খানেক বাক্যও বলেছেন কিনা সন্দেহ।... রামকৃষ্ণই ছিলেন বক্তা—তাঁর বাক্য ধারা অবিরাম প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল, যেমন করে আমাদের নীচে বয়ে যাচ্ছিল তরঙ্গ ভেঙ্গে গঙ্গার ধারা। তখন তাঁর সেই মধুর কোমল ঐকান্তিক কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু-ই শুনিনি—তাঁর কম্পমান ওষ্ঠ থেকে সহজমত উক্তি নির্গত হচ্ছিল। কিন্তু তার অন্তর্গত ভাবের চেয়ে উর্ধ্ব-বিহারী বা গভীরে অবগাহনকারী আর কোন ভাব সম্ভবপর নয়, প্রতিটি চিন্তাই দিব্য সত্যের উন্মোচক ; প্রতিটি উপমা, রূপকল্প বা কাহিনী পরমাশ্চর্যের দ্যোতক।"
(অনুবাদ কিয়দংশ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—২খণ্ড)

অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে ও অল্প কথায় গল্প বলার যে রীতি শ্রীরামকৃষ্ণ অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর নিজস্ব। বিশ্বসাহিত্যে একটি নূতন জ্যোতিষ্ক বলা উচিত। গদ্য ভঙ্গীর মধ্যে গভীরতা ও গূঢ় সংক্ষিপ্ত উক্তি সাহিত্যের একটি দিক্‌দর্শন বলতে হবে। প্রত্যেকটি গল্প, উপমা ও কথার মধ্যে রয়েছে অপূর্ব রূপ ও রস।

এমনটি বড় কোন সাহিত্যে বিশেষ করে গল্প সংগ্রহ সাহিত্যে দেখা যায় না।

কথামৃতের গদ্য রীতিতে ব্যবহৃত লোক-সঙ্গীত প্রায় ক্ষেত্রেই উচ্চজীবন সংগীতের রূপ ধারণ করেছে দেখতে পাই। শ্রীরাম-কৃষ্ণ সমন্বয়ের পূজারী ছিলেন, কথামৃতে যেসব উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যেও সেই সমন্বয়ের রূপ স্পষ্ট।

এ সম্পর্কে আমরা একবার স্মরণ করবো ঠাকুরের সাথে ঐ কালের দুই দিক্‌পাল পণ্ডিত, সাহিত্যিকদের পরিচয়ের কথা, তাদের বাক্য বিনিময়ের কথা, যেমন ভাবে কথামৃতে মাষ্টারমশায় তুলে রেখেছেন। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের দুই প্রবাদ পুরুষ ; কিন্তু কথামৃতের আলাপচারী বিবরণে দেখতে পাই গদ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র কেবলই শ্রোতা, যেমন দেখেছি কেশবচন্দ্রকে। কথার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেব ছিলেন রাজা-ধিরাজ সম্রাট। স্বামীজী যেমন বলেছেন, "ঠাকুরের বাংলাভাষা ভারী চমৎকার। একেবারে pure and full of wit।" "ঠাকুরের আগমনে, ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে—এখন সব নূতন ধাঁচে গড়তে হবে।" (স্বামী-শিষ্য সংবাদ) একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলেছেন,—"কথামৃতের গদ্যরীতি সত্যকে বহুরূপে অনুভব করার বিজ্ঞান। গ্রাম্য চলিত ভাষায় কথা বলার মধ্যে প্রচণ্ড ভাব বহনের শক্তি রয়েছে, কথামৃতের গদ্য তার প্রমাণ বহন করছে। কথামৃতে পাই কথোপকথনে নাট্যরূপ। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র বলেছেন, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নাটক লিখতে শিখেছি। মাষ্টারমশাই কথামৃতে যে নাটকের আঙ্গিক বেছে নিয়েছেন তা মাষ্টারমশাই-এর নয়, সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের।

এতো ভাষার কথা বললাম, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো একটিও আঁচড় কাটেন নি ; উপরন্ত তিনি তো আক্ষরিক বিদ্যায় ইংরাজীতে যাকে নিল বলে তাই ছিলেন। এতো ভাষা, গদ্য, উপমা, অলঙ্কার গল্পবলার ভঙ্গী এলো কোথা থেকে ? তাঁর গদ্যে কথা বলার মধ্যে প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ছড়িয়ে আছে। কথানৈপুণ্যেই সবকিছু প্রকাশিত। মাষ্টারমশাই তো কেবল তাঁর গণেশ, লেখনী মাধ্যম।

শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব তাঁর ঈশ্বর অনুভূতির কথা সর্বজন সমক্ষে অতি সহজবোধ্য ভাষায় বলে গেছেন। এই অধ্যাত্ম অনুভূতি প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা, গদ্যরীতি তিনি মুখে মুখে ব্যক্ত করেছেন। সেই নিজস্ব ভঙ্গীটির সংরক্ষণের মধ্যে-ই রয়েছে কথামৃতের প্রকৃত গঠন, রূপ ও ভাষা। এই কথা বলা গদ্য রীতিটির মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য আছে, ঐশ্বর্য আছে, যা কোন কথার দ্বারা বা লিখে বোঝানো যায় না। সেই অন্তরঙ্গ মাধুর্য্য অনু-ভূতির বস্তু। কথামৃতের ভাষার মধ্যে একটা গতিময় প্রবাহ আছে। একটা সহজাত প্রেরণা আছে। যা মানুষকে নিশ্চিত ভাবে অন্তরের পরম সত্য সত্ত্বার গভীরে ডুবে যেতে সাহায্য করে। এরই মধ্যে পাঠক খুঁজে পায় একটা প্রার্থনার সুর ও ছন্দ। অজ্ঞাতে কথামৃতের গদ্য রীতি পাঠকের স্মরণ মনন ও ধ্যানের মাধ্যম হয়ে উঠে। প্রত্যক্ষতার স্পর্শে আবেশের মধুরিমায় দেহ মন ভরে দেয়। তাই বলতে ইচ্ছে করে কথামৃত কেবল অসাধারণ নয়। অসাধারণোত্তর তো বটেই।

আর একটা বিষয়ে সামান্য আলোচনা করে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। কথামৃত ধর্ম-সাহিত্য না সাহিত্য? যে কারণে বাইবেল, কোরাণ, উপনিষদ সাহিত্য সেই কারণে কথামৃত সাহিত্য। যে কথা, যে লেখা, যে অনুভূতি রসসৃষ্টি ক'রে প্রকাশ পায় ভাষার মাধ্যমে সে তো শিল্প, সাহিত্য। কথামৃতে আছে ঈশ্বর অনুভবের সহস্র প্রকাশ, যেমন আছে ঈশ্বরানু সন্ধানের সীমাহীন ব্যঞ্জনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের বৈশিষ্ট্য

সকল বৈশিষ্ট্যের প্রথম ও বড় বৈশিষ্ট্য নরদেহধারী স্বয়ং ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা। গীতায় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলে-ছিলেন, তুমি নিজের মুখে যদি না বলতে তুমি ঈশ্বর, আমি বিশ্বাস করতাম না। ঋষিরা যতই বলুন না কেন। সত্যি কথা, ঈশ্বরকে কে চিনতে পারে নিজে কৃপা করে চিনিয়ে না দিলে।

১৮৮৫, ৭ই মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

ঘরের মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছেন। সহাস্য বদন। কথা প্রসঙ্গে মাষ্টারমশায়কে লক্ষ্য করে বলছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—"এখানে অপর লোক নাই। সেদিন হরিশ কাছে ছিল দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা বলছি।" ..."মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন,—দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।"

তাই বলছিলাম, কথামৃতে কথা বলেছেন নরদেবতা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন. শ্রীরামকৃষ্ণ। জগৎ ঈশ্বরকে চর্মচোখে দেখেছে ও কান দিয়ে তাঁর কথা শুনছে। সেই কথাগুলি শ্রৌতঋষি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ, আমাদের মাষ্টারমশাই টুকে রেখেছিলেন যত্ন করে। এমন জিনিষ আর কোনো দিনই হয় নি। মুখের থেকে শুনে-ই তখন তখন লিখে রাখা, তার থেকে এত বড় ৫ খণ্ড বই। এমনটি আর নেই! শ্রীমুখ থেকে জীবন্ত অবতরণ মাষ্টার মশায়ের দিন-লিপির পাতায়।

দুই ॥ প্রতিদিনের লিখিত কথা-কাহিনীতে একজন জ্যান্ত মানুষকে পাই। স্পর্শ পাই। নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ কানে শুনতে পাই।

তিন ॥ ঈশ্বর চির নবীন। কথামৃত ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভিন্ন। চির নতুন। নিত্য নব কলেবর। "ভাস্বর ভাবসাগর" স্বামীজীর কথায় ভাবরাজ্যের সম্রাট। বহুরূপী পাখীর মত বহুরূপ—রূপের শেষ নেই, দিগন্তে পাখা মেলেছে।

চার ॥ কথামৃতের ভূত ভবিষ্যৎ নেই, চির বর্ত্তমান। যখন পড়া যাচ্ছে যখন শোনা যাচেছ তখন-ই আছি। একজন ইংরেজ ভক্ত সাহিত্যিক যেমন বলেছেন—Eternal now.'

পাঁচ ॥ সব আছে। অদ্যাবধি যত আধ্যাত্মিক প্রশ্ন, জাগতিক প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হয়েছে তাদের সমাধান এই কথামৃতের পাতায় পাতায় আছে। সাধন শাস্ত্র, সিদ্ধান্ত শাস্ত্র দুই-ই আছে সকলের জন্য পথ ও পাথেয়। অনন্ত পথ অনন্ত মতের

সন্ধান। আছে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম স্বরূপ উদ্ভাষণের পথ নির্দেশ, নানা গল্পে, উপমায়, গানে, হালকা হাসি রঙ্গরসে। চিন্তার স্বাধীনতা, মতের পথের স্বাধীনতা এখানে অনন্ত।

ছয়॥ কথামৃতের 'বৈশিষ্ট্য এক কথায় ঈশ্বর সর্ব্বস্বতা॥ নানা দিকে ঘোরো এসে দাঁড়াও ঈশ্বরে। যেমন কম্পাস্ তিনদিকে ঘুরে দাঁড়ায় এসে উত্তরে।

সাত॥ কথামৃতের বৈশিষ্ট্য পড়া ও দেখা এক সঙ্গে হয়। শুধু চোখ দিয়ে পড়া জিনিষ, চোখের আড়ালে মুছে যায়, কিন্তু পড়া জিনিসে মন আটকে যায় যখন, তা আর ভোলা যায় না। এতে আছে অসীম মাধুর্য, "শ্রীমৎ আততম্"। যেমন আশ্চর্যের তেমনি আকর্ষণের।

আট॥ এমন একটি বস্তু কথামৃতে ছড়িয়ে আছে, যা না মেনে না বুঝে কেবল শুনে কানে, "মন গিয়ে তায় লিপ্ত হয়।" কেন? কেউ জানে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কথামৃতে বলেছেন, সকল ধর্মের লোক এসে বলছে আপনি আমাদের। এমন কি খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের লোক, রামকৃষ্ণ কথামৃতে নিজ নিজ মতের কথা খুঁজে পাচ্ছেন। কোন বিশেষ 'ইজ্‌ম' নেই কিন্তু সকল ইজ্‌ম-এর সমাহার এই কথামৃত। এমন কি ' ফসকেমিজিম" মর্ডানিজিম তাও আছে। বলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মুদিখানা করলে, তাতে সবই একটু একটু রাখতে হয়, তেঁতুল, তেজপাতা, পাঁচফোড়ন।

নয়॥ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন যেন মহাতীর্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায় "তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে। নতুন তীর্থরূপ নিল জগতে।" তেমনি কথামৃত সর্বতীর্থের সঙ্গমস্থল। এই তীর্থে এলে-ই, স্নান করলে-ই, মুক্তি স্নান হবে। শ্রী মুখে ঠাকুর বলছেন, "মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।" কথামৃত সর্বশাস্ত্রের সার। গীতার মত-ই সর্ব তীর্থময়ী। (২রা অক্টোবর ১৮৮৪)

দশ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে অতি সহজ ও সরল ভাষায় কথা বলেছেন। সকল মানুষের মত করে। এর কোন ভাষ্য হয় না। ভাষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন। স্বামীজী যেমন বলেছেন, "He is the best commentary—His language is pure and full of

wit." তাঁর ভাষা দেখে এখন নতুন করে ভাষাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

এগারো ॥ কিন্তু ভুললে চলবে না—ঠাকুর যেমন বলেছেন, "সহজকে সহজ না হলে চেনা যায় না। বোঝা-ও যায় না। মন যদি মলিনতায় ভরা থাকে, সহজ হয় না চিত্ত বুদ্ধি।" মনের ময়লা কাটলে-ই সহজে কথামৃত পড়া বোঝা যায়। গূঢ় অর্থ রয়েছে এর মধ্যে। স্বামীজীর উক্তি—"প্রতিটি কথায় লক্ষ দর্শন সৃষ্টি হতে পারে।" ভাবাবেগের কথা নয়। তাঁর উপলব্ধি। স্বামীজী তাঁর গুরু ভাইদের সামনে তা প্রমাণ করেছেন। 'হাতি নারায়ণ মাহুতও নারায়ণ'—এই বাক্যটি নিয়ে স্বামীজী তিন দিন ধরে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গান গেয়ে তাই কথামৃতের কথায় ডুবতে বলেছেন। বলেছেন, উপরে ভাসলে কি হবে! যত মণি-মুক্তা রত্নধন সাগরের নীচে আছে ডুব না দিলে পাবে কি করে। গান—"ডুবডুব রূপসাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি-রে প্রেম রত্নধন।" পাতাল পর্যন্ত যেতে হবে।

বারো ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে যেটি বার বার মনে হয়েছে, এতে রয়েছে, এগিয়ে যাবার মন্ত্র, এগিয়ে যাবার প্রেরণা। আটকে থাকা চলবে না। এটির মধ্যে রয়েছে জীবন পথে চলার শক্তি, এমনই টান 'দল' বাঁধে না। স্রোত, ভয়ঙ্কর গতি, কথামৃতের নিজের গুণে-ই টেনে নিয়ে যায়। "গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে" গতিহীনেরও গতিবেগ। "চরৈ-ই বেতি" বেদ বলেছেন—এগিয়ে পড় ব্রহ্মচারী ও কাঠুরিয়া গল্প বলছেন, ঠাকুর—কত কি সামনে পাবে, এগিয়ে না গেলে কেবল-ই কাঠ। এগিয়ে গেলে চন্দনকাঠ, রূপো, সোনা মনি-মাণিক্য, অঢেল সম্পদ পাবে। অঢেল সম্পদ পাওয়ার স্বপ্ন, প্রতিশ্রুতি, প্রেরণা প্রতি ছত্রে ছত্রে আছে।

তেরো ॥ সব 'ইতি' বাচক। 'নেতি' নেই। হবে না, পাবে না। নাও পেতে পারো,—তোমার কি আছে যে পাবে? এমন একটি দুর্বল কথা নেই। নেই শাসন, নেই পাপের ভয়। নরকের পূতি-গন্ধ। তোমার কোনো বিশেষ গুণের দরকার নেই, জন্মের ঐতিহ্য, সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি কোন কিছুর দরকার নেই। শুধু হাতে কি হয়। একটি চাই, সেটি দিতে হবে। সঙ্গে রাখতে হবে "মনটি"।

এটি না থাকলে সব ছারেখারে যাবে। ওটি তো বাইরে থেকে যোগাড় করতে হবে না। নিজের আছে—সরষের পুঁটলি খুলে গেছে। মন নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে; কিছু দিল্লী, কিছু কুচবিহার কিছু কলকাতা। এক জায়গায় আন। আর সেটি সম্বল করে কথামৃত পান কর, সব পাবে। একটু অভ্যেস করলে-ই হয়ে যাবে। সাধুসঙ্গ একটা কথা আছে। সঙ্গ কর, হবে-ই হবে। আলেক লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তি একটু হলে-ই বাড়তে বাড়তে যাবে। ঈশ্বরের নামে অরুচি হলেই-বিপদ। রুচি হলেই বেঁচে গেলে। 'তন্নামেরুচি'।

চোদ্দ ।। অন্যায় করে ফেলেছো তাতে-ই বা কি? গরু কথা বলে না, মিথ্যা কথা বলে না, দেয়াল কি পাথর অন্যায় করে না, মানুষ ভুল তো করবেই; অন্যায় বলছো কেন? একবার গা ঝাড়া দিয়ে পানকৌড়ির মত, ঝেড়ে ফেল। পানকৌড়ি পাঁকে থাকে গা কেমন পরিষ্কার। একবার জগতের মাকে বল, আর করবো না। মনকে দৃঢ় করো আর এমনটি করবো না। পরিষ্কার। এই তো সাধনা। স্মরণ মনন করলে পাপ কেটে যায়। শরণাগত হ'লে কর্মফল ক্ষয় হয়। ২৮শে জুলাই ১৮৮৫ সালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুকে এই কথা বললেন। কর্মফল আছে, কিন্তু ঈশ্বর আইন করেছেন আবার তিনি-ই আইন রদ্ করতে পারেন।

বলবে, একেবারে-ই কি এতটা দৃঢ় হতে পারবো! মনে তো হয় না। বার বার যদি ভুল করি, অন্যায় করে বসি তখন কি হবে। কেন? কথামৃত বলছেন, বাছুর কি একবারে-ই উঠে দাঁড়াতে পারে, দৌড়তে পারে? বার বার উঠতে চেষ্টা করে পড়ে যায়। আবার উঠে। উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে শেষে হাঁটতে ছুটতে শেখে। চাই চেষ্টা, উদ্যম আর অভ্যাস ও রোখ। চিঁড়ের ফলার হলে চলবে না। আঁট চাই, চাই ব্যাকুলতা।

আমি বদ্ধজীব, আমার কি উপায় আছে? হলেই বা বদ্ধজীব তাঁর ইচ্ছায় মুক্ত হ'তে কতক্ষণ? ঐটি কথামৃতের বাহাদুরী। কথামৃতে ঠাকুর শ্রীমুখে মার সাথে কথা বলেছেন, "মা, যে মরা তাকে মেরে কি হবে? যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে মারা তো বাহাদুরী। মরাকে বাঁচান বাহাদুরী। তাই ভগবানের আর একটি নাম পতিত

পাবন। অবতার আসেন পতিতের, দুর্বলের, উদ্ধারের জন্য। কথামৃতে দেখতে পাই ঈশ্বরের কৃপাহস্ত প্রসারিত ঐ যারা পড়ে গেছে, পড়ে আছে অন্ধকারে। যার কেউ নেই কোথাও তাদের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ গেলেন, কালোর যুগে আলো হাতে করে, অন্ধকারময় সহরের অলিতে গলিতে, থিয়েটারে বারবনিতাদের অড্ডাখানায়। তাঁর অভয় চরণ বাড়িয়ে দিলেন তাদের সামনে। "তরনীং ভবসাগর পার করিম্।" সেই দিনের আচার ব্যবহার মনুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার অবহেলার অন্ধকারময় সমাজের ব্যবহার ঈশ্বরকে নাড়া দিয়েছিল। অসহ্য হয়ে উঠেছিল—তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহ ধারণ করে আর একবার ঘোষণা করতে এসেছিলেন, "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" সনাতন হিন্দু ধর্মের মর্মবাণী—ঈশ্বর-ই মানুষ, মানুষ ঈশ্বর ছাড়া কেউ নয়। মানবতার মর্যাদা, আর ঈশ্বর ও মানুষের একত্ব এইটি কথামৃতের একটি বিশেষ দিক-দর্শন ও বৈশিষ্ট্য।

পনোরো।। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সার্বজনীনতা সার্বভৌমত্ব সর্বকালের সীমা লঙ্ঘন করে গেছে। Universal acceptance. বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "আমি সব লই"—গ্রাহ্য ত্যজ্য আলাদা নেই। সবই ঈশ্বর, আমি নিজে গোটাটা, কোনটা বাদ দেব। বেলের ওজন করতে হলে, শাঁস, বীচি, আঁশ কোনো একটি বাদ দিলে ওজনে কম পড়ে যায়। জগতের কোনটা বাদ দেবে। ঈশ্বর জীব-জগৎ বিশিষ্ট। আমি কিছু ভাঙ্‌তে আসিনি। কথামৃতে সব গড়ার কথা আছে, ভাঙ্গার কথা নেই।

একটি নিন্দার কথা নেই, একটি দুঃখের কথা নেই। আছে আশার কথা, উদ্দীপনার কথা, এগিয়ে দেওয়ার কথা।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, "কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় নোংরা, ওটা আবার ঈশ্বর লাভের পথ কি করে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ কেন? কালীবাড়ী ঢোকার পথ অনেকগুলি আছে, তার মধ্যে মেথর ঢোকার পথও আছে। অবশ্য নোংরা পথ। পথ তো। তোর ভাল না লাগে তুই না গেলি ঐ পথে। কিন্তু ওটা যে পথ তা অস্বীকার করবি কি করে? এই কথা। পথ ঈশ্বর নয়, মত ঈশ্বর নয়। উপায় মাত্র, ঈশ্বর উদ্দেশ্য। অনন্ত পথ, অনন্ত মত। এক ঈশ্বর তার অনেক নাম"

ষোল ।। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে প্রেরণা মুখ্যতঃ ইহকাল সংপ্রতিষ্ঠিত। এই জীবনে-ই হতে পারে। হতে হবে। পরকালের জন্য বসে থাকার দরকার নেই। পরকাল আছে থাক। এই পৃথিবীতে, এই জন্মেই হতে পারে, এই ক্ষণে-ই হতে পারে, ঈশ্বরের কৃপা হলে। গুরুর কৃপা হলে। এখন গুরুর বা ঈশ্বরের কৃপা কি করে হয়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য"— ঠিক। উপনিষদ আবার বলছেন, কৃপা বুঝতে হলে চাই উদ্যম।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—সাহসী হতে হবে। উদ্যমশীল হতে হবে। দুটি চাষার গল্প বলেছেন কথামৃতে। একজন সারাদিন খেটে জমিতে খাল কেটে জল আনলো তবে খাওয়া দাওয়া। কারো কথা শুনলো না। আগে জল আনবো তবে আর কথা। উদ্যমশীল চাষার ফললাভ হলো। আর একজন মেয়ে বৌয়ের কথায় খাল কাটতে কাটতে ছেড়ে দিয়ে খেতে নাইতে গেল, জমিতে আর জল আনা হলো না। উদ্যমহীন চাষা। কিছু-ই হলো না। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বলছেন, একটু তোড়জোড় করে খেটে পরে পেনশন খাও বসে বসে। "বনত্ বনত্ বনি যাই"। না। এখুনি, উঠে পড়ে লাগো। নিজেকে জান।

সতেরো ।। কথামৃতের আর একটি সর্বজনীন প্রেরণা দেখতে পাই সেটি "বিশ্বহিতের প্রেরণা" "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ।"— কেবল নিজের কথা নয়, সকলের কথা। আম খেয়ে মুখ পোঁছা নয়, সকলকে দিয়ে খাওয়া। কুঁয়ো খোড়া হয়ে গেলে, বালতি দড়ি কুঁয়োতে ফেলে দেওয়া নয়, রেখে দেওয়া, অপরের দরকারের জন্য। এই কথার উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজী একটি দিক দেখালেন—"Be and make" এই রামকৃষ্ণকথামৃতের ধারা। রামকৃষ্ণ ঘরানা। মানুষ সৃষ্টির, সমাজ সৃষ্টির, রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। হাতে হাত মিলিয়ে সহাবস্থান, সোনার সূত্রটি হবে সকলের মধ্যে-ই এক ঈশ্বর চৈতন্য আছেন তাকে জানো ও অন্যকে জানায় সাহায্য কর। কেউ পর নয়, সকলে আপনার। কথামৃতের কথাকে স্বীকৃতি দিয়ে মা সারদা দেবী বললেন, "জগত তোমার"। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের বর্ণনা নয়, তত্ত্বের অনুভূতি। ব্যঞ্জনা নয় ব্যবহার। কথা নয় উপলব্ধি।

আঠারো ।। দুধ দেখা এক, দুধ শোনা এক, দুধ খেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়া আরেক। সিদ্ধি সিদ্ধি বললে-ই নেশা হয় না। সিদ্ধি ঘুঁটতে হয়, তারপর খেতে হয়। খেলে নেশা হয়। পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। ৫ই আগষ্ট ১৮৮২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়কে বললেন ঠাকুর, "তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা, বিচার করে জানা যায় না।"

ঊনিশ ।। কথামৃতে প্রাচীনকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাস্তব সাধনার দ্বারা তাতে নতুন শক্তি সঞ্চার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। পুরানো যা কিছু তাকে বর্জন না করে যা ভাল, কালজয়ী তাকে রেখে সময় উপযোগী করে মানুষের কল্যাণে। সত্য, আদর্শ, সনাতন, নিত্য-কালের ; কিন্তু ব্যবহার নতুন মানুষের রুচি, প্রকৃতির উপযুক্ত করে গ্রহণযোগ্য করে কথামৃতে ভগবান পরিবেশন করেছেন। বাদশাহী আমলের টাকা নবাবী আমলে চলে না—টাকার ভিতর সোনা ঠিকই থাকে। Merit Value ঠিক থাকবে, কিন্তু exchange value পাল্‌টাতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে এই কথা-ই বলেছিলেন, আমি বহু পুরাতন যোগের কথা-ই বলছি আর একবার। "স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ" (৪।৩) ধর্মের মূল যে সত্য ভগবান অবতার হয়ে পুনরাবৃত্তি করেন।

কুড়ি ।। কথামৃতে "পুনরাবৃত্তি" বা "পৌনঃপৌনিকতা"—একটি বৈশিষ্ট্য। ধর্মশাস্ত্র মাত্র-ই এইটি দেখতে পাই। সাধারণ সাহিত্যে এটি দোষের। কিন্তু ধর্ম শাস্ত্রে গুণের। মানুষের মন কঠিন পাথরের দেয়ালের মত। পেরেক পোঁতা যায় না। ভাল কথা, ঈশ্বরের কথা মনে প্রবেশ করে না ; এক কান দিয়ে শুনে অন্য কানে বেরিয়ে যায়। তাই বার বার শুনতে শুনতে, আবৃত্তি করতে করতে যদি কিছু হয়। 'জপ' অর্থ পুনঃ পুনঃ একই নাম বা মন্ত্র উচ্চারণ করা। শাস্ত্রের আলস্য নেই, বার বার এক কথা বলার, 'শাস্ত্রেষু ণ জামিতা অস্তি।' ভাগবতে আছে, ভগবানের কথা "স্বাদু স্বাদু পদে পদে" (১।১।১৯)

একুশ ।। কথামৃত কেবলই অদোষদর্শী নয়, সমদর্শীও বটে। ছোট নেই বড় নেই। এক ঈশ্বর, তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ। 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

বাইশ ।। কথামৃতের বৈশিষ্ট্য, বিশ্বধর্মের কথা কেবল বলেননি,

বিশেষ করে মানুষের দৃষ্টিকে সচেতন করতে পাতায় পাতায় প্রচেষ্ট হয়েছে। বিশ্বধর্ম একটি দৃষ্টিভঙ্গি। জোর করে কোন এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য কোন সম্প্রদায়ে দলভুক্ত করা না। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে তার নিজস্ব চৈতন্য সত্ত্বা বিরাজ করছে—এটিতে দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে তার সুপ্ত ও গুপ্ত সম্ভাবনাময় 'চৈতন্য সত্ত্বাকে' বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করছে, এটি জানা। কোন ধর্মের প্রতি Condem-nation নয়, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে Conversion নয়। সকল ধর্মের প্রতি স্বীকৃতি, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। কাউকে জোর করে ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। মতুয়ার বুদ্ধি করা নয়, কেবল আমারটাই ভাল, অন্যেরটা মন্দ, এটা কিছুতেই নয়। এরই মধ্যে রয়েছে সর্ব ধর্মের সমন্বয়—সর্বভাবের, সর্বমতের, সর্ব পথের সমন্বয়। সকলেই এক সত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, আগে পিছে নিজ নিজ প্রকৃতি, সংস্কার অবস্থার মধ্য দিয়ে। এতে দৃঢ় বিশ্বাস চাই, চাই আত্মপ্রত্যয়। যার আত্মবিশ্বাস নেই তার কোনটাতেই বিশ্বাস হয় না। কথামৃত বলছেন, ধর্ম কোন মতবাদ নিয়ে ঝগড়া নয়। বিশেষ পাণ্ডিত্যও না—কথামৃতের ধর্ম ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখা। যেমন দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমি তাঁকে দেখেছি, তোমাকেও দেখাতে পারি, নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। ভারতের ঋষিরাও এই কথাই বলেছেন—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম। আদিত্যবর্ণং তমসা পরস্তাৎ'—আদিত্য বর্ণ সেই পুরুষ মহানকে আমরা দেখেছি। এই দেখা ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ কথামৃতের বাণীকে বিশ্বসভায় বলেছেন, "We must see Religion face to face, experience it and thus solve our doubts about it." (Complete works, Mayabati memorial edition vol III Page 175)

তেইশ ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বিশ্বকোষ, বহুশাস্ত্রের আকর। বহু শাস্ত্রগ্রন্থের যোগসূত্র বা সূচীপত্র স্বরূপ। ইংরাজীতে যাকে বলে, "link scripture." বহু শাস্ত্রের সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান কথামৃত থেকেই হয়ে যায়, গীতা, বাইবেল, কোরাণ, জাতক, সাংখ্য, বেদান্ত, তন্ত্র, ন্যায়, মীমাংসা কোনটা নয়, ভাগবত, মহাভারততো বটে-ই।

চব্বিশ ।। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যেমন অর্জুনকে সংসারে কর্ম করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন ; এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ত্তমান পৃথিবীতে শান্তির জন্য সমন্বয়ের কৌশল উপদেশ দিলেন কথামৃতে। বিজ্ঞান বাইরের দিক থেকে মানুষকে, পরস্পরকে একান্ত ভাবে কাছে এনেছে, কিন্তু মনের দিক থেকে একান্ত করতে পারেনি বরং আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অবিশ্বাস, হিংসায় ভরে গেছে। পৃথিবীর শান্তির জন্য চাই মনের সান্নিধ্য। তার মানে এই নয়, সকল মানুষ একভাবে চলবে, একভাবে বসবে, এক ধারায় ভাববে। এইরূপ আশা করা পাগলামি। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য। বহুকে প্রেমের সূত্রে গেঁথে রাখা। বহু পাশাশাশি থাকুক, কিন্তু হৃদয়ের উদারতা, প্রীতি, সহানুভূতি যেন ব্যাহত না হয়। সংঘর্ষের পথে না গিয়ে, পাশাপাশি থেকে পরস্পরের যে সম্প্রীতি এইটি সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের মধ্যে, সকলের মধ্যে, ছোট-বড়, কালো-সাদা ধনী-দরিদ্র যে যেমন ভাবে যেখানে আছে, চৈতন্যরূপী ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন, এইটি সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী। অদ্বৈত সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের দর্শন যদি বুঝতে হয় তাহলে, ঐ কথা-ই বলতে হবে, বাঁচো এবং বাঁচতে দাও। অপরের মত বুঝতে চেষ্টা কর। নিজে ঈশ্বরকে লাভ করো, অপরকে ঈশ্বর লাভ করতে সাহায্য কর। এই সমন্বয় সত্য-ই একটি সর্বাবগাহী মিলনশক্তি। অদ্বৈত পটভূমিতেই সমন্বয় সম্ভবপর। আর একটা বলা প্রয়োজন। এই সমন্বয়ের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবকে কোন একটি নির্দিষ্ট মতকে খাটো করতে হয়নি। যখন তিনি অদ্বৈতবাদী তখন তিনি পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী। আবার যখন তিনি ভক্ত, তখন তিনি পুরোপুরি ভক্ত। আশ্চর্য উদারতা ও সব কিছুর জন্য সকল মত ও পথের জন্য ভালবাসা যা আমরা কথামৃতে দেখতে পাই। এমন সামগ্রিক ভাব ইতিপূর্বে একই গ্রন্থে দেখা যায়নি। তার হয়ত একটিই কারণ, এই সমন্বয়ই মানুষের নানা দ্বন্দ্ব ও কলহ দূর করতে পারে। সকল মানুষের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করতে পারে। মানুষে মানুষে মিলন বর্ত্তমান যুগে যত বেশী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে,

অন্য কোন যুগেই এত প্রয়োজন হয় নি। তখন মানুষ মানুষের থেকে অনেক দূরে বাস করতো। এখন মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও জীবনযাত্রার সমস্যাগুলি অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে। এখন একে অপরের খুব সন্নিকটে হয়ে গেছে। সারা বিশ্বে একটি আওয়াজ উঠেছে, 'পৃথিবীর মানুষ এক হও।' একটা নতুন মানবগোষ্ঠী রূপ নিচ্ছে। A new type of humanity-one world। এখন আমার দেশ, তোমার দেশ, কথাগুলি তেমন আর মানুষের মনে দাগ কাটে না। আমরা এখন এক পৃথিবীর মানুষ। এই চিন্তার আড়ালে যে কথাটি আছে সেটি ভারতের চিরন্তন অনুভূতি। ঋষি বাক্য, 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—স্বামীজী বিশ্বধর্ম সভায়, এই ডাক দিয়েছিলেন—"Ye the divinity।" সারা বিশ্বজুড়ে এই অমৃতের সন্তানরাই বসবাস ক'রছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের কথা-ই বলেছেন কথামৃতে, উপলক্ষ্য হয়তো বিশেষ সময়ে বিশেষ ব্যক্তি, কিন্তু সকল লক্ষ্য সকল মানুষ, যে যেখানে আছেন! তিনি তাই দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়ীর ছাদে উঠে সাধনান্তে ডাক দিয়েছিলেন—"তোরা কে কোথায় আছিস আয়।" কেবলই কি গুটিকতক, নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র প্রমুখ তাঁর ডাকের উদ্দেশ্য ছিল? কয়েকটি ভক্তের জন্য অবতার হয়েছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বীজাকারে এই সব সমন্বয়ের কথা বলে গেছেন।—বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দূর-ভাষণের শাঁখ। তাঁরই কণ্ঠে পরমপুরুষ পৃথিবীতে ঘাটে, মাঠে, সভায় নানা মঞ্চে হাঁক দিয়েছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন 'জাগো, দেখো, নিজেকে জানো। প্রার্থনা করেছেন, মা, আমাদের মানুষ কর।

পঁচিশ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের বৈশিষ্ট্যের কথা বলে শেষ করা যায় না। গিরিশচন্দ্র কাশীপুর উদ্যান বাটীতে ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ অভয় দান মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি দেখেছ গিরিশ, এতো যে বলো?" গিরিশ বলেছিলেন, ব্যাস বাল্মীকি যাঁর কথা বলে ইতি করতে পারেনি, আমি আর তার কথা কি বলবো। ধন্য গিরিশ! আমরাও তাই বলছি, যতটুকু তিনি কৃপা করে বলার সামর্থ্য দিয়েছেন ততটুকুই বলা গেল। যার শেষ নেই, তার শেষ কে করবে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অমৃত কেন?

১৮৮২-র ২৬ ফেবরুয়ারী তারিখটিতে সর্বজনশ্রদ্ধেয় কথামৃতের শ্রৌতঋষি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম বা মাষ্টারমশায়—শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের শ্রী পাদপদ্ম দর্শনলাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। আজ বেশ বুঝতে পারা যায়, তিনি একান্ত দৈব প্রেরণায় ভগবান সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন। ঐ দিনটি তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের জন্মদিন হিসাবেই গণ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মর্ত্তধাম ছেড়ে যাবার তিন বৎসরের মধ্যেই শ্রীম অতি সযত্নে লিখিত ও রক্ষিত দিনলিপি থেকে ভগবানের কথামৃত জনসমক্ষে উপহার দেন। ইতিহাসে এই দিনটি একটি স্মরণীয় দিন। এই কথামৃতের সাথে জগতের কোনও বই বা শাস্ত্রের তুলনা হয় না। এটি সত্য নিরুপম। যতদিন কথামৃত জগতের আলো দেখেনি, মানুষ জানতো না ভগবান সামনে বসে কথা বলেন। তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী চলন-বলন কেমন। ভগবান মানুষ হয়ে যখন নরলীলা করেন তখন ঠিক ঠিক মানুষের মতোই যেসব তাঁর এটি বিশবাস করা খুব-ই কঠিন। তাই মাষ্টার মশায় photocopy যেমন হয়; আরও এগিয়ে বলা চলে XE-ROX copy করে জগতকে ঈশ্বরের অনুলিপি উপহার দিয়েছেন। সব ঠিক ঠিক। দিন, ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র, পাত্র, পরিবেশ, দৃশ্যপট সব ঠিক ঠিক। তাই তিনি প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকাতে বলেছেন, "ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দিবসের মধ্যে নানা অবস্থায় দেখিতেন। ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখন একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে নানাভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আপাততঃ সন্নিবেশিত হইল।" দিনে, রাতে, সকাল সন্ধ্যায় নানাভাবে নানাস্থানে, যখন যেমন দেখছেন, ঠিক হুবহু সেই চিত্রটিকে, মানসপটে এঁকে নিয়ে, শ্রীরাম-কৃষ্ণের মুখ থেকে কথামৃত যেমন ভাবে ঝরে পড়েছে, শ্রীম সেই গুলিকে আপন কোঁচড় ভরে তুলে রেখেছেন নিজের দিন-পঞ্জিকাতে। তাই তিনি বলতে পারছেন, "যাহা ভক্তেরা সেইদিনই

লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীম-কথিত চরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ।"

শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন তিনি সেই দিনই রাত্রে (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণ বা Diaryতে লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত কর্ম, তারিখ, তিথি, নক্ষত্র, বার সমেত।

অধ্যাত্ম জগতের ইতিহাসে এমনটি আর নেই, কোনও অবতারেই এটি সম্ভব হয় নি। Direct তো দূরের কথা, বহুকাল পরে, বহু হাত ঘুরে একদিন মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে। গীতা, ভাগবত সবই তাই। Bible, কোরাণও তাই। বহুদিন বাদে বহু হাত ঘোরাতে ঠিক জিনিষটি পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া সমসাময়িক মানুষ বা পরিচিত কেউ না থাকাতে সব ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করাও মুশকিল। সত্যের অপলাপ স্বাভাবিক।

তাই বলছিলাম শ্রীশ্রীকথামৃত আর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু আলাদা না। একথা বললে-ই তো প্রমাণ হলো না। কে এর প্রমাণ দিতে পারেন? পারেন একমাত্র তিনিই, যিনি ছিলেন সর্বকালের জন্য। সর্ব সময়ের জন্য, মহতের সাক্ষী। যিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের সব যজ্ঞের সর্ব সাধনার সিদ্ধি ঋদ্ধি। একমাত্র 'যুগ-ধর্ম পাত্রী' শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী। যতদিন পর্যন্ত শ্রীম মার কথা শুনতে পাননি, ততদিন তিনি ছিলেন বড়ই উদ্বিগ্ন, কে বলে দেবে এটি ঠিক। মা যেদিন নিজের জবানীতে সাক্ষ্য দিলেন, সেদিন জগৎ পরিপূর্ণ ভগবানের বাণীরূপ দেখতে পেল পৃথিবীর আলোতে উদ্ভাসিত। মা বলছেন, "বাবাজীবন, তাঁহারই নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোনও ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যক মতো তিনি-ই প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই এ সমস্ত কথা বলিতেছেন।"

সত্যসত্য-ই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আজও কথা বলছেন তাতে আর সন্দেহ করার কি রইল? সেদিন যেমন বলেছিলেন, আজও তেমনি বলছেন। পার্থক্য কেবল আজ আমরা শুনছি, পড়ছি, সেদিন যারা শুনেছিলেন তাঁরা কালের, ইতিহাসে অমর হয়ে গেছেন। কারণ অমৃত পান করে আর মর থাকতে তো পারেন না।

এর-ই সাথে আরও একটি কথা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করতে হবে, মনে রাখতে হবে, স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন বেদের একমাত্র ভাষ্যকার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণীমূর্তি। তিনি কি দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকে দেখেছেন, গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দিয়ে একে যাচাই করা যায় না। স্বামীজী লিখেছেন, ১৮৮৩ ৭ই ফেব্রুয়ারী আঁটপুর থেকে, 'এই হিমালয়ের মতো কাজকে।' স্বামীজীর নিজের ভাষাতে বলি; Thanks ! 100000 Master ! You have hit Ramkristo in the right point. few alas, few understand him ! My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find anybody thoroughly launched in to the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter."—ঋষিবাক্য। একে আশ্রয় করে জগতে শান্তি আসবে। এটি এককথায় শান্তির দূত। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের স্মৃতি জেগে উঠে কিন্তু, তাও যেন ম্লান হয়ে যায়; যখন ভাবি বন্যার মতো ঝরে পড়েছে শ্রীমুখ থেকে অমৃত ধারা—এ ধারায় স্নান করতে হয় না; তর্পণ করতে হবে না —কেবল কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেই আর মৃত্যুভয় থাকবে না।

পরীক্ষিৎকে প্রায়োপবেশন করে, গঙ্গাতীরে বহু ক্লেশে কৃচ্ছ্র-সাধনা করে ব্রহ্মবিদ্ শুক গোস্বামীজীর কাছ থেকে ভাগবৎ কথা শুনতে হয়েছিল। এ যেন আরও অনেক সহজ, সুলভ পুস্তকাকারে সাজান রয়েছে। সামান্য আয়াসে স্বল্প মূল্যে নিয়ে এসে নিজের মত করে পান করা যায়, শুনা যায়, স্মরণ মনন যা ইচ্ছা তাই করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত অমৃত কথা "আমি ষোলটাং

করেছি, তোরা একটাং কর। আমি রেঁধে বেড়ে রেখেছি, তোরা বসে যা, বাড়া ভাতে বসে যা আর অমর হয়ে যা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত কেমন জানো? স্বামীজী বলছেন, মাষ্টার-মশাইকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ১৮৯৭, ২৪শে নভেম্বর তারিখে "It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal, so plain and easy....Socratic dialogues are Plato all over....You are entirely hidden. He is with you".

মা বলেছেন, "এ সকল তাঁরই কথা বাবা।" স্বামীজী তাকেই আরও জোর দিয়ে আমাদের দুর্বল মনেতে ছাপ দৃঢ় করেছিলেন, তাঁর অনবদ্য ভাবে ও ভাষায়। 'এ সব তাঁরই ছবি তাঁরই কথা।' লেখকের এখানে বিন্দুমাত্র মনের ছোঁয়া নেই।

যেমন এ অবতারে পেয়েছি অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মানুষরূপ বিগ্রহ সেটি আর কোনো কালেই ছিল না, হয়নি। ঈশ্বরের photograph! তেমনি পেলাম তাঁর শুচি সুন্দর অমৃতময় জীবন ও বাণী। ছবি আর কথামৃত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে কি আছে? না, অমৃত আছে। যে অমৃত পান করলেই মানুষ অমৃত হয়ে যায়। কি সেই অমৃত? শ্রীরামকৃষ্ণ। এতে আছে যে শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র শ্রেয়, লভ্য, কাম্য ও প্রতিপাদ্য। মাষ্টারমশাই তাই বলতেন, যারা উত্তরকালে তার কাছে যেতেন তাদের দেখে, "আমি আর কি করি? অমৃতসাগর থেকে এক ঘড়া জল (অমৃত) তুলে রেখেছি, যে যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে আসে তাদের পান করাই। শ্রীরামকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ সাগর; তার থেকে এক ঘড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

শাস্ত্র, গ্রন্থ, তিনভাবে অনুশীলন করতে হয়। সকল শাস্ত্রই তা ব্রহ্মসূত্র, কোরাণ, গীতা, বাইবেল, ভাগবত যাই হোক না কেন। প্রথম জানতে হবে, যে গ্রন্থ আমি পাঠ করবো, অনুশীলন করবো, তার উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয় হোল উপায় কি এবং তৃতীয় হোল

গ্রন্থপাঠের সার্থকতা কি ? কথামৃত পাঠ করতে গিয়ে এই তিনটি বিশেষ করে যদি মনে রাখি তাহলে সহজেই এর ভিতর ঢুকে পড়তে পারবো। সত্যি কথা, যে বই পড়বো, সেই বই পাঠের মূল উদ্দেশ্য কি সর্বপ্রথমে তা জেনে নিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মূল উদ্দেশ্য কি—ঈশ্বরলাভ, একমাত্র মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এইটিই নির্দেশ। তাতো হলো জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু তা কি সম্ভব ? এ কথাটা স্বাভাবিকভাবে মনে জাগবে। তাই কথামৃত স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন, হ্যাঁ, ঈশ্বরকে দেখা যায়। কথা বলা যায়, লাভ করা যায়—জগতের অন্য যেকোনও বস্তুর মতোই। আর তার উপায়ও আছে। যদি জানতে চাও তাহলে তোমার বা প্রত্যেক মানুষের উপযুক্ত, সাধ্যমত ব্যবস্থা বা উপায় বলা আছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ খুব জোর দিয়ে বলছেন, আজ পর্যন্ত মানুষের মনে যত প্রশ্ন উদয় হয়েছে, হচ্ছে, হবে, সকল প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান এতে আছে। তাহলে যেকোনও প্রকৃতির মানুষ, ছোট, বড় বা দুর্বল, শক্তিমান, ভক্ত, অভক্ত, জ্ঞানী, ধ্যানী, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী, আস্তিক, নাস্তিক সকল মানুষের জন্যই এই কথামৃত পথ বা উপায় নির্দেশ করেছেন।

আর শেষ কথা, আচ্ছা, ঐ দুটো তো বুঝলাম, কিন্তু পড়লে আমার কি লাভ হবে ? লেখাপড়া করলে গাড়ী ঘোড়া চড়া যায়। ডাক্তার, উকিল ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক আরও কত কি হওয়া যায়—জীবনের সমস্যা পেট, তার সমাধান হয়। কথামৃত পড়ে কি সমস্যার সমাধান হবে ?—উত্তর, হ্যাঁ। সকল সমস্যার মূল সমস্যা যেটি সেটির সমাধান হবে। সেটি কি ? ঐটি জানা থাকা চাইতো ! আমরা কি বুঝি বা জানি ? আমরা মূলতঃ কি চাইছি ? নানা বস্তুর চাওয়ার মধ্য দিয়ে যা খুঁজছি, সেটির বোধ আমাদের নেই। অনেক ঘা খেয়ে খেয়ে, বহু দুঃখ জ্বালা ভোগ করে বুঝি আমরা খুঁজছি একটু আনন্দ, একটু প্রশান্তি। জীবনে লড়াই করে করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমাদের কখনও কখনও এ চৈতন্য উদয় হয়, তখন মনে হয়, তাই তো ! আমি তো অসংখ্য জিনিস চেয়েছিলাম কিন্তু তাতো আমার সত্যিকারের চাহিদা নয়। আমি তো চাই আনন্দ। অখণ্ড আনন্দ ! ক্ষুদ্র শান্তি নয়—পরম শান্তি যা বস্তু ফুরিয়ে গেলেই

ফুরিয়ে যাবে না। তাই না শ্রুতি বলেছেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে-সুখমস্তি।" যদি বুঝি তখন দেখবো কথামৃত আমাকে অকাতরে অমৃত ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। আমি আকণ্ঠ পান করেও তা ফুরোতে পাচ্ছি না। অমৃতের সাগর—শান্তির পারাবার কেবলই শান্তি। আর তা পান করে সেই কথাই বলতে হবে "হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।" আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। আর যত খাও, ভয় নেই—ডুবে যাও ভয় নেই। এ সাগরে পড়লে কেউ মরে না। এ অমৃতের সাগর! একেই শাস্ত্র বলছেন, জীবন-মুক্তি। জীবন হারিয়ে ফেলা নয়, মৃত্যু নয়, সব পাওয়ার আনন্দ যা হোল পূর্ণতা প্রাপ্তি।

এ কথামৃতের বড় বৈশিষ্ট্য এ পড়তে হয় না। শুনলেই হয়ে যায়। যেমন ভাবেই হোক প্রাণে গেলেই হোল। আরও আশ্চর্যের কথা, এ কথামৃত পড়ে বুঝতে কোনও বিশেষ যোগ্যতার দরকার হয় না। সকলেই নাকি বুঝতে পারে। জগতে এমন কোনো শাস্ত্র আছে যা সকলে বুঝতে পারে? থাকলেও আমাদের তা জানা নেই। শাস্ত্র নানাভাবে লেখা, তাতে অনেক তর্ক-বিতর্ক থাকে। এক শাস্ত্র বলে এই, অন্য শাস্ত্র বলে ঐ। এখন কোনটা নেবো? সাংখ্য বলছে এক কথা—বেদান্ত বলছে অন্য কথা। ঈশ্বর আছেন কি নেই, এ নিয়েই তো কত শত বই। আবার কত শাস্ত্র বলছে, ঈশ্বর প্রমাণ করা যায় না। "ঈশ্বরোঽসিদ্ধঃ।" নাও ঠেলা কে এই জঞ্জাল পরিষ্কার করে আসল সারটি নেবে? কত জানতে হবে, পড়তে হবে তাকে? বলা আছে শাস্ত্রে, চিনি বালিতে মেশান আছে। আমার চাই চিনি, বালি ঝাড়তে ঝাড়তে প্রাণ চলে যাবে। "স্বল্পায়ুঃ বহবশ্চ বিঘ্না।" তাই দরকার কি অতশত পড়বার? কথামৃত পড়তে কেবল আক্ষরিক বিদ্যার দরকার হয়, তা না থাকলেও চলে—শুনতে হবে একাগ্রতা নিয়ে, নিষ্ঠা নিয়ে। এই পুঁজি সকলেরই আছে। আর একটি সুবিধা এমন সহজ সরল সকল মানুষের বোঝবার উপযোগী। আর আশ্চর্যের কথা যে, ওর মধ্যে এমন কোনও কঠিন শব্দ নেই। কোন শক্ত কথা নেই উপমা নেই যা আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে গ্রহণ করতে। আগে শুনেছি উপমায় নাকি কবি কালিদাস শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বলা হ'ত

'উপমা কালিদাসস্য।' না, এখন কথামৃত প্রকাশিত হবার পর বলতে হবে "উপমা রামকৃষ্ণস্য।' এটি নিরুপম। সাধারণ মানুষের জীবনের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাই এখানে রয়েছে। পড়লে বা শুনলে মনে হয় বুঝি বা আমার নিজের জীবনের ঘটনাই হবে। তাই এক একটি দৃশ্য যখন পড়ি বা শুনি তখন মনে হয় আমিও বুঝিবা ওর মধ্যে আছি বা ছিলাম। এটি কিন্তু খুবই সত্যি। ধ্যানের বস্তু হয়ে দৃশ্যগুলি আমার সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে যায়, আর আমি হয়ে পড়ি চিরকালের মানুষ, নিত্যকালের সত্তা। যেন তখনও ছিলাম, আজও তেমনি তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে বসে অমৃতকথা পান করছি। এই যে অভিন্নবোধ এটি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের নিজস্ব অবদান। উত্তম বৈদ্য জোর করে ঔষুধ গিলিয়ে দেন। কথামৃত জোর করে কিছু করেন যা আমার মধ্যে আমার অজান্তে আস্বাদন হয়। উপলব্ধি হয়ে রক্তে প্রাণে শিরায় শিরায় মিশে যায়।

স্বামীজী বলছেন, কথামৃত পড়লে 'আমার সমাধি হয়ে যায়। (I am really in a transport when I read them).

রাজামহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যারা কথামৃত বার (১২) বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়বে, তারা ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাবে। ঋষিবাক্য ; এসব মিথ্যে হবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়লে বা শুনলে হাতে হাতে এই লাভ! ঠাকুর মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন, মা, এখানে যারা আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়। প্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতি দুই-ই।

প্রথম দিন প্রথম দর্শনে মাষ্টার মশায়ের অভিজ্ঞতা বড়-ই সুন্দর। বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছেন রাণী রাসমণির ঠাকুর বাড়ীতে। সুন্দর ফুলের বাগান, সুন্দর মন্দির আর সর্বোপরি চক্ষের সামনে দেখলেন সুন্দর অমৃতময় পুরুষ। মাষ্টার মশায় জানেন না কে ইনি? তার মনে হলো এখানে সাক্ষাৎ শুকদেব বসে ভাগবত কথা বলছেন, আর সর্ব তীর্থের সমাগম হয়েছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্যদেব ৺পুরী ক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ও ভগবানের নাম গুণকীর্তন করছেন। মাষ্টার মশায় চোখ ফেরাতে পারছেন না। প্রথম পরিচয়ে দুটি একটি কথা হলো মাত্র। মাষ্টার মশায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একটু অন্য-

মনস্ক দেখলেন, তাই প্রণাম করে বিদায় নিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন "আবার এসো।"

মাষ্টার মশাই বাড়ী ফিরে গেলেন কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে "ঐ সৌম্য কে?" একবার দেখাতেই মন এমন ভাবে আকৃষ্ট হোল! কেবলই তাঁর কাছে যেতে চাইছে মন! ইনিও তো বলেছেন, "আবার এসো।" ঈশ্বরের নিমন্ত্রণ এমনি-ই সকলের জন্য সর্বক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। কেউ শুনতে পায়—কেউ পায় না। যেদিন তিনি মানুষকে মন দিয়ে মনকে চোখ ঠেরে বলে দিয়েছিলেন, যাও, সংসার রঙ্গমঞ্চে কালিঝুলি মেখে একটু রঙ্গ-রসের খেলা খেলে এসো, সেদিনও ঐ একটি কথাই বলেছেন "আবার এসো।" তাই ঠাকুর কুঠি বাড়ীর ছাদে উঠে ডেকেছিলেন, কে কোথায় আছিস আয়! আমি তোদের ছেড়ে থাকতে পাচ্ছি না। এটি অনন্তের ডাক। মাষ্টার মশায়ের প্রাণে ঐ ডাক ঠিক বেজেছিল। তাই তার ফিরে যাবার তাগিদ। তাঁকে না দেখে আর থাকতে পারছেন না। এইটি শ্রীশ্রীকথামৃতের সাক্ষাৎ প্রাপ্তি। যতই ভুলে থাকি না কেন, কথামৃত পড়লে শুনলে ঘরে ফিরে যাবার ডাক। 'আবার এসো " সন্ধান আপনি-ই মনে জেগে উঠবে।

নিজেই কথামৃতে বলছেন, আমি জাত সাপ, কেউটে—তিন ছোবলেই শেষ। বেশী কষ্ট দিই না। ঢোঁড়া বা হেলে সাপ যখন কোলা ব্যাঙ ধরে, দুজনের-ই কষ্ট। সাপটা কোলাব্যাঙকে গিলতে পারে না, উগরাতেও পারে না। দুজনেরই অশেষ যন্ত্রণা। ঠাকুর কিন্তু বলছেন, এখানে "এলে গেলে-ই হোল।" কান দিয়ে কথামৃত শুনলেই হোল। এর বেশী কিছু করতে হবে না। বলছেন যে "একে (নিজেকে দেখাইয়া) চিন্তা করলেই হবে আর কিছু করতে হবে না। তিনি জগতের আদর্শ। তাঁকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধনা। আর সাধনা যদি দরকার হয় তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধনা এ যুগে। কারণ তিনি কে? নিজেই বলছেন মাষ্টার মশাইকে—"নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া—এর ভিতরে যদি কিছু থাকে (পদসেবা করলে)

অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়"। আবার বলছেন, "এখানে অন্য লোক নাই, সেদিন হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার…… দেখলাম পূর্ণ আবিভাব।" (৭ই মার্চ ১৮৮৫)

তাই বলেছেন কি করবে তোমরা ? "বিশ্বাস করো.নির্ভর করো তাহলে নিজেকে কিছু করতে হবে না—মা কালী সব করে দেবেন।" মা-কালী আবার কে ? তিনি নিজে-ই। এযে তাঁরই কথা। এই তো কথামৃতের অমৃতের সন্ধান -- আস্বাদন। আমরা সকলেই তো গিরীশবাবুর বকলমার কথা শুনে গোপনে ভাবি, হে প্রভু, আমাদের এমনি হয় না। আমাদের বকলমা তিনি নিজে নিতে পারেন না। তিনি চাইছেন—চেয়েছেন কথামৃতের মধ্য দিয়ে বারে বারে, এসো আমার কাছে এসো, দাও তোমাদের বোঝা, আর আমার উপর ভরসা করো, নির্ভর করো। আমি তো তোমাদের ভার নিতেই জগতের মানুষ হয়ে তোমাদের মধ্যে এসেছি। দিতে আমরা পারছি কৈ ? তাই নিজেই দুঃখ করে বলছেন, "তারে কেউ চিনলি নারে ! ও যে পাগলের বেশে (দীন-হীন পাগলের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।"

এই কথা-ই তিনি বলছেন, দেখো, এটি-ই ভক্তির শেষ কথা মনে করো না অমি ধর্মকে হাল্‌কা করে দিচ্ছি। এইটি-ই নারদীয় ভক্তি। আবার এটাই যুগধর্ম, নির্ভর করা। নির্ভরযোগ্য মানুষ দেখে নির্ভর করতে পারলে সেই তোমার দায় দায়িত্ব বইবে। শ্রীম তাই বলেছেন তিনি একটি প্রত্যক্ষদর্শী। সব জানেন, তাঁকে বিশ্বাস করবে না তো কাকে আর করবে ?"

এই কথামৃতের কথা অমৃত, কারণ এর উৎস অমৃত সাগর সচ্চিদানন্দ সাগর। আর কি করে ঐ সাগরের অমৃত সহজে পান করা যায় তাও বললেন, কিন্তু তাতেও সকলের মন যদি না ভরে তাদের জন্যও বলেছেন ; তোমরা হয়তো ভাবছ, সকলেই কি ভক্তি পথের লোক ; আর শুধুই কি একটা পথ তাহলে তো একঘেঁয়ে। মানুষ নানা প্রকৃতির; বিভিন্ন রুচির তাদের কি হবে ? হ্যাঁ, তাও বলছেন, কথামৃত—অমৃত সাগরে যাবার,—স্নান, পান করবার রাস্তা অনেক। মা যেমন রান্না করেন পাঁচ ছেলের জন্য

যার পেটে যেমন সয়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের। বিভিন্ন প্রকৃতির জন্য কথামৃতে পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর কথাই শুনি, বলছেন শশধর পণ্ডিত মশাইকে—"দেখ অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোনও প্রকারে হউক পড়তে পারলেই হোলো। মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোনও মতে সেই অমৃত একটু মুখে পড়লে-ই অমর হবে। তা তুমি নিজে-ই ঝাঁপ দিয়ে-ই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে যাও বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলে-ই দিক, একই ফল।—একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।

"অনন্তপথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি যে পথ দিয়েই যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।" মোটামুটি যোগ তিন প্রকার —জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তি যোগ।

জ্ঞানযোগ কি? জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায় নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। বিচারের শেষে যেখানে সমাধি হয় তারপর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

কর্মযোগ কি? কর্মের দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। সংসারী লোক যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম করে সেও কর্মযোগ, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে পূজা জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ—ঈশ্বর লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

ভক্তিযোগ কি? ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন করে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। কর্মযোগ বড় কঠিন।

প্রথমতঃ আগেই বলেছি সময় কৈ? শাস্ত্র যে সকল কর্ম করতে বলছে তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফল না কামনা করে কর্ম করা ভারী কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়ত জান না কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে। জ্ঞানযোগ এ যুগে ভারী কঠিন। জীবের অন্নগত প্রাণ তাতে আয়ু কম, আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞান হবে না।

তাই কথামৃতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজে সমন্বয়

করে মানুষের পক্ষে এই যুগে কি ঠিক, কোন পথ সহজ তাই সর্বশেষে বলেছেন—"এই যুগের পক্ষে ভক্তি যোগ। এই পথে অন্যান্য পথের থেকে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞান যোগ কর্মযোগ বা অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু ঐসকল পথ ভারী কঠিন। ভক্তিযোগ যুগধর্ম। তার মানে এই নয় যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে। জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর অর্থ হোল যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

তিনি নিজে সমস্ত সাধনা করেছেন। সব পথে গেছেন কোনটি আমাদের জন্য সহজ ও স্বল্প আয়াসে কোন পথে ঈশ্বর দর্শন হতে পারে। সেইটিই তিনি নানাভাবে আমাদের বলেছেন। সমন্বয় করলেন তিনি মতের, পথের, সকল ভাবের, সকল ধর্মের। সব ঠিক। কিন্তু অধিকারী ভেদে প্রত্যেকের আলাদা পথ। ৺গীতা পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা। তাতেও সনাতন ধর্মের সার কথা বলা আছে। যুগে যুগে ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের যে নিহিত সত্যটি তা যুগের উপযোগী করে বলেন। আবার কালে কালে পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের বোঝবার, পালন করবার, অসুবিধা হয়; তাই নতুন যুগে আসেন যুগের মত হয়ে আসেন অবতার আর বলেন যুগের জন্য ধর্ম কি? সকল কালের ধর্ম, সকল ধর্ম, সব ঠিক কিন্তু যুগের জন্য অবশ্য-ই আলাদা একটি নির্দিষ্ট পথ থাকবে যাকে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, "সদ্য নির্মিত রাজপথ।" আর এটি হচ্ছে নারদীয় ভক্তি যা কথামৃতের অক্ষরে অক্ষরে পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে। কুড়িয়ে নিলেই হলো।

আমাদের বেদ-বেদান্তে সর্বশাস্ত্রে একটি প্রশ্ন বারে বারে জিজ্ঞাসিত হয়েছে 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে, সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি (মু, উ ১৷৩) "কি জানলে সব জানা যায়! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ঠাকুর, মাষ্টারমশায়কে দ্বিতীয় দিনেই বলেছিলেন, এক জানার নাম জ্ঞান, বহু জানার নাম অজ্ঞান। সেই এক, ঈশ্বর! "একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। ঈশ্বরকে জানলেই সব জানা হয়ে গেল। তাই ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। কর্ম নয়;

কর্ম আদিকাণ্ড, তাই কর্ম কমাতে হবে। বেশী কর্ম জুটলে ঈশ্বরকে ভুল হয়ে যায়। তাই কথামৃত প্রার্থনা করতে শেখালেন, "আমি সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—আমার আন্তরিকতা ব্যাকুলতা কিছুই নাই। আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও। আমাকে সদাসর্বদা তোমার কাছে রেখে দাও, বেশী কাজের মধ্যে দিও না। তবে তুমি যে কটি কাজ করাবে তাই করবো! নিজে ঠাকুর এমনি করে প্রার্থনা করছেন জগতের মার কাছে।"

এই বুদ্ধি রেখে সংসার করা। সংসারের সকল কাজ করা। আছি সংসারে, অনেক সমস্যা, জপ-ধ্যানের সময় নেই বেশ কথা, কিন্তু কথামৃত পাঠ করা, পান করা তারই মধ্যে চলতে পারে। আর তা থেকেই পাব স্মরণ-মননের খোরাক! কথামৃতে গার্হস্থ্য সন্ন্যাসের কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গৃহী কিন্তু সন্ন্যাসী কেমন করে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "হয়। মনে সন্ন্যাস— ঐটি তো বড় কথা। মনেই বন্ধ মনে মুক্ত। ঠাকুর বলছেন, 'সংসারে কেন হবে না গো? আমি তোমাদের ঘর বাড়ী পুত্র পরিজন ছাড়তে বলছি না। এইটুকু বলি যে, সংসার কর, কেবল তাঁর সংসার—এটিতে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে। তিনিই কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা এইটি নিত্য সকল কাজের মধ্যে অভ্যাস করতে হয়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গা। হাতে তেল থাকলে আঠা লাগে না। ঈশ্বরকে ধরে সংসার করলে সংসারের তাপ লাগবে না। যেমন খুঁটি ধরে ঘোরা—এতে পড়বার ভয় নেই। এ কথাই ভাগবতে বলছেন একজন ঋষি—নিমিরাজকে—

"যানাস্থায় নরোরাজন ন প্রমদ্যেত কর্হিশ্চিৎ।
ধাবণ্ নিমীল্য বা নেত্রেণ স্খলেন্ন পত্বেদিহ ॥ (১১।২।৩৫)

ভাগবত ধর্ম আশ্রয় করলে কেউ প্রমাদগ্রস্থ হয় না। বিভ্রান্ত হতে পারে না। যতই দুঃখ, কষ্ট, বিপদ আসুক না কেন! এমনকি যদি চোখ বুজে পথ চলে, দৌড়য়, সে পড়ে না।

পরীক্ষা করতে হবে, আরোপ করতে হবে অভ্যাসের দ্বারা— এইটিই সকল ভাগবৎ শাস্ত্রের প্রতিশ্রুতি। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের তো বটেই! কথামৃতের আর একটি নির্দেশ আছে—যদি

শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরলে তবে ঝাঁপ দাও ডুব দাও। ভেসে থাকলে রত্ন পাবে না।

পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সম্বন্ধে মাষ্টারমশাই নিজের একটি অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেটি তাঁর নিজের উপলব্ধি। কথামৃত শুনে শুনে পাঠ করে কি তার লাভ হয়েছে সেটি বলছেন ভাগবতের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

এই শ্লোকটি শ্রীমৎ ভাগবতের দশম স্কন্দের ৩১ অধ্যায়ে যে ১৯টি শ্লোক আছে, তাদের নবম শ্লোক। কথামৃতের পাঁচটি প্রত্যক্ষ গুণ, এ কেবল শব্দ বা কথা নয়, অমৃত, যা খেলে বা শুনলে মৃত্যু ভয় থাকে না।

প্রথম ঃ তপ্তজীবনং তাপিত জীবন, দুঃখক্লিষ্ট জীবন মুহূর্তে শান্ত হয়। দুঃখ জর্জরিত জীবনে এই কথামৃত শান্তির বারি সিঞ্চন করে।

দ্বিতীয় ঃ কবিভিরীড়িতং—এই অমৃত বাণীর কথা জ্ঞানী, গুণি ও মহৎ ব্যক্তিরা সর্বদাই গুণকীর্ত্তন করে থাকেন।

তৃতীয় ঃ কল্মষাপহম্—পাপ নাশ করে, পাপ ধুয়ে মুছে দেয়।

চতুর্থ ঃ শ্রবণ মঙ্গলং—যারা শুনবে তাদের অশেষ কল্যাণ হবে। আর একটি খুব বড় গুণ আছে যা—

পঞ্চম ঃ গুণ—শুনলেই ভাল লাগবে। এটি শ্রীমৎ অর্থাৎ মাধুর্য্যময়। একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, যাতে মন আপনি আকৃষ্ট হয়। এমন এক সুষমা আছে যাতে জ্ঞান বৈরাগ্যের উদয় হয়। সংসারাসক্তি কমে যায়। আর এর (কথামৃতের) কাজ বিশাল, অফুরন্ত, শেষ নেই। নিয়ে খেয়ে, শুনে যা শেষ করা যায় না। যারা এর আশ্রয়ে আসে বা যারা যেখানে যেমনভাবে শোনায় বা শোনাবার ব্যবস্থা করে তারাই প্রকৃত "ভূরিদা জনাঃ"—দান করে। এর চেয়ে বড় দান আর হয় না।

এতগুলি ফল এক জায়গায় আছে। মাষ্টারমশায় তার নিজের

জীবনে এগুলি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সারা জীবন, শেষ দিন পর্যন্ত্য যে যখন যেমন ভাবেই তার কাছে গেছে ; তিনি তাঁকেই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অকাতরে বিতরণ করতেন। এই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ, "আত্মনো মোক্ষার্থং," কেবল নয় "জগদ্ধিতায় চ।"—ছিল তার উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মাষ্টারমশায় (শ্রীম)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত চিরধন্য পুরুষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের শ্রৌত ঋষি। রামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুই শ্রেণীর যোগীর কথা উল্লেখ করেছেন, এক বক্ত্য যোগী, দুই গুপ্ত যোগী। মাষ্টারমশায় দ্বিতীয় শ্রেণীর। সমস্ত কথামৃতে কোথাও নিজের কথা একটুও নেই। "নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু," এই মন্ত্রের সার্থক রূপ। সেন্টপল যেমন বলে ছিলেন ; "আমি যে বেঁচে আছি, এ আমি নই, শ্রীযীশু।" মাষ্টার মশায়ের জীবনে ঐকথা যে কত সত্যি তা কথামৃতের পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেছেন, দেখেছেন তারা এক বাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। সারা জীবন ধরে একখানা বই লিখলেন, একখানা বই পড়লেন, তর্জ্জমা করলেন। তাই বলতে বাধা নেই, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাসদেব। বহুলোকের প্রশ্ন, এমন সোনার কলম যার তিনি আর একটিও আঁচড় কাটলেন না, এ কেমন কথা! নিজের কথায় তিনি বলেছেন, 'এ কি আমার কাজ, তিনি নিজে কৃপা করে জীবনে আনলেন লেখালেন, নিজে করিয়ে নিলেন। এ কি মানুষের কাজ।"

কথামৃতের কথা ও মাষ্টার মশাইয়ের জীবন কাহিনী আলাদা করা যায় না। কথামৃত সরিয়ে নিলে, মাষ্টারমশায়ের কিছু থাকে না। এ যেন সেই 'এক-কে' বাদ দিলে সব শূণ্য, আর শূণ্যের 'আগে 'এক' থাকলে অনেক।

আমরা বলি মাষ্টারমশায়ের দিনলিপি। কথাটা প্রকৃত পক্ষে তা নয়। বলা উচিত শ্রীরামকৃষ্ণের কতগুলি দিনের দিনলিপি।

যে কটা দিন মহেন্দ্র নাথ তাঁর সান্নিধ্যসুখ লাভ করেছেন, তাঁর অমৃতবর্ষী কথামৃত পান করেছেন, দিনান্তে নানা ভাবে দেখেছেন, তারই প্রতিচ্ছবি সোনার তুলিতে খাতাতে তুলে রেখেছেন, নিখুঁত ভাবে যতটা সম্ভব। এমনটি কোন অবতারে নেই। তাঁদের উপদেশ, কথা, জীবন কাহিনী শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় অবতারের লীলাবসানের বহু পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই অবতারে এটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আর একটি হচ্ছে ঈশ্বরের অবতার বিগ্রহের ফটোগ্রাফ্ (Photograph)। নিজেই তো ১৪ই মার্চ ১৮৮৬ সালে গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করে বলেছেন—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি তার মধ্যে এই রূপটিও দেখছি।" কেবল কথামৃতের মাধ্যমে তাঁর জীবন্ত কথা নয়, ঈশ্বরের মানুষ রূপটি রেখে গেছেন, কলির মানুষের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে।

মহেন্দ্রনাথের জীবন কাহিনী, একটি আত্ম বিলুপ্তির কাহিনী। এমনি আত্ম বিলুপ্তির ইতিহাস খুব কম আছে। অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বাইরে মহেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণ ঘরানায় লালিত পালিত, রামকৃষ্ণ গড়নে গঠিত একটি জীবন।

একটি বিষাদের দিনে এঁটো পাতার মত উড়তে উড়তে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছিলেন। দেব-নির্দেশ ছাড়া একে কি বলা যায়। যিনি ছড়িদার হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন, ভাগ্নে সিধু মজুমদার; সারা কথামৃতে তাকে আর দেখি না। কোথায় গেলেন তিনি। তিনিই তো রাণী রাসমণির বাগানে সাধু দেখাতে নিয়ে এলেন মামাকে। তিনিও তো দেখে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, বিন্দে ঝি-র অনুমতি পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রথম সন্ধ্যায় প্রবেশ অধিকার পেয়েছিলেন—সান্নিধ্যসুখ লাভ করেছিলেন। সিধুবাবু হারিয়ে গেলেন কেমন করে? মাষ্টারমশায় যার লোক, তাঁর কাছে বহু পথ ঘুরে বহু বাধা বিপত্তির উজান ঠেলে পাদপীঠে এসে হাজির—"যে যার সে তার যুগে যুগে অবতার।" এইতো কথা। তুমি আপনার জন। তোমাদের বেশী কিছু করতে হবে না।" "আমি কে, আমার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, এইটুকু জানলেই হয়ে যাবে।" "পিতা পুত্র সম্বন্ধ।" চৈতন্য ভাগবত পাঠ শুনে-ই বুঝেছি। তুমি কে! চিহ্নিত

পুরুষ। Chosen child. তুমি সংসারে থাকবে। গার্হস্থ্য সন্ন্যাস'—গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই। যোগী ও ভোগী। একটা পাশ দিয়ে মা রেখে দিয়েছেন, তা না-হলে কে ভাগবত শোনাবে? "সংসারে বড়লোকের বাড়ীর দাসীর মত থাকবে, "—সব কাজ করে, বাবুর ছেলে মানুষ করে, আমার হরি, আমার গোপাল বলে; মনে মনে বেশ জানে, আমার হরি, আমার গোপাল দেশে। স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুর, দর্শনের প্রথম পর্বে, বাপ, মা, স্ত্রী পুত্র সকলের সেবা করবে, কিন্তু মনে মনে জানবে, এরা তোমার কেউ নয়। ঈশ্বর আমার সব। আমার বাড়ী ঘর ঈশ্বরের কাছে। এখানে কয়েকটি কর্ম করতে আসা। কর্ম শেষে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

বাড়ী থেকে আধপো দূরে একখানা ঘর করবে। বাড়ী থেকে দু-বেলা দুটি খেয়ে আসবে, আর এখানে সারাদিন রাত থাকবে। সারাজীবন ধরে একটি কথারও নড় চড় হয় নি। এইতো মাষ্টার-মশায়ের জীবন। কৃতি ছাত্র, বিখ্যাত মাষ্টার, অধ্যাপক, বহু শাস্ত্রের পণ্ডিত কিন্তু জানতেন না 'জ্ঞান, অজ্ঞান' কি? প্রথম দর্শনেই শ্রীগুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ "জ্ঞানাঞ্জনা শলাকায়া" দিয়ে জ্ঞান নেত্র খুলে দিলেন, বললেন, "ঈশ্বকে জানার নাম জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান'। আর জানলেন, বিপরীত দুই সত্য। দুধ সাদা ও কালো দুই-ই হতে পারে। সাকার নিরাকার দুই সত্য। ঈশ্বরে সব সম্ভব। তোমার যেটি ভাল লাগে সেটি তোমার, অপরটিও সত্য। মতুয়ার বুদ্ধি করতে নেই। আমারটি ঠিক, অপরেরটি ভুল এটি অজ্ঞানতা।

প্রথম দর্শনের দিনে যে জিজ্ঞাসা জেগেছিল মনে, "এ সৌম্য কে? সুদীর্ঘ ৭৮ বৎসর পরেও এ প্রশ্নের শেষ উত্তর খুঁজে পান নি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'অচিনে গাছ, চেন?' এ গাছ বহু দেখা, তবু অচেনা। খুব চেনা না হলে প্রথম দর্শনে এমনি করে মন কেড়ে নেয়। আর, তিনি-ই তো বললেন, 'আবার এসো, অপরিচিত ব্যক্তি, হদ্দ একবার সাধু দেখে চলে যায়। মহেন্দ্রনাথ হারিয়ে যাওয়া সূত্র খুঁজে পেলেন, আসব বই কি। না এসে উপায় আছে। গানে যেমন আছে,—"পথ যে আমায় ডাক দিয়েছে হারিয়ে যাওয়ার

নাম ধরে ?' সত্য-ই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কুঠি বাড়ীর ছাদে উঠে সন্ধ্যা আরতির পর কত-ই ডেকেছিলেন, তোরা কে কোথায় আছিস আয়। মাষ্টারমশায়, যেতে যেতে ভাবছেন, পা যেতে চাইছে না কেন ? এঁকে ছেড়ে, মন বলছে কোথা যাবো। বলছে—'এই তো এসেছি আরো কাছাকাছি, বাঁধ বাঁধ প্রিয়া বাহু পাশে।' যাবার জন্য তো এ আসা নয়, বাঁধা পড়ার জন্য-ই আসা। 'কলমির দল' একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। হারিয়ে যাওয়া পথ খুঁজে পেলেন মহেন্দ্রনাথ, আর এই এক পথেই চলল পরিভ্রমণ আজীবন। শুধু কি একাই গেলেন এলেন ? না। তাঁরই হাত ধরে এলেন অসংখ্য সর্বহারার দল, পথ হারার দল।

মাষ্টারমশায়ের নেশা কেটে গেল শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে। কথা শুনে পুরানো সংস্কার জেগে উঠেছে দেখছেন, ছোট্ট একটি ঘরে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু এযে শ্রীবাস অঙ্গন। মনে হচ্ছে, শ্রীমান মহাপ্রভু যেন পুরীক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ ভক্তদের সাথে বসে হরি কথা বলছেন। হবে-ই তো, ঠাকুর যে বললেন, "তোমাকে দেখেছি শ্রীচৈতন্যের দলে।" এখানে-ই শেষ নয়। আর একটি দৃশ্য যুগপৎ ভেসে এলো মনে, "সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা বলছেন আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে।" ভাগবতের পণ্ডিত, এবারও ভাগবত গাইতে হবে। লীলা ও নিত্য এক। নদীর শেষ কোথায় ? সমুদ্রে, আত্মলুপ্তি না পরম প্রাপ্তি, কর্মের শেষ কোথায় ? কর্মে নয়, ঈশ্বর লাভে। নিজ কানে শুনলেন প্রথম দিন-ই। কর্ম কর্ম করে মানুষ পাগল—জানে না কর্মত্যাগ কখন—কর্ম উপায়, ঈশ্বর যার ফল ফুল ফলে শেষ। ইচ্ছা করে কোন উপায়ে-ই কর্মত্যাগ হয় না—ফল পাকলে খোসা যেমন খসে যায়। ঈশ্বর পেলে কর্ম খসে যায় আপনা আপনি। আত্মহত্যায় কোন ভাবে-ই রেহাই নেই। দুটি কথার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন নিজেকে, জীবনের প্রতিশ্রুতি। ভুলের অবসান ঘটলো। এতদিন জানতেন না জীবন নিয়ে কি করতে হয়, জীবন কেবল কতগুলি দিনের সমষ্টি নয়, কতগুলি অগোছালো কর্ম নয়, জীবন ঈশ্বরকে জেনে চলা। জীবন ঈশ্বরের। ঈশ্বরই জীবনের মহা প্রাপ্তি, মহা প্রশান্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলেছিলেন ; একটা ঢোড়া সাপ কোলা ব্যাঙ ধরেছিল। গিলতে পারছে না, ওগরাতে পারছে না ব্যাঙটা চেঁচাচ্ছে, সাপটার-ও কষ্ট, দুয়ের-ই কষ্ট। কিন্তু যদি কেউটে সাপ হয়, তিন ছোবলে-ই শান্তি। মাষ্টারমশাই বুঝলেন, এ কেউটে সাপ কে ? মহেন্দ্র ব্যাঙ কার ছোবলে পড়েছেন।

চতুর্থ দর্শনে নিজেই বলেছেন, আমার সকল তর্ক সকল প্রশ্ন, ঐ এক মহা উত্তরের কাছে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। আজ শূন্য পাত্র, কেবল তাঁর কথা ধারণ করার জন্য-ই বাঁচা। এ বাঁচা বা মরা কেবল তাঁরই ইচ্ছা। বুঝেছেন, কে তাঁকে জীবনে এনেছেন আর কি তার উদ্দেশ্য। এই তো মাষ্টারমশায়ের জীবন। এ জীবনকে কোন সন তারিখ দিয়ে সীমিত করা যায় না। একটা অনন্ত স্রোত তীর্থ যাত্রার মত। ব্যক্তি নয়! কথা ও বাণী। ঘটনা নয় প্রকাশ। যখন যেমন প্রয়োজন। অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক সত্ত্বা। মহান আত্মার অনন্ত তীর্থযাত্রা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী

"অনন্ত হয়েছ ভাল-ই করেছ
থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে
তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর"।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত যদিও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে জগতের আলো দেখেছে, শ্রীশ্রীমা কিন্তু পাঁচখণ্ড কথামৃত বইয়ে প্রকৃতপক্ষে নেই বললে-ই চলে। যা আছেন তা অতি সামান্য। ছোট খাটো একটি চরিত্র মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন মহানাটকে এ চরিত্রের যে বিশেষ ভূমিকা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচখণ্ড কথামৃত পড়ে বোঝাই যায় না।

শ্রীশ্রীমা কথামৃতে কেবলই শ্রীরামকৃষ্ণঘরনী, অন্যান্য পাঁচজন সাধারণ ঘরনীর যেমন জীবন যাত্রা, স্বামীসেবা, সংসারের নিত্য-

নৈমিত্তিক কর্ম, অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ণ। এক কথায় গতানুগতিক জীবন। এর বেশী কিছু না। ঠিক এই ভাবে-ই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীশ্রীমাকে দেখান হয়েছে। কেউ তাঁর খোঁজ রাখে না। একজন আছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য নহবতে এসে বাস করেন, ভক্তবৃন্দের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত থাকেন। এই মহাজীবন যে অগণিত অবহেলিত অনাদৃত দিশেহারা মানুষকে প্রতিদিন নানাভাবে পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আলাদা এক চিরবাঞ্ছিত আদর্শ জীবনের লক্ষ্যে 'স্টিমবোটের' মত টেনে নিয়ে চলেছেন, যে ঈশ্বরীয় স্রোতটি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী থেকে বেড়িয়ে জগত ছেয়ে ফেলার জন্য প্রবহমান শ্রীশ্রীমা যেন সেই মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, আড়ালে দূরে দাঁড়িয়ে, একান্তে দর্শন করছেন মাত্র, স্পর্শনেরও সুযোগ নেই, নেই বোধহয় প্রয়োজন। অদ্ভুত লাগে ভাবতে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের দু-চারটি উদ্ধৃতি দিলে মন্দ হবে না। এক, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২ খণ্ডঃ ২২ এপ্রিল ১৮৮৬ কাশীপুর উদ্যানবাটী। ডাঃ ভাদুড়ীঃ এর পরিবার রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন। ২৩ এপ্রিল ঃ মাতাঠাকুরানী রাত্রে ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিলেন।"

দুই ॥ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ঃ ৩ খণ্ড, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, ৭ই মার্চ ১৮৮৫। শ্রীশ্রীমা নহবতে আজকাল আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া থাকেন।"

তিন ॥ "১৪ই মার্চ ১৮৮৬। কাশীপুর বাগান ঃ ভক্তেরা সর্ব্বদাই বাগানে উপস্থিত আছেন ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সেবায় নিশিদিন নিযুক্ত।

চার ॥ "আজ নববর্ষ। মেয়েরা অনেকে এসেছেন—ঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিবেন। ১৩ই এপ্রিল ১৮৮৬।"

পাঁচ ॥ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পঞ্চম খণ্ড। দক্ষিণেশ্বর মন্দির ঃ মৌনাবলম্বী ঠাকুর। ১১ই এপ্রিল ১৮৮৫। তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন।"

এই রকম ছিটে ফোঁটা কথায় শ্রীশ্রীমার উল্লেখ আছে, সে সবে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মহিমময় বিরাট জীবনের অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের কোনরূপ তাৎপর্য বা অবদান আছে এমন

বাক্য বহন করে না। মামুলী দু-চারটে ঘটনাতে-ই তাঁর ভূমিকার ইতি করা আছে। যে যুগান্তকারী মহানাটক যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ঘটে গেল, যে নাটক আগামী দিনের বিশ্ব-বিপ্লবকারী অঘটন ঘটনের বাতাবরণ সৃষ্টি করে গেছে, আজ তা *অনস্বীকার্য কিন্তু সেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে সব আছে,* নেই কেবল যুগান্ত—আলোড়নী মহাশক্তির সংবাদ। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, তিনি কি করে সাক্ষ্যদান করছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বিশুদ্ধ সত্যতা।

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ বানীর উদ্ধৃতি দিলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। "বাবা জীবন—'তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। এক সময় তিনি-ই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এখন আবশ্যক মত তিনি প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত কথা আছে তাহা সব-ই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনি-ই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন··· ২১ আষাঢ় ১৩০৪।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রৌত ঋষি শ্রীমর গ্রন্থনা। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী একদিনের জন্যও কোন দৃশ্যে উপস্থিত ছিলেন না, যখন ঠাকুরের সাথে মাষ্টারমশায়ের কথা হয়েছে অথবা ঠাকুর অন্য কারো সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা কি দেখি, শ্রীশ্রীমা নিজ মুখে বলছেন, "তোমার নিকট যে সমস্ত কথা আছে তাহা সব-ই সত্য। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ ও সার্টিফিকেট-ই তো সত্যতার শেষ কথা। এমন কেউ নেই যে যারা এর প্রতিবাদ করে বা কোনো কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীমার কথা-ই চরম কথা। স্বামীজীর ভাষায় "হাইকোর্ট"। পাঁচখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীশ্রীমার শরীরী উপস্থিতি নেই বললে-ই চলে কিন্তু আমরা কি লক্ষ্য করি, শ্রীশ্রীমা নিজ মুখে বলছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সকল কথা-ই সত্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের মুখের কথা। এতো কেবল সাক্ষ্য দেওয়া নয়, তিনি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর দৃষ্টির, তাঁর শ্রুতির আড়ালে

কোন ঘটনাই ঘটে না। অতি সত্য কথা, তিনি তো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আরাধ্যা ও আশ্রয়, একাধারে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কাকে আরাধনা করেছিলেন? কাকে বলেছিলেন তুমি-ই মন্দির বাসিনী মা, তুমি এখন আমার সহধর্মিনী, তুমি আনন্দময়ী স্বয়ং. তুমি স্বয়ং সিদ্ধা আমার সর্বসাধনের সিদ্ধি প্রতিমা। কাকে বলেছিলেন—তুই ইচ্ছাময়ী, আমি কি কথা বলি, তুই বলিস।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে মা লজ্জাপটাবৃতা, নহবতে বিন্দুবাসিনী রামকৃষ্ণগতপ্রাণা, রামকৃষ্ণ জীবিতা। মনে ও প্রাণে একটি আত্মা দুইটি প্রকাশ মাত্র লীলাঙ্গনে— তাই রামকৃষ্ণ কায়া. মা সারদা ছায়া। লোক চক্ষুতে অবলুপ্ত মার প্রকৃতরূপ বলা যায় রামকৃষ্ণ অংশ স্বরূপিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলছেন—'ও কি যে সে, আমার শক্তি'—ব্রহ্মও শক্তি অভেদ। লীলাতে ভেদ দেখলেও এমন সব ঘটনা দেখি তখন এই ভেদ জ্ঞান মুছে যায়। সারদা প্রসন্ন মিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্তান। দক্ষিণেশ্বরে আসেন কিন্তু যাতায়াতের পয়সা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বললেন, তুই যখন যাবি নহবত থেকে পয়সা নিয়ে যাবি। ঘরে বসে কথা হলো। যাবার সময় সারদা প্রসন্ন নহবতে গিয়ে দেখেন, চারটি পয়সা দুয়ারের চৌকাঠের সামনে রাখা আছে। অবাক বোধ করেন—কে আছেন এখানে? আর তিনি জানলেন-ই বা কেমন করে। ইনি-ই মা—ইনি কেবল অন্তরবাসিনী নন, অন্তরযামিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী কণ্ঠ ছিলেন—যার থেকে মন্দাকিনীর মত বেরিয়ে এসেছে অঝোরে অমৃত কথা; মা আমাদের সেই বাণী বাগ্‌দেবী, ঠাকুর মহাসঙ্গীত, মা স্বরলিপি। এই শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবন নাটকের মা-ই মধ্যমণি, নিজেকে মুহূর্তের জন্যও পাদ প্রদীপের সামনে আনেন কি, প্রচ্ছদপট হয়েই রইলেন। এক অদ্ভুদ Suspense নায়ক তিনি। তিনি ধরা ছোঁয়ায় নেই—রাশ ঠেলে দিচ্ছেন পেছন থেকে। মহানাটকের চতুর্থ অংক পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা অদৃশ্য। মন্দিরে খাজাঞ্চি—সকলের খবর রাখা যার কাজ, বলছেন—শুনেছি নহবতে একজন আছেন কিন্তু চোখে দেখিনি। কে আছেন। কে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অগণিত ভক্তদের সেবা করে যাচ্ছেন অক্লেশে আড়াল থেকে? অদৃশ্য হাতে, কল্যাণী হাতে সকলের

ক্লেশ মুছে দিচ্ছেন। কাক-পক্ষীতেও দেখে না কখন আপন নিত্যকর্ম সেরে গর্তে ঢুকে পড়েন।

১৮৭৩ সাল। অতি গোপনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ষোড়শী পূজা করলেন, নিজেকে পূর্ণাহুতি দিলেন ঐ মানবী প্রতিমার চরণপদ্মে, বললেন, হে মাতঃ তুমি এই মানবী বিগ্রহে আবির্ভূতা হয়ে জগত কল্যাণ কর। কেউ জানেনা, জানেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, কে—ঐ নহবতের অন্তরালে শান্ত স্নিগ্ধ দীপশিখাটি জাগ প্রদীপের মত নিজেকে পুড়িয়ে শক্তির আলো বিকিরণ করছেন; আলোটি কেবল দেখা যাচেছ কিন্তু প্রদীপ লোক চক্ষুর আড়ালে কিন্তু নিত্য সত্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অমৃত কথার উৎস তিনি, তিনি-ই রাশ ঠেলে দিচেছন কারণ ঐ মায়ের উদ্বোধনের জন্যই তো কথামৃত শুরু, লোককল্যাণ-ই তো অরতারের অবতরণের কারণ—"লোক চীকির্ষু"। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন মহানাটকের Culmination এই-খানে। মায়ের উদ্বোধন, জগতের কুলকুণ্ডলিনীর উদ্বোধন, মায়ের হাতে জগত কল্যাণের ভার সমর্পণ।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের মত-ই অমৃতবর্ষী মন্দাকিনী কথা-মৃতম্ মানুষের কল্যাণের জন্য বাঁধ ভেঙ্গে প্লাবনের মত বেরিয়ে এলো জগত প্রাঙ্গনে—এই প্লাবনই মা আগামী দিনে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব মাকে খুঁজেছিলেন সকল সত্ত্বায়, মাকে পেয়েছিলেন সকল সত্ত্বায়, মাকে ছড়িয়ে দিলেন বিলিয়ে দিলেন সকল স্তরের মানুষের প্রাণে। মা ছিলেন মন্দিরে না, নহবতে না, ছিলেন ইচ্ছা হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মনের মধ্যে, তাই কথামৃতে মা ইচ্ছারূপিণী রাণী-রূপিণী, ছায়া রূপিণী—কায়া কেবলই শ্রীরামকৃষ্ণ, তাইতো কেউ দেখেনি, দেখতে পায়নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গাইতেন, একবার যে এই মায়ের রূপ দেখেছে অন্যরূপ তার লাগে না ভাল—মায়ের রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে-ই তন্ময় হয়ে ছিলেন তাই রেখেছিলেন দুই পক্ষ-পুট দিয়ে আড়াল করে। "গোপনে হৃদয়ে রে'খ আদরিনী শ্যামা মাকে। মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।" তবে কেমন করে অপরে দেখবে? শ্রীশ্রীমা ছিলেন লজ্জাপটাবৃতা, সত্য-ই কি তাই, না, প্রকৃতপক্ষে মা চিরদিন-ই রহস্যাবৃতা। তিনি কাকে লজ্জা করবেন, তিনি নিজে আদিভূতা সনাতনী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লজ্জা পাবেন, কেন শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে

তো তাঁর-ই অপর রূপ। একটি টাকার দুইটি পিঠ। মা আর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব অভিন্ন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবন নাটকের চতুর্থ-অঙ্ক পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহে লীলা করেছেন, শেষ অঙ্কে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণাহূতি দিয়ে মাতৃচরণে মাতৃ সত্ত্বায় মিলিয়ে যান; এবার মাতৃলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ মা হয়ে গেলেন। অন্তরঙ্গ সন্তান যোগীন মহারাজ বলে ছিলেন, 'ঠাকুর বলেছেন আমি অর্দ্ধেক, মা অর্দ্ধেক। আমি আর কি করেছি, ও অনেক বেশী করবে। সেই বেশী করার যুগ ধর্ম পাত্রী মা স্বয়ং, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অন্তর বাসিনী। মার মুখে শুনেছেন, অন্তরঙ্গ ভক্তেরা, শ্রীশ্রীঠাকুরের এবার সকলের উপর মাতৃ ভাব ছিল—তাই আমাকে (শক্তি) রেখে গেলেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে সিদ্ধ শিল্পী শ্রীম তুলির আঁচড়ে যে দুচারটি মায়ের সম্বন্ধে দাগ কেটেছেন তাতো এইসব কথাই বলতে চায়, হয়তো তিনি মনে করে ছিলেন, শব্দ দিয়ে বলার চেয়ে না বলাই অনেকখানি হবে। আমরাও তো এড়িয়ে যাই। আমরা আজও বলি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলন, রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ভাবধারা ; বলতে পারিনা—'সারদা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলন; সারদা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারা। অসুবিধা কোথায় ? এখন তো মা লজ্জাপটাবৃতা নয়, এখন তো মা জগত আসরে আবির্ভূতা, জগত-জননীরূপে স্বীকৃতা।

শ্রীশ্রীমা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে পদার্পণ করেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবেগময় কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে বিবাহ করেছি, কিন্তু দেখছ তো আমার অবস্থা, দিন রাত কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে, নিজের কাপড় ঠিক রাখতে পারি না—সংসার কি করে হবে। শ্রীশ্রীমা তখন অষ্টাদশী, একটুও সম্বিত হারান নি, পরিস্কার ভাষায় বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে সংসারে টানতে আনি নি, ইষ্ট পথে সাহায্য করতে এসেছি।" কে ইনি ? কি তাঁর লীলাচরিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবন নাটকে, সব-ই তাঁর পূর্ব থেকে জানা। তাঁর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কোথায় শ্রীরামকৃষ্ণের মত সাধনা, কোথায় সন্ন্যাসী জীবন তাই বলছিলাম মা স্বয়ং-সিদ্ধা। তিনি জ্ঞান স্বরূপা, জ্ঞানদাত্রী সারদা

নিজে। সেই দিন থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে সাহায্য করার গুরুদায়িত্ব, যেমন সংসারে, তেমনি অধ্যাত্ম জীবনে, লোক-কল্যাণ ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, নিজেকে অবলুপ্ত রেখে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের আড়ালে।

শ্রীশ্রীমা ইতিহাস সৃষ্টির উপাদান হিসাবে-ই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে কয়েকটি অস্পষ্ট রেখারূপা দৃশ্যমানা। সেবারূপ তপস্যার মত দেখতে পাই পাঁচখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে। তিনি মহাবিশ্ব জীবনে অবিসংবাদিত মা। সেই মায়ের ভূমিকা-ই পালন করেছেন। কেবল সেবা, সব ত্যাগ এমনকি সারাদিনে, ছয় মাসেও কয়েক হাত মাত্র দূরে থেকেও স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন তাও ঘটেনি। কিন্তু কোনো অভিযোগ নেই। দাবীর কথা তো উঠছে-ই না। সর্বংসহা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তিন স-শ-ষ-এরই প্রতীক প্রতিমা। কিন্তু দায়িত্বে পূর্ণ সচেতন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব অনুযোগ করছেন, অন্তরঙ্গ ছেলেদের রাতে দু একখানা বেশী রুটি মা খেতে দিচ্ছেন, ভয় পেয়েছেন জপ ধ্যানে ক্ষতি হয়। মা শুনে ঠাকুরকে বলেন, "ছেলেদের ভবিষ্যত তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি দেখবো। এ আমি নিছক খাওয়া পরার. সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখার মায়ের আমি নয় এ আমি ইষ্ট পথে সাহায্য কারিণী। মা জগদম্বার সর্বকালে কল্যাণী—'আমি'। তিনি—স্পষ্ট ভাষায় জীবের জন্য প্রতিশ্রুতি রেখে গেছেন—"আমার ছেলেদের ধুয়ে মুছে আমাকে-ই নিতে হবে, সেই মা আমি। সাজান পাতান মা নই, নকল মা নই, কেবল গুরু পত্নী নই আমি নিজের মা—আপন মা। এই প্লাবনী শক্তির উন্মোচন দেখে বিস্ময়াভূত হয়েছিলেন স্বামীবিবেকানন্দ। বিদেশ থেকে বহু চিঠি গুরু ভাইদের কাছে লিখেছিলেন—"মাকে তোমরা কেউ বোঝনি। সারা বিশ্বের শক্তির খেলা দেখলাম। এবার সেই শক্তির অবতার-ই আমাদের মা। তাঁকে আশ্রয় করেই আবার ভারতে বহু গার্গী, মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব হবে। যখন মায়ের কথা ভাবি, তখন মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ থাকুন আর যান, মায়ের উপর যার ভক্তি নাই তাকে ধিক। এই উক্তি মোটেই অত্যুক্তি নহে, নিছক আবেগও নহে, পরম সত্যের আবেগময়ী প্রকাশ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে প্রার্থনা

জপ ধ্যান-পূজাপাঠ ও প্রার্থনা। ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হবার উপায়। প্রত্যেক ধর্মেই এইগুলি একভাবে না হলেও অন্যভাবে আছে। প্রার্থনা সকল ধর্মেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যে কোন ভাবে-ই আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করি না কেন, শেষে প্রার্থনা দ্বারা-ই সমাপ্ত। সাকার পূজাই হোক আর নিরাকার পূজাই হোক—প্রার্থনা আছে-ই। হিন্দুধর্মে, মনে হয় প্রার্থনাই অনেকটা। ইস্‌লাম ধর্মে দেখতে পাই 'নামাজ'। সারাদিনে বহুবার নামাজ পড়েন। নামাজের ভঙ্গিমা লক্ষ্য করলে অবশ্য-ই দেখা যাবে, আল্লার কাছে কত ভাবে-ই না প্রাণের আকুতি জানাচ্ছেন ভক্ত। খৃষ্টধর্মে প্রার্থনাই পুরো ধর্মটাকে ধরে আছে। সারা সপ্তাহে কে কি করেন না করেন তা বলা মুস্কিল, কিন্তু রবিবার হলে-ই prayer, অর্থাৎ প্রার্থনা গির্জাতে গির্জাতে হবে-ই।

প্রার্থনা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে প্রাণ খুলে দেয়া, ঈশ্বরের সাথে কথা বলা। এই কথা বলার জন্য কোন বিশেষ প্রস্তুতির দরকার হয় না। প্রার্থনার কোনো আইন, নিয়মকানুন নেই। প্রার্থী মনে মনে দৃঢ় করে ঈশ্বরের কাছে তার মন খুলে তার প্রয়োজনের বস্তু চাইছেন। তিনি অবশ্য-ই মনে করেন, নিজের শক্তিতে যা পাওয়া সম্ভব নয়, যা তার কাছে অসম্ভব, সেই কাম্য বস্তুটি একমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অসম্ভব বলে কিছুই তার মনে হয় না। একটিই কারণ, ঈশ্বরকে সকল শাস্ত্রে সকল কারণের কারণ, সকল ক্ষমতার অধিকারী, ইচ্ছাময়, সকল শক্তির আধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ঈশ্বরকে বুঝি আর নাই বুঝি, কিন্তু মনের কোণে এইটি বেশ আছে, যেখানে মানুষের শক্তি চলে না, অকেজ, সেখানে ঈশ্বরই একমাত্র উপায় বা উদ্ধার কর্তা। এটাকে দুর্বলতা-ই বলি বা সবলতা-ই বলি। খুব শক্তিমান পুরুষ, কোনো অভাব নেই, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত

তেমন একটা কঠিন আঘাত আনে নি—দিন ভালই চলছে, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা একটা চরিত্রের দুর্বলতা বলে-ই মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন চেষ্টার দ্বারাই সব করা যায়, তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাঁটু গেড়ে কল্পিত এক ঈশ্বরের কাছে মনুষত্বের অবমাননা কেন ? প্রশ্ন করেন, কেউ কি ঈশ্বরকে দেখেছে ? না জানে যে ঈশ্বর বলে এক অদ্ভুদ গ্রহ বা উপগ্রহ একজন আছেন। বিপদে আপদে তাঁর দ্বারস্থ হলে, প্রার্থনা করলে তিনি কথা শুনেন এবং মুস্কিল আসান করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। মানুষের বিপদে আপদে বল ভরসা জোগান।

হঠাৎ একদিন আকাশটা ভেঙ্গে পড়লো। সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব-ওয়ালা মানুষটি ছুটোছুটি করছেন, একে ওকে ধরছে, গণৎকার তান্ত্রিক, ঝাড়ফুঁক করছেন। বেড়ালেরও পা ধরছেন। জোড়া পাঁঠা কালী বাড়ীতে মানত করছেন। কি হলো ? আর কি হবে, ছেলেটা যায় যায়। কত ডাক্তার কবিরাজ করলাম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। একজন হয়তো বললেন অমুক জায়গার মাটি নিয়ে ভক্তি ভরে খাইয়ে দিন আর নিজেও একটু স্নান করে খাবেন—অনেকে-ই ফল পেয়েছে, মা এখানকার জাগ্রত, ভাল হ'লে এখানে পুজো দিয়ে যাবেন। আর কথা নেই—তাই সই। হলো না। আবার ঘুরছেন কেউ কোন উপায় করে দিতে পারেন কি না। অত শক্তি, অত ব্যক্তিত্ব একেবারে ধুলোয় মিশে গেছে। না জানা অবিশ্বাসের ঈশ্বরকে বারে বারে গোপনে প্রার্থনা করা তখন আপনিই আসে। এই কিন্তু মানুষের ইতিহাস। এই যে মনের মধ্যে থেকে বিশেষ অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তুমি আছ ঈশ্বর আমাকে কৃপা কর, পথ দেখাও, শক্তি দাও—বলে আকৃতি হয়, ঐ হচ্ছে প্রার্থনা। স্বাভাবিক আকুতি তা যেকোন জিনিষের জন্যই হতে পারে। অভাব থেকে-ই প্রার্থনা আসে। দুঃখ বেদনাই প্রার্থনার প্রসূতি। দুর্বল শক্তি লাভ করে।....কাম্যবস্তু লাভ করে—আবার ভক্ত ভগবানকে লাভ করে। প্রার্থনাই যোগসূত্র ঈশ্বরকে স্পর্শ করায়। প্রার্থনার কোন ভাষা নেই। নেই বিশেষ শব্দ। প্রার্থনা একান্তই প্রাণের একটি পবিত্র ভাব। পুরাণে আছে সাগর মন্থনে অমৃত উঠেছিল। প্রার্থনাও তাই প্রাণ নিংড়ানো

অমৃত। এ প্রার্থনা কিন্তু সকল প্রার্থনা নয়। প্রার্থনার ভঙ্গি সকলেরই এক কিন্তু তফাৎ আন্তরিকতায় গভীরতায়। প্রথমে প্রার্থনায় শব্দ থাকে, ভাবের জোয়ার ভাটা থাকে কিন্তু প্রার্থনা গভীরতা পেলে, আর কিছু থাকে না—যিনি প্রার্থনা করেন আর যার কাছে করেন—একাকার হয়ে যায়। পরম প্রাপ্তির মধ্যে, পরম শান্তির মধ্যে, প্রার্থনার পূর্ণতা পায়। প্রার্থনাই সকল সাধনার শেষের সিঁড়ি। আমরা যদি জীবনটাকে ভাল করে পড়ি, দেখবো, প্রতিদিন প্রতি অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সকল কর্মের মধ্যে ধর্মের মধ্যে, মর্মের মধ্যে প্রার্থনার ভাঙ্গাগড়া অভ্যাস করছি। প্রার্থনা তো চাহিদা আগেই বলেছি। জীবন তো কতগুলি চাওয়া পাওয়ার সমষ্টি। প্রার্থনা সারাজীবনের সঙ্গী। কারণ, আমরা জানিনা কি পেলে আমাদের আর প্রার্থনা করার দরকার থাকবে না। যখন যেটা অভাব বোধ করছি, চাইছি, প্রার্থনা করছি কিন্তু না পেলেও প্রার্থনা থাকছে, পেলেও দেখছি, আবার যেন একটা চাওয়া প্রাণ ফুঁড়ে উঠেছে। এমনি অসংখ্য বুদবুদের মত-ই চাওয়া নিয়ত দেখা দিচ্ছে। আর প্রার্থনাও শেষ হচ্ছে না। কি পেলে আর চাইব না। প্রার্থনা করলে সিদ্ধি লাভ হবে। তৃপ্তি হবে বুঝতে পারি না। গোটাজীবনের চড়াই-উতরাই পথ চলে, জীবনের শেষে বুঝতে পারা যায়। সত্য যা চাই, তার কোনটাই সারাজীবনে প্রার্থনা করিনি। কতগুলি অসার জিনিষ চেয়েছি। তাতে মন তো ভরে নি। চাহিদাও কমেনি!

একটা গল্প মনে পড়ে গেল; একটি পরিবার দুঃখে দিন কাটায়। বাড়ীর কাছে শিব মন্দির। খুব জাগ্রত। অনেকের কাছে শুনে আসছেন কত লোককে বাবা কৃপা করে বর দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে ঠিক করেন দুঃখের জীবন না হয় বাবার চরণে-ই দিয়ে দেব। একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে—বর পাওয়া যায় কিনা? একদিন শুভ মুহূর্ত্ত দেখে দু-জনে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকেন বাবার দুয়ারে। একদিন দুই দিন করে সাত দিন কাটে, কোথাও কিছু নেই হঠাৎই বাবা এক রাতে তাদের সম্মুখে বলেন, তোমাদের প্রার্থনায় আমি খুসী হয়েছি—তোমরা আমার কাছে বর চেয়ে নাও। তবে দেখো, গুণে গুণে তিনটে।

তার বেশী না। খুব খুসী তারা, তাই হবে। তিনটি বর কম কথা না। বাবা বলেন এবারে শুরু করো। আমার তো যেতে হবে, তাড়াতাড়ি আছে। কৈলাস ছেড়ে এসেছি। আচ্ছা করছি, একটু সময় দিন, নিজেরা পরামর্শ করে নিই। এ সুযোগ তো বার বার আসবে না। বাবা তা বটে। যা করো শীঘ্র করে নাও। এত দিন তবে কি করলে? কিসের জন্য এসে ধর্না দিলে তবে!

পরামর্শ করে স্বামী স্ত্রীঃ দেখ, আমাদের নাক খ্যাঁদা, লোকের মধ্যে যাওয়া যায় না সকলে-ই ঠাট্টা করে। এইটা আগে ঠিক করে নিয়ে তারপর বাকি দুটো বরে সব চেয়ে নেবো কি বলো? বাবা আবার তাড়া দেন। কৈ গো হলো তোমাদের? হয়েছে বাবা তবে দিন। এক। আমাদের খ্যাঁদা নাকের জায়গায় ভাল ভাল নাক হোক। বাবা তথাস্তু, বলার সঙ্গে সঙ্গে, সারা গায় ভাল ভাল নাক হলো। এঁ্যা, একি হ'লো সারা গায়ে নাক! এখন উপায়। স্ত্রী বলেন ভয় পাচ্ছো কেন? আমি ঠিক করে বলি দেখ। দুই।। নাকগুলো চলে যাক। বাবা, তথাস্তু, বলার সাথে সাথে সব নাক চলে গেল। এমন কি খ্যাঁদা নাক দুটোও চলে গেল। এখন উপায়। একটি মাত্র বর বাকি। আর চাওয়াও কিছু হলো না। উপায়। আবার দুজনে পরামর্শ করে বলে—থাক তোমার অন্য চাওয়া, আগে তো নাক হোক। নাক না থাকলে অন্য জিনিষ দিয়ে কি করবো। স্বামী বলে, দেখ, অত ঝামেলায় কাজ নেই—যেমন ছিলাম তেমন-ই ভাল। স্ত্রী বলেন তাই করো। প্রার্থনা। বাবা তিন।। আমরা যেমন ছিলাম তেমন করে দাও। তথাস্তু বলে বাবা উধাও হলেন। আমাদের সকলের প্রার্থনা প্রায় এই রকমের। আমরা জানিনা, কি প্রার্থনা করলে আমাদের মঙ্গল হবে।

মানুষ বিভিন্ন সংস্কারের; তাই প্রার্থনাও বিভিন্ন। পুরাণে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের বাবা, কঠিন তপস্যা করছেন—ঈশ্বর খুসী হয়ে দেখা দিলেন। কি চাই? হিরণ্যকশিপু প্রার্থনা করলেন—আমাকে যেন নর ও পশু বধ করতে না পারে অর্থাৎ অমর হই। ঈশ্বর তাই দিলেন। কিন্তু নর ও সিংহ একধারে হয়ে বধ করলেন নারায়ণ। প্রহ্লাদের তপস্যায় খুসী হয়ে বর দিতে চাইলেন নারায়ণ। প্রহ্লাদ বল্লেন—তোমাকে

পেয়েছি আর বর কি দরকার। শ্রীহরি বলেন, না তবু চাও। প্রহ্লাদ প্রার্থনা করেন,—"প্রভু বিষয়ী বিষয়কে যেমন ভালবাসে, যেমন বিষয়ে আসক্তি তেমনি আমার মন যেন তোমাতে আসক্ত থাকে।

মহাভারতে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছেন,—"হে মধুসূদন, আমাকে অসহনীয় দুঃখ দাও, কষ্ট দাও তা'হলে আমার মন তোমাতে নিবিষ্ট থাকবে। সুখে আমি তোমাকে ভুলে যাব। এমন প্রার্থনা কেউ কোন দিন কি শুনেছে না করতে পারে? ভগবান-ই একমাত্র প্রার্থনার বস্তু এটি দৃঢ় করার জন্য-ই এই মানুষের জীবন।

অসহনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটছে মা-ভাই বোনের। অন্নকষ্ট চোখে দেখা যায় না; কোন দিকেই কোন উপায় দেখতে পাচ্ছেন না, নরেন্দ্রনাথ ভাবী কালের বিবেকানন্দ। ছুটে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে দক্ষিণেশ্বরে। কিছু করে দিন, আর তো পারি না। বেশতো, আজ মঙ্গলবার, মন্দিরে মা বসে আছেন, তুই গিয়ে যা চাইবি তিনি দিয়ে দেবেন। নরেন্দ্রনাথ ছুটে যান একবার না তিন-তিনবার কিন্তু লজ্জায় চাইতে পারেন না, বলতে পারেন না অন্ন কষ্টের কথা, পরিবর্ত্তে বার বার একই প্রার্থনা বুক থেকে বেরিয়ে এলো—বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান দাও। এই প্রকৃত প্রার্থনা।

আমাদের আলোচ্য বিষয়, কথামৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন প্রার্থনা শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন কেমন প্রপন্ন হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। মৌখিক না, আন্তরিক হওয়া চাই। প্রার্থনা শিখতে হয়। অভ্যাস করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন কিছু শিখান নি। এ শিক্ষা বেদেও আছে, প্রার্থনা কর :—

"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়॥
মৃত্যো মা অমৃতং গময়। আবিরাধির্ম এধি॥
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যম॥

আমাকে অসত থেকে সৎ-এ নিয়ে চলো। অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে চলো। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চলো। হে রুদ্র, তুমি আমাকে সতত রক্ষা কর।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আর একবার

বেদধ্বনী করেছেন মানুষের চৈতন্যের জন্য। মানুষের মনের গোপন প্রশ্ন-প্রার্থনা তো শিখব, করবো কিন্তু ঈশ্বর শোনেন কি? হাজারো—প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ।—"এক-শো-বার। যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেইরূপ ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব টেনে টেনে বললেন অর্থাৎ অবশ্য-ই শুনবেন। কিন্তু কথা একটাই, মুখের প্রার্থনা হয়ে, প্রাণের প্রার্থনা হ'তে হবে। বুকের প্রার্থনা হ'তে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। সব সুযোগ করে দেবেন। "ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর; যাতে অনুকূল হাওয়া বয় যাতে শুভযোগ ঘটে।" তিনি সুযোগ করে দেন।

"বলছেন, তাঁর সাথে একটা সম্বন্ধ পাতাও। আত্মীয়তাবোধ আনতে পারো তো খুব সহজ হবে। সিঁতির ব্রাহ্মসমাজে উৎসবে এসে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে বলছেন—"আপনার মা বোধ থাকলে এখুণই হয়। তিনি তো ধর্ম মা নন। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে যখন কাঁদতে শুরু করে কোন মতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে, "রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আসি। এই কথা বলে চাবিটি নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাকস খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়।" তোমরাও তাই কর। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বললেন—"তুমি তাঁকে মা-মা বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়েও বেশী। মায়ের উপর জোর চলে বাপের উপর চলে না।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী এসেছেন ১৮৮৫ ১১ই মার্চ। শিখাচ্ছেন কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়—"মা আমি তোমার শরণাগত, শরণগত, তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। দেহ সুখ চাইনা মা। দেহ সুখ চাই না মা। লোকমাণ্য চাই না মা (অনিমাদি) অষ্ট সিদ্ধি চাই না, কেবল এই করো যেন, তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি হয়।

আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই—তোমার মায়ার সংসারে কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা। তোমাবই আর আমার কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।”

ভক্ত পরিবৃত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীতে অসুস্থ কিন্তু এক চিন্তা লোককল্যাণ। ১৮৮৫ ২৭ অক্টোবর: বলছেন কেবল শুনলে কি হবে? “কিছু কর”। “যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করবে। বলছেন—লাউ কুমড়ো-না, কেবলই ভক্তি।”

অহল্যার কত দুঃখ। তপস্যার ফলে শাপমোচন হলো। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বললেন,—তুমি আমার কাছে বর লও। অহল্যা বললেন, রাম যদি বর দিবে তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকর যোনীতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নেই: কিন্তু হে রাম তোমার পাদপদ্মে যেন আমার মন থাকে। এবারে ঠাকুর নিজের কথা বলছেন—“আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। আর আমি কিছুই চাই নাই।”

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই কথায়ই শিখিয়েছেন, ভগবানের কাছে চাইতে হবে ভক্তি। যেমন ভাষাই হোক চাই শুদ্ধাভক্তি। কেঁদে কেঁদে ভগবানকে বলতে হবে, মা, আমি সাধন ভজন কিছুই জানি না, জ্ঞানভক্তি আমার নেই, জানি মা তুমি আছো, আমাকে তোমার করে নাও। মা, আমাকে কর্মের মধ্যে ঠেলে দিও না। আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। নিষ্কাম কর্ম আমি করতে পারি না, সকামকর্মে আসক্তি বেড়ে যায়। তাই তোমার ভুবণমোহিনী মায়ায় আমাকে বদ্ধ করো না। কর্ম কমিয়ে দাও, যে কটি করতে হবে, করিয়ে নাও, তুমি যে কাজ করতে বলবে তাই করবো। মা আমার তুমি ছাড়া কেউ নেই। মৃত্যু তো আছেই। তাই বলছিলাম, আমাকে সদাসর্বদা তোমার কাছে রেখে দাও। দূরে সরিয়ে দিও না।

শ্রীশ্রীমায়ের অমোঘ বাণী দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করি। মা বলছেন, “প্রার্থনা করবে, নির্বাসনা।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ভক্তি ও ভক্ত

"কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগ যুগধর্ম।" (২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২।) শ্রীমৎ ভাগবত গীতাতে যেমন সকল যোগের কথা আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতেও তাই আছে। কিন্তু পাঁচখন্ড শ্রীম সংকলিত কথামৃতে ভক্তির কথা-ই মুখ্য। কথামৃতের পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে, ভক্তি চুঁইয়ে পড়ছে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ রাজযোগ। সকল যোগের মধ্যে মূল কথাটি ভগবানকে ভালবাসা। ভক্তিযোগ ভগবানকে ভালবাসা। ভগবানকে ভালবেসে পাগল হয়ে যাওয়া। গানে যেমন আছে, "দে মা আমায় পাগল করে, কাজ নেই মা জ্ঞান বিচারে, আমায় পাগল করে দে।" শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভালবাসাকে নারদীয় ভক্তি বলেছেন। বলেছেন, কলিযুগের বিধান নারদীয় ভক্তি। অন্যান্য যোগে ভগবান লাভ হবে না, একথা বলেন নি, বলেছেন—কলিযুগের মানুষের অন্নগত প্রাণ, নানা সমস্যায় জর্জ্জরিত, সময় কৈ, একটু নিশ্চিন্তে বসে ধ্যান জপ করার।

এই যুগে অন্যযোগ কঠিন। শাস্ত্র অনুযায়ী কর্ম করা কঠিন। বিষয় বাসনা সামান্যও থাকলে জ্ঞানযোগ হয় না। মানুষ "আমি" "আমার-আমার" দিনরাত করছে, সেই মানুষ কি করে বলবে 'সোহং'। সে কি করে বলবে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। যার জগত সর্বস্ব। হাত কেটে গেছে দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, তার পক্ষে জগত মিথ্যা বলা অসম্ভব। কাজেই জ্ঞান পথ বিচারের পথ সাধারণ মানুষের নয়। একটুও ফেঁসো থাকলে যেমন সুতো সুঁচের মধ্যে যায় না, একটুও কামনা-বাসনা থাকলে জ্ঞান পথে যাওয়া যায় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ পুরুষ, অবতার মানুষের যা সম্ভব নয় তা বলবেন কেন? বরং বলছেন, ভক্তি পথ সহজ পথ। ভক্তিযোগকে ছোট করেন নি। ভক্তির মহিমাকে বরং বড়ই করেছেন আমরা দেখবো। ভক্তি মেয়েছেলে অন্দর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। কোথাও কেউ বাধা দেবার নেই।

জ্ঞান বেটাছেলে বার বাড়ি বা বৈঠকখানা অবধি ঢুকতে পারে তারপর কাউকে দিয়ে খবর দিতে হবে, অন্দরে বাবু আছেন। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম এরা ভগবানের সাথে যুক্ত করে। সাধন মার্গ। সকলের উদ্দেশ্য কিন্তু এক—ভগবানকে জানা, লাভ করা। জ্ঞানী যেখানে যাবে ভক্তও সেইখানেই যাবে। পথ বিভিন্ন।

আমাদের আলোচ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ভক্তি। কথামৃতের ভক্তি আর অন্য ভক্তি কি আলাদা? না। ভক্তি কথাটি এসেছে বেদমন্ত্রে উল্লিখিত শ্রদ্ধা শব্দ থেকে। এই শ্রদ্ধা কথাটি আমরা নানাভাবে ব্যবহার করি। মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করি, বাপ-মাকে শ্রদ্ধাকরি, গুরুজনদের শ্রদ্ধাকরি। মন্দির, তীর্থস্থানাদির প্রতি, স্কুল কলেজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই। কেউ মহৎ কাজ করলে তাকে শ্রদ্ধা দেখাই। এই সকল শ্রদ্ধার মূলে রয়েছে ভালবাসা। আমরা যাকে ভালবাসিনা তাকে কিন্তু শত চেষ্টা করেও শ্রদ্ধা দেখাতে পারি না। উপরে দেখালেও, মন থেকে পারি না। ভক্তি যে আমাদের হিন্দুধর্মের একচেটিয়া সম্পদ তা নয়; ভক্তি সকল ধর্মেই আছে। কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষে। সকল ধর্মেই কিন্তু এই ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সকল ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে এই ভক্তি কিছু না কিছু আছেই। তার প্রধান কারণ, না ভালবাসিলে কেউ কোনো দিন কোন আচার বা অনুষ্ঠান পালন করতে আগ্রহী হয় না। ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব হয়তো সকলে বুঝতে পারে না কিন্তু বুঝবার জন্য বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি সাধনের প্রস্তুতির খুবই সহায়ক। এ সকলের মাধ্যমে আস্তে আস্তে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করে, পরিণামে ঈশ্বরকে ভালবাসে কৃতার্থ হয়।

আমাদের ধর্মের বাহ্য অঙ্গ ঘণ্টা, ভজন, কীর্ত্তন, শাস্ত্র, প্রতিমা মন্দির সাজান অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঐ পর্যায়ে পড়ে। এইসব বাহ্য অনুষ্ঠান অমূর্ত-ভাবকে মূর্ত করার সহায়তা করে। চিত্তের প্রসন্নতা আনে, ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হয়। এগুলিকেই উপাসনার অঙ্গ বলে। কিন্তু প্রকৃত উপাসনা—"উপগম্য আসনং চিন্তণম্"—ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়ে তাতে মগ্ন হওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলেছেন, ভগবানকে ভালবাসাই একমাত্র

ভক্তি। আর কাউকে ভালবাসা, তিনি যিনি-ই হোন না কেন, যত মহান বা বড় হোন না কেন, তা কিছুতেই ভক্তি বলা যাবে না। কাজে-ই এটি বোঝা গেল সাধারণ পূজা পাঠাদি থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ বা প্রেম পর্যন্ত যে কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য চেষ্টা বা সাধনাকে ভক্তি বলা যাবে। এ ছাড়া আমরা যখন ধন-সম্পত্তি বা স্ত্রী পুত্র লাভের জন্য ঈশ্বরের পূজা-আরাধনা বা মহোৎসব করি তা কিন্তু কোন ভাবেই ভক্তির মধ্যে পড়ে না। পুণ্য লাভের জন্য বা নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের জন্য যখন ঈশ্বরের উপাসনা করি তাও ভক্তি না। তার মূল কারণ ভক্তি কখনো ভয় বা কামনা থেকে আসতে পারে না। ভক্তি কেবল-ই ভগবানকে ভালবাসা। কোন হেতু নেই ভালবাসি। অহৈতুকী। নারদীয় ভক্তি সূত্রে বলেছেন—ভগবানে পরম প্রেম-ই ভক্তি! "সা অস্মিণ প্রেম রূপা, অমৃত স্বরূপাচ, ভক্তি অমৃত স্বরূপ।" এই প্রেম লাভ করলে ঘৃণা শূন্য হয়, সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ হয়। "অমৃত ভবতি, সিদ্ধ ভবতি, তৃপ্ত ভবতি।" মানুষ অনন্ত কালের জন্য তৃপ্তিলাভ করে। ঈশ্বর তার একমাত্র কাম্য হয়, অন্য কোন কাম্য বস্তু থাকে না। কর্ম, জ্ঞান ও যোগ থেকে ভক্তি এখানে-ই উচ্চযোগ্য কারণ ভক্তি নিজেই সাধ্য ও সাধনা।

এই ভক্তিকে-ই শঙ্কর একটু অন্যভাবে বলেছেন, "স্ব স্বরূপা সু সন্ধানং ভক্তি রিত্য ভিধিয়তে"—নিজ নিজ স্বরূপের আন্তরিক অনুসন্ধান-ই ভক্তি। এই কথা হলো, আত্মাকে জানো। ঈশ্বরতো সেখানে-ই আছেন, বাইরে নেই। সেই আত্মাতে মগ্ন হও ভালবাস। ঈশ্বরানন্দ আর আত্মরতি বা আত্মানন্দ একই কথা। রামপ্রসাদের গানে এই কথাই আছে,—"আপনাতে আপনি থেক মন। যেও নাকো কারো ঘর। যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।" ভগবান ব্যাস পতঞ্জলির "ঈশ্বর-প্রাণ-ধানাদ্ধা সূত্রে প্রণিধান অর্থও ভক্তি বিশেষ যার দ্বারা সাধকের কাছে পরম পুরুষের কৃপা নেমে আসে আর তার সকল বাসনা পূর্ণ হয়। শাণ্ডিল্য মুনি বলেছেন, ঈশ্বরে পরমানুরক্তি-ই ভক্তি। একই কথা যে যেমন পথে অনুভব করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বলতে হয়, "অন্তে, সব শিয়ালের একই রা।" "ঈশ্বরকে ভালবাসা-ই ভক্তি।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ এই কথাই বলেছেন কিন্তু অপূর্ব ব্যঞ্জনার মধ্যে, সাধারণ মানুষ, কাম কাঞ্চনকে ভালবাসে। এইটি তারা বুঝতে পারে। ভালবাসার অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্য দিয়ে যতটা সহজবোধ্য ততটা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের দ্বারা ভালবাসা অনুভব করতে পারে না। প্রহ্লাদ ভগবানকে বলছেন, "অজ্ঞ লোকের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেমন তীব্র আগ্রহ, তোমাকে স্মরণ করার সময় আমার যেন সেই তীব্রতা হৃদয়ে থাকে। অর্থাৎ বিষয়ের যেমন আসক্তি, সেই আসক্তি. সেই তীব্র আসক্তি যেন বোধ করি তোমাতে।"

কতটা ভক্তি হলে ভগবানকে পাওয়া যায়? বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তিন টান এক করতে পারো? মায়ের সন্তানের প্রতি টান, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান। এই টানগুলি আমরা বুঝি। এই ভালবাসা আমাদের স্বাভাবিক। এই ভালবাসাকে মোড় ফিরিয়ে ঈশ্বরে দিতে পারলে ভক্তির উদয় হবে। রতি মতি তারপর ভালবাসা আসবে। দেবর্ষি নারদের জীবন এর সাক্ষ্য দেয়।

নারদের মা এক ব্রাহ্মণ পরিবারে দাসীবৃত্তি করতেন। সেই বাড়ীতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আনাগোনা ছিল। শিশু নারদ মায়ের সাথে তাদের সেবা করতেন, সঙ্গ করতেন, প্রসাদ খেতেন, হরি কথা শুনতেন। হঠাৎ মা মারা যান। নারদ অনেক দিন সাধুর সেবা করেন। সাধু মুখে হরি কথা শুনে, শ্রীহরির প্রতি রতি মতির উদয় হয়। প্রাণে শ্রীহরির প্রতি ভালবাসার উদয় হয়। তারপর একদিন গৃহ ছেড়ে সকল বন্ধন ছিন্ন করে শিশু বয়সেই শ্রীহরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। নারদীয় ভক্তি সূত্রে আমরা নারদের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দেখতে পাই। তিনি নিজে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তাই বলছেন, মানুষ শ্রীহরিকে ভালবাসলে অমৃতময় হবে-ই কিন্তু চাই নিষ্ঠা ভক্তি, আত্মনিবেদনং। শাস্ত্র বলছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তণং বিষ্ণোঃ শরণং পাদ সেবণম।
অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যং আত্মনিবেদনম্।"

ভক্তি নয় প্রকার। সাধারণভাবে ভগবানকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়, তা না হলে খাপছাড়া ভাব, যেন আঁট

নেই। মানুষ মানুষের মনের ভাব-ই বুঝতে পারে তাই পাঁচটি ভাবের কথা বলা আছে।

(১) শান্ত—এইভাবে মোটেই প্রেমের উন্মত্ততা নেই। বাহ্য ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা একটু উন্নততর, ভক্ত, শান্ত ধীর নম্র।

(২) দাস্য—শান্ত ভাব থেকে উচ্চ ভাবা ভক্ত নিজেকে ভগবানের দাস ভাবে। প্রভুভক্তি, বিশ্বাসী ভৃত্য যেমন। পুরাণে মহাবীর হনুমানের কথা বলা আছে। রামের ভৃত্য, রামের জন্য সব করতে পারে।

(৩) সখ্যভাব—বন্ধু ভাবাপন্ন। ভগবান আমার বন্ধু সখা। যেমন অর্জুনের ভাব ছিল। শ্রীদাম সুদামের ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। মুখ থেকে ফল বের করে খাওয়াচ্ছে। ভগবান জ্ঞান নেই। সমভাব। এর পরের ভাব (৪) বাৎসল্য – ভগবানকে বাপ-মা না ভেবে নিজের সন্তান জ্ঞান করা। আমি না দেখলে কে দেখবে শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাব। যেমন ছিল যশোদার। কৃষ্ণ না আমার গোপাল। ভগবান নয় গোপাল। (৫) আর একটি ভাব আছে, শ্রেষ্ঠ ভাব, মধুর ভাব। সংসারে এই ভাবের চেয়ে উচ্চতর ভাব হতে পারে না। সর্বোচ্চ প্রেমের ভাব। দিব্য প্রেম এইভাবে, ভগবান আমাদের পতি, আমরা সকলে তাঁর স্ত্রী। জগতে পুরুষ আর কেউ নেই। তিনি একমাত্র প্রেমাস্পদ।

এই মধুর ভাবটি হচ্ছে, পুরুষ-স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যেভাবে ভালবাসে, সেই ভাবটি ভগবানকে দিতে হবে। এতে আছে উন্মত্ততা। এই ভাবটির মধ্যে সব কটি ভাবই আছে। এই অবস্থায় ভক্তের ভগবানকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকা অসম্ভব মনে হয়।

বিরহ অসম্ভব। বিরহ কি? প্রেমাস্পদের অভাব জনিত মহা দুঃখ। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম "তদর্থ প্রাণস্থান।' অর্থাৎ তদীয়তা—তার হয়ে যাওয়া। শ্রীমতি রাধার শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই ভাব হয়েছিল। কেবল ভাব নয়, মহাভাব। মহাভাব মানুষের হয় না। এই ভাবেতে নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও জ্ঞান থাকে না। মহাপ্রভুর এইভাব হয়েছিল। সমুদ্র দেখে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে ঝাঁপ দিয়ে ছিলেন। সর্বত্র প্রেমাস্পদকে দেখে। এই ভক্তিকে

প্রেমাভক্তি বা পরাভক্তি বলে। মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানে লিপ্ত হয় তখন-ই পরাভক্তির উদয় হয় এবং মনে এই ভাব যখন স্বাভাবিক হয়, অবিরত থাকে তখন-ই মানব হৃদয়ে সর্বোচ্চ ভগবৎ প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়। আর সকল প্রকার ভক্তি এই পরাভক্তির, রাগানুরাগাভক্তির প্রস্তুতি মাত্র। এই প্রেমাভক্তিকে উঠবার সোপান মাত্র বলা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, গোপীদের এই ভক্তি হয়েছিল। প্রেমা-ভক্তি। রামচন্দ্র দত্ত মশায়ের বাড়ী এসেছেন ১৮৮৩ ২রা জুন। উদ্ধব সংবাদ গান হচ্ছে। উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে এসেছেন, ব্রজ-গোপীরা তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল। সকলেই জিজ্ঞাসা করছেন, শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন? তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন? প্রেমেতে আকুল হয়ে কাঁদিতে লাগলেন। বিরহব্যথা বিদূর হলেন গোপাঙ্গনারা। উদ্ধব জ্ঞানী অবাক, জিজ্ঞাসা করছেন, আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হচ্ছেন কেন? তিনি সর্বভূতাত্মা। সর্বভূতে আছেন। তিনি-ই সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়াতো কিছু নেই। গোপীরা বললেন, আমরা ওসব কথা বুঝতে প্যারি না। আমরা লেখাপড়া কিছু জানি না। কেবল কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে আমাদের সাথে ক্রীড়া করে গেছেন। উদ্ধব বুঝবে কি করে? তার অন্তরে কি গোপী প্রেম আছে? শুষ্ক হৃদয়, এ প্রেম কি করে আস্বাদন করবে? তবু উদ্ধব বলছেন—শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। তাঁকে চিন্তা করলে আর এ সংসারে আসতে হয় না! জীব মুক্ত হয়ে যায়। গোপীরা বলছেন—'আমরা মুক্তি, এসব কথা বুঝি না। আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখতে চাই। তাঁরা মুক্তি চায় না, তুচ্ছ মুক্তি, কৃষ্ণ প্রেমের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ শুনলেন ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন—নিজের ভাবে বললেন—'গোপীরা ঠিক বলেছেন'। এই বলে ঐ ভাবে একটি গান গাইলেন মধুর কণ্ঠে—'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো,……শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে। ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাঁধা মাথায় বই।" বিধি বা বৈধয়—ভক্তি দুই রকম। পরা আর গৌণী। গৌণী ভক্তি:

এত জপ এত ধ্যান পূজা, দান তীর্থ ইত্যাদি করতে হবে। আর পরা ভক্তি। ঈশ্বরকে ভালবাসা, প্রাণ উজার করে ভালবাসা। পরা-ভক্তি, প্রেমাভক্তি, বা রাগানুরাগা ভক্তি এক।

উদ্ধব সংবাদ যিনি গাইছিলেন তাকে-ই বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রেমা ভক্তিতে দুটি জিনিষ আছে—'অহংতা আর মমতা।' যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হ'লে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার জ্ঞান ছিল না। আর 'মমতা' আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। আমরা যেমন আমার আমার করি সংসার কাণ্ডতে, ঠিক তেমনি। উদ্ধব যশোদাকে বলেছেন তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান জগৎ চিন্তামনি। যশোদা বোঝেন না। "ওরে তোদের চিন্তামনিকে জানি না, আমার গোপাল কেমন আছে বলো।"

হ্যাঁ, এটি নিষ্ঠাভক্তি। ভক্তিতে যদি নিষ্ঠা না থাকে, সে ভক্তি ভগবানে ভালবাসা আনে না। এই গোপী প্রেমকে নিষ্ঠাভক্তি, অব্যাভিচারিনী ভক্তি বলেছেন।

ভক্তিরও ব্যাভিচার আছে? আছে। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন। বলছেন, ব্যাভিচারিনী ভক্তি কাকে বলে জানো? জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। বিচারবুদ্ধি দিয়ে ভালবাসা যেমন বিচার করছেন উদ্ধব, কৃষ্ণই সব হয়েছেন! তিনি পরব্রহ্ম, তিনি রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। প্রেমাভক্তিতে ঐ জ্ঞানটুকু, বিচারটুকু মিশ্রিত থাকবে না! আর নেইও। উদাহরণ দিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পুরাণ থেকে, হনুমান শ্রীরামদাস। মহাজ্ঞানী—

"শ্রীনাথে, জানকী নাথে অভেদ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্বস্ব রামকমললোচনঃ।"

দ্বারকায় এসেছেন, সীতারাম দেখবেন বলে। মুস্কিল হলো,—এ যে দ্বাপর, ত্রেতা কবে শেষ হয়ে গেছে, শ্রীরামচন্দ্র এখন শ্রীকৃষ্ণ অবতার। উপায়। শ্রীকৃষ্ণ ভেবে নিলেন, রুক্মিণীকে বললেন, কি আর করবে? সীতা হয়ে আমার পাশে বসো, এই নাও আমিও শ্রীরামচন্দ্র হই—তা না হলে রক্ষা নেই। জান তো ওকে, লঙ্কা পুড়িয়ে দিল। জ্ঞান নেই অশোক বনে সীতা আছে। শ্রীরামের জন্য সব পারে। শুধুই কি হনুমান, বিভীষণও একটু

কান্ড বাঁধাল, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসে। সিংহাসনে যুধিষ্ঠির বসে আছেন, যত রাজ-রাজারা এসে ওকে প্রণাম করছেন। বিভীষণ বলেন, আমি এক নারায়ণ ছাড়া কাকে প্রণাম করবো? তখন শ্রীকৃষ্ণ কি করেন—নিজে উঠে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন—তবে বিভীষণ বুঝলো নারায়ণ যখন করছেন তবে আমিও পারি।

এতো পুরানের কথা বললেন কিন্তু তাতে হলো না। তিনি বুঝলেন পুরাণ সকলে জানে না, নিতে নাও পারে গল্প কথা মনে করে। অমনি প্রাত্যাহিক জীবন থেকে সংসারের একটি অনবদ্য মধুর উপমা এনে হাজির করলেন চোখের সামনে বলছেন —"ওগো বুঝতে পারলে অব্যাভিচারিনী ভক্তি বা নিষ্ঠাভক্তি কাকে বলে? তোমরাই তো নিত্য তাই করছো। কিরকম জ্ঞান জান? বাড়ীর বউ দেওর ভাসুর শ্বশুর স্বামী সকলকে সেবা করে, পা-ধোবার জল দেয়, গামছা দেয় পিঁড়ে পেতে দেয় কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্য রকম সম্বন্ধ। স্বামীর সাথে যেমনটি, অমনটি কি কারো সাথে? তোমরা-ই তো ভাল জানো। বউয়ের স্বামীর প্রতি টান বা ভালবাসা নিষ্ঠাভক্তি। ওটি কারু সাথে চলবে না। হলেই ব্যাভিচারিনী হবে।

এটি ছিল গোপীদের প্রেম। কি নিষ্ঠা তাদের। গল্প শোন একটা—বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব—'মথুরায় গেছেন ক'জন গোপী। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ করবেন। মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি মিনতি করে সভায় ঢুকলো। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাঁরা হেঁট মুখ হয়ে রইল। বলছেন নিজেদের মধ্যে. এ আবার কে? এর সঙ্গে আলাপ করে আমরা শেষে কি দ্বিচারিনী হবো। আমাদের পীতধড়া মোহন চূড়া পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? এই নিষ্ঠা। বৃন্দাবনের ভাব-ই আলাদা।

দেখ. অনুরাগ, ভালবাসা, ভাব মহাভাব তারপর প্রেম। ঈশ্বরের প্রেম হচ্ছে সর্ব্বস্ব তুমি। একাঙ্গী নয়, যেমন হাঁস জলকে ভালবাসে, জল বাসে না। ভালবাসা আবার তিন রকম আছে, সাধারণী, সামঞ্জস্যা, সমর্থা। সাধারণ ভালবাসা, সামঞ্জস্যা,

তুমি বাসবে তো আমি বাসবো। তাতে দেনা পাওনা আছে কিন্তু সমর্থা, শ্রীমতীর ভালবাসা, তুমি বাসো আর না বাসো আমি তোমাকে না ভালবেসে থাকতে প্যারি না।

১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মনিলালাদি ব্রাহ্ম-ভক্তদের বলছেন—তোমরা 'প্যাম' 'প্যাম' কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা? চৈতন্যদেবের হয়েছিল—প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম জগত ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্য শূন্য। চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।

দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এ প্রিয় জিনিষ এর উপর মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। ভাব পর্যন্ত মানুষের হতে পারে—মহাভাব মানুষের হয় না। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না। প্রথম কথা অনুরাগ। অনুরাগ না এলে ঈশ্বরের দিকে এগোবার জো নেই।

তোমরা তো জানো, তোমাদের গানে আছে ব্রাহ্ম ভক্তদের বলছেন, "বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ্, তারে কি যায় জানা।" যা করতে হবে, তা ধ্যান হোক, জপ হোক যাগ যজ্ঞ যত হোক তার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে অনুরাগকে। গোরু ভূসি খড় খায় কিন্তু খোল দিলে গব্ গব্ করে খায়। অনুরাগ খোল মিশিয়ে ধ্যান জপ কর্ম করতে হয়, তবে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জন্মে। অনুরাগ হয়েছে কি করে বোঝা যাবে? অনুরাগের লক্ষণ কি কি? ভক্তদের মনের প্রশ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলছেন, অনুরাগের ঐশ্বর্য, বিবেক বৈরাগ্য, জীবে দয়া সাধু-সেবা, সাধু সঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন সত্যকথা এই সব। এর জন্য ভাবতে হবে না, একের পর একটি পর্যায় ক্রমে আসবে।

তা নয় হলো কিন্তু আর একটি কথা আছে, বলছেন একজন ভক্ত, ইন্দ্রিয়তো আছে। তারা ছাড়বে কেন? তাদের হাত থেকে কি অনুরাগ, ভক্তি আপনি যা যা বলছেন, রক্ষা করতে পারবে? আগে বিচার করে, যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে তবে কি ভক্তি পথে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলছেন—ও এক পথ আছে। বিচার পথ। ভক্তি

পথেও অন্তর ইন্দ্রিয় আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয় সুখ আলুনী লাগবে। যে দিন সন্তান মারা গেছে, বা কোন ভারী বিপদ হয়েছে সে দিন কি কারো দেহ সুখের দিকে মন থাকতে পাবে!

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী পরবর্ত্তীকালে পূজ্যপাদ যোগানন্দ স্বামী তখন ২০/২১ বৎসরের যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ পাদ প্রান্তে সবে এসেছেন। একদিন দেখেন পঞ্চবটীতে এক হটযোগী নানা যৌগিক ক্রিয়া দেখাচ্ছেন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করার জন্য। বলছেন এসব না শিখে কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি ঈশ্বর লাভ হয়। আগে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর তারপর অন্য কথা। যোগীন্দ্রনাথের মনে কথাটি ধরেছে। এসেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন—দেখুন আমার ইন্দ্রিয় আমাকে তাড়না করে, আমি ঈশ্বরে মন দিতে পারি না। আমাকে কয়েকটা যোগ শিখিয়ে দিন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওর মনের কথা বুঝে বললেন—যোগ কিছু করতে হবে না। তুই বরং এক কাজ কর—সন্ধ্যাবেলা হাড়তালি দিয়ে হরিনাম কর, ইন্দ্রিয় আপনিই নিগ্রহ হয়ে যাবে। যোগীন্দ্রনাথের কেমন যেন মনে হলো, হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ যৌগিক ক্রিয়াদি জানেন না তাই এমন কথা দললেন। এতোই কি সহজ! তবে আর কথাই ছিল না, সকলেই পারতো ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বলছেন, করেই দেখা যাক, এই বলে দিন পনেরো শ্রদ্ধার সাথে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতেই, সত্যি সত্যিই তার মনের ভাব সম্পূর্ণ পালটে গেল। আর ইন্দ্রিয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নাই। আশ্চর্য হলেন যোগীন্দ্রনাথ। অন্তর ইন্দ্রিয় ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তনে আপনিই দমে যায়। ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর অনুরাগ 'বাঘ'—কপ কপ করে ইন্দ্রিয়গুলিকে ছাগল ভেড়ার মত খেয়ে ফেলে।

কথা হচেছ অনুরাগের সাথে ভক্তি হলে ঈশ্বর স্হির থাকতে পারেন না—ভক্তি তার কিরূপ প্রিয় ঐ যে বললুম, খোল দিয়ে জাব যেমন গোরুর প্রিয়। রাগ ভক্তি বলে একে। এইটি-ই আবার শুদ্ধাভক্তি, অহেতুকী ভক্তি, নারদীয় ভক্তি—যেমন নারদের প্রহ্লাদের। কোন কিছুই চাই না—তোমাকে ভালবাসি। নরেন্দ্রনাথ এক মাসের মত নিত্য আসা যাওয়া করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর কথা বলেন না, ফিরেও চাননা। এমনি চলে অনেক দিন। তারপর একদিন জিজ্ঞাসা করেন, আমি তো তোর সাথে কথাও বলি না, তবে আসিস কেন? নরেন্দ্রনাথ উত্তর দেন—আমি কি আপনার কথা শুনতে আসি? আমি আপনাকে ভালবাসি।' চাই না কিছু-ই শুধু-ই ভালবাসা। কোন কারণ নেই, তবু না ভালবেসে পারছি না। ঈশ্বরের কাছে কিছু-ই চাও না—কেবল ভালবাসা। কাম ক্রোধ থাকে থাক না। যাবে কোথায় ঐগুলি একটু না থাকলে শরীর থাকে না—কি করবে? ঐগুলির মোড় ফিরিয়ে দাও—কামনা বাসনা করতে হয় ঈশ্বরকে কর। বিচার পথ—জ্ঞানের পথ কঠিন, ভক্তি নিয়ে থাকলে জ্ঞান আর ভক্তি দুই-ই হয়। দরকার হয় ঈশ্বরই ব্রহ্ম জ্ঞান দেন। খুব উঁচু ঘর হলে একাধারে দুই-ই হতে পারে! চৈতন্যদেব, শঙ্কর, বিবেকানন্দ এদের দুই ছিল। বেশী বিচার ভাল না। আগে ঈশ্বর, তারপর তার জগৎ তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়-ও জানা যায়। তাইতো ঋষিরা বাল্মীকিকে "মরা-'মরা' জপ করতে বল্লেন। কেন?—'ম' মানে ঈশ্বর 'রা' মানে জগৎ—আগে ঈশ্বর তারপরে জগৎ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই বলছেন—যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ী বাগান কোম্পানীর কাগজ,—সব জানতে পারা যায়। তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে কিছু দিন নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার দর্শন। তারপর বিচার শাস্ত্র জগৎ।

১৮৮৪ ২রা জানুয়ারী মহেন্দ্র নাথকে বলছেন—"তাই তোমাকে বলছি আর বিচার করো না। বেশী বিচার করলে শেষে হানি হয়। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম আর বলেছিলাম —"মা বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।"

"বল, আর বিচার করবে না।" মহেন্দ্রনাথকে শপথ করিয়ে নেন। অর্থাৎ বিচার পথ, জ্ঞান পথ বড়-ই কঠিন। সাধারণের জন্য নয়। তাঁকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড়কুটো বোধহয়। শুনে রাখ—ভক্তি দ্বারা-ই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে কিছুর-ই অভাব থাকে না। ভাবার নিজের কথা নজির হিসাবে বলছেন—"মাকে, কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, মা—বেদ বেদান্ত

কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও, পুরাণ তন্ত্রে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।" কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।" বিচার করে কি বুঝবে—তিনি যখন দেখিয়ে দেন সব পাওয়া যায়—কিছুরই অভাব থাকে না। 'ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকো।" এই আর কি, বললেন মহেন্দ্রমাষ্টারকে। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল ফুল দেখা দিবে।"

শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তি বা প্রেমা ভক্তি, ভক্তির পরাকাষ্ঠা। ঠিক, কিন্তু একথা যেন কেউ মনে না করেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিকে ব্যাভিচারিনী ভক্তি বলেছেন কাজে-ই ও ভক্তি ঠিক নয়। প্রেমা ভক্তি, ভক্তি মার্গের শেষ কথা, এও বলেছেন। এ ভক্তি কেবল বৃন্দাবনে গোপীদের-ই ছিল। আর যাঁরা ভক্তির পথ বেয়ে, ভাব-মহাভাব এসব উপভোগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারে চলে গেছেন তাদের-ই সম্ভব। সাধারণ সাধকের এসব হয় না, খুব জোর ভাব হ'লো। যখন খুব ঝড় উঠে তখন কোনটা কি গাছ বোঝা যায় না, সব একাকার হয়ে যায় কিন্তু যতক্ষণ ঝড় না উঠছে ততক্ষণ বিভিন্নতা আছে-ই। বিচার একেবারে যায় না। সদাসৎ বিচার করতে-ই হয়। বিচার বেশী করতে বারণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ছাদে উঠতে গেলে সিঁড়ি দিয়ে এক একটি সিঁড়ি পার হয়ে হয়ে যেতে হবে, হেল্লে দুল্লে চলবে না। উদ্দেশ্য ঠিক রেখে সদাসৎ—বিচার সর্বদা ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তণ—সাধুসঙ্গ, আত্ম সমীক্ষা, নিষ্কাম প্রার্থনা এসব করতে হয়। আরো বলেছেন, জ্ঞান পথে যেমন, তেমন ভক্তি পথেও যেটি ভক্তির বাধা সৃষ্টি করবে তাকে তখুনিই বিচার করে ত্যাগ করতে হবে। এই তো জ্ঞান মিশ্রাভক্তি! শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ভক্ত হবিতো বোকা হবি কেন ?" ভক্তি পাকা হবার পূর্ব পর্যন্ত বিচার জ্ঞান রাখতে হবে।

নিজ জীবনের নজীর দিয়ে বলছেন, আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম, ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম—বল্লেছিলাম, "মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।..........

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদের বলেছেন—একটা গান শুনুন, রামপ্রসাদের গান,

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলেরে (মন),
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
(তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা
তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি।" ইত্যাদি

ঈশ্বর মানুষকে বিবেক দিয়েছেন। সংসারের কর্ম হোক বা ঈশ্বরের কর্ম হোক, বিবেক বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হবে।

নিষ্ঠা কর্ম করে হয় না। ভালবাসা পাকলে ভাব-মহাভাব আপনিই আসে। জ্ঞান পথেও জ্ঞানোন্মাদ আছে, আবার ভক্তিপথেও প্রেমোন্মাদ আছে। ঈশ্বর লাভ কেবল প্রেমাভক্তি থেকেই হয়।

১৮৮৫, ৭ই জুন, ছোট নরেনকে জিজ্ঞাসা করছেন—আচ্ছা "তুই কি ভালবাসিস ? জ্ঞান না ভক্তি ?" ছোট নরেন শুধু ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ—না জানলে ভক্তি কাকে করবি ? (মাষ্টারমশাইকে দেখাইয়া সহাস্যে)—একে যদি না জানিস, কেমন করে একে ভক্তি করবি ?" (মাষ্টারের প্রতি)—"তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে—শুধু ভক্তি চাই, এর অবশ্য মানে আছে। আপনা আপনি ভক্তি আসা সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষ্যণ। জ্ঞান ভক্তি—বিচার করা ভক্তি।" "শুদ্ধাভক্তি-ই সার আর সব মিথ্যা। এই ভক্তি কিরূপে হয় ? প্রথমে সাধুসঙ্গ করতে হয়, সাধুসঙ্গ করলে ঈশ্বরে বিশ্বাস শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, নিষ্ঠার পর ভক্তি। তারপর ভাব-মহাভাব, প্রেম, বস্তু লাভ।

১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

মহিমাচরণ বেদান্ত চর্চা করেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করে সর্বদা বিচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(মহিমার প্রতি)—জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা। এরই নাম জ্ঞান। এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্মই ইনিই।

নিজের স্বরূপে। আমি আর পরব্রহ্ম এক, মায়ার দরুণ জানতে দেয় না। "হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোনার উপর বোড়া কতক মাটি পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া। ভক্তরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কিরূপে সস্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা (তোতাপুরীজী) উপদেশ দিত—মন বুদ্ধিতে লয় করো, "আমি" থাকবেই ; যায় না।"

তাই বলছিলাম, যদি 'আমি' যাবেই না, থাক তবে, "দাস" আমি হয়ে, "ভক্তের আমি" হয়ে। রাগ ভক্তি এলে অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধীভক্তি হতেও যেমন যেতেও তেমন। কত লোক তাই বলে, আর ভাই কত হবিষ্য করলুম, কতবার বাড়ীতে পূজা আনলুম, কিন্তু কি হলো! এই হচ্ছে বৈধীভক্তি, বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। নিষ্ঠা নেই, অনুরাগ নেই, নেই ভালবাসা। যাদের রাগভক্তি তাদেরই আন্তরিক! ঈশ্বর তাদের ভার লন। রাগভক্তি এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভালবাসা বোঝাতে একটি সরস দৈনন্দিন চিত্র আঁকলেন উপমার তুলিতে,—সংসারী লোকেদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলে, ওরে তোব খুড়োর জন্য পা-ধোবার জল আন।"

বলছেন গিরিশচন্দ্রকে, প্রহ্লাদ চরিত্রাভিনয় দেখতে স্টার থিয়েটারে এসেছেন, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪। কলিকালে নারদীয় ভক্তি। "সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তি মানে কি—না, কায়-মন-বাক্যে তাঁর (ঈশ্বরের) ভজনা। কায় অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা।"

বুঝিয়ে দিলেন কর্মের ইন্দ্রিয়ও ভগবান দিয়েছেন, তবে কেবল পেটের সংস্থান করার জন্য নয়। জীবন ধারণের জন্য কতই তো খাটুনি মানুষ খাটে কিন্তু এই হাত পা, মুখ, কান, চোখ এদের যে মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা তার জন্যই খাটতে হয়। প্রত্যেকটি অঙ্গকে ঈশ্বরের কাজে লাগাতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়

কর্মেন্দ্রিয় কেবল ভোগের জন্য নয়, ঈশ্বর সম্ভোগের জন্য এটি জানতে হয়, কলিতে বিধান নারদীয় ভক্তি,—সর্বদা তার নাম গুণ-কীর্ত্তণ করা। যাদের সময় নেই তারা যেন সন্ধ্যা সকাল হাততালি দিয়ে একমনে 'হরিবোল' 'হরিবোল', তাঁর ভজনা করে। "ভক্তির আমিতে অহংকার হয় না। কি করে ভক্তির সৃষ্টি হবে? ভক্তি কি বাইরের জিনিষ যে কেউ ঢুকিয়ে দেবে। না, ভক্তি আত্মরাগ। মনের মধ্যেই ভক্তিরসের খনি আছে। উপর উপর ভাসলে সে রস পাওয়া যায় না। ডুব দিতে হয় ও রস ঈশ্বরের নিজের। বেদে তাই ঈশ্বরকে "রস বৈসঃ" বলেছেন।

গান গাইলেন—"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন ॥"

বললেন, খাটতে হয়, প্রতিটি শরীরের অঙ্গকে খাটাতে হবে, এমনি সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের অমন সুন্দর দেহ সৃষ্টি করেন নি। কেবলই কি দেহ সুখের জন্য! ঈশ্বর চান আমরা তাঁর দেওয়া যন্ত্রের সদ্ব্যবহার করি। নিয়মিত ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তণ, ভক্তসঙ্গ, তাঁর স্তবস্তুতি করলে ভক্তি হবেই হবে। ভক্তি আলেকলতার মত। আলেখলতার জল পেটে পড়লে বেড়ে যায়, এর ক্ষয় হয় না। একটু নিষ্ঠা করে একমন হয়ে অভ্যেস করলেই ভক্তি হয়।

নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি থাকলেই ভাব। ভাব ঘনীভূত হলে-ই মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম। প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারে না। খাটতে হয়, বসে বসে ভক্তি ভক্তি মুখে বললে কি হবে? ভক্তি কেন হয় না, বললেও হবে না। ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর, সাধুসঙ্গ সর্বদা করতে হয়। দু একদিন করেই না হলোনা বলে ছেড়ে দিলে কি হবে! খানদানী চাষার মত শুকাদিনেও চাষে লেগে থাকতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তুমি হয়ত ঈশ্বর ঈশ্বর করছ, আর পাঁচজন নানা কথা বলছে। হয়তো বলছে, খুব ভক্তি দেখাচেছ, এমন অনেক দেখেছি। শেষে এ কুল ও কুল দু কূলই যাবে। মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে তখন বুঝবে। আরে সবই রয়ে সয়ে করতে হয়। বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল না। কিছুই করলো না, একটু আধটুতেই বাড়াবাড়ি

হয়ে গেল। আর দিন রাত যে সংসার, সংসার বিষয়, কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে মেতে আছে তাতে আর বাড়াবাড়ি নেই ; মাথাও গোলমাল হবে না, ববং খুব কৃতি লোক—সংসারের জন্য কিই না করছে। ঠাকুর বলছেন—ওগো, ঈশ্বর ঈশ্বর করাতে বাড়াবাড়ি নেই, এতে অজ্ঞান করে না বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। আমি ভক্ত, আমি ঈশ্বর নিয়ে মেতে আছি, এ 'আমি' আমার মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক, শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাকে পিত্ত নাশ করে। উলটে উপকার করে। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, অন্য মিষ্টি খেলে অপকার হয়, মিছরী খেলে অম্বল নাশ হয়।

সকল কাজের মধ্যে জাগ্ প্রদীপের মত প্রার্থনা জাগিয়ে রাখতে হয়। 'কর্ম" আর কি! তাঁরই উপাসনা। তাঁকে ধরে থাকা। ঠাকুর বলেছেন, আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলাম মা, আর কিছু চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। শুদ্ধাভক্তি আর শুদ্ধাজ্ঞান একই।

ভক্তদের বলছেন, সমাধি মন্দিরে দক্ষিণেশ্বরে ছোট ঘরটিতে বসে আছেন ১৮৮৫ ৭ই মার্চ "একটু আধটু করলে কি হবে! ঈশ্বরের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয় তবে হয়। জপ ধ্যান করে। ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। "অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়। কিন্তু কথা কইতে নাই, তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইশারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এসো, ওটা নিয়ে এসো, হুঁ, উহুঁ এইসব করে।"

"আবার কেউ মালা জপ করছে, তার ভিতর থেকে-ই মাছ দর করে। জপ করতে করতে হয়তো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ মাছটা! যত হিসেব সেই সময়।"

কেউ হয়তো গঙ্গা স্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথায় ভগবান চিন্তা করবে, গল্প করতে বসে গেল। যত রাজ্যের গল্প! তোর ছেলের বিয়ে হলো, কি গয়না দিলে? অমুকের বড় ব্যামো, অমুকে শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে কিনা? অমুকের পাকা দেখায় বড় ব্যস্ত ছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দেখদেখি কোথায় গঙ্গাস্নানে এসেছে, যত সংসারের কথা!

আমরা ভক্ত হতে চাই, কিন্তু ভক্তির দিকে মোটে-ই নজর দিই না। কোন রকমে সর্টকাটে কিছু হয় কিনা তাই চেষ্টা করি। কিন্তু যারা ভক্ত তারা কি করেন, কি তাদের প্রার্থনা, তারা ঈশ্বর ভালবাসা ছাড়া কিছু-ই চান না। ঠাকুর নিজেই কথাটি তুললেন, যশোদা সংবাদ। "কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন। তারপর যশোদাকে বল্লেন, "আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে কিছু বর লও।" যশোদা বল্লেন, বর আর কি দিবে। তবে এই বলো—যেন কায়মন-বাক্যে তাঁর-ই সেবা করতে পারি, যেন এই চক্ষে তাঁর ভক্ত দর্শন হয়—এই মনে তার ধ্যান চিন্তা যেন হয়—আর বাক্য দ্বারা তার নাম গুণ-গান যেন হয়।" সব ইন্দ্রিয়ই যেন তাঁর-ই কাজ করে। (১৮৮৪, ৫ই জানুয়ারী) মূলকথা, অহৈতুকী ভক্তি। বলছেন মহিমা চরণকে ১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারী—"তুমি এইটি যদি সাধতে পার তা হলে বেশ হয়।" তিনি চেয়েছিলেন আমরাও যেন কোনকিছু চাই না, কিন্তু ভালবাসি ভগবানকে। বলছেন ব্যাখ্যা করে, "মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া কিছু-ই চাইনা—কেবল তোমায় চাই। এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। শুদ্ধাভক্তি। বাবুর কাছে অনেকে-ই আসে নানা কামনা করে ; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না কেবল ভালবাসে ব'লে বাবুকে দেখতে আসে, তাহলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয়।" ঈশ্বরের কৃপা তার উপর হয়। কৃপা ছাড়া কোনো কিছুতে-ই ঈশ্বর লাভ হয় না। ভক্তি কৃপা টেনে আনে। এটি ভাগবত ধর্ম। অনেকবার-ই বলেছেন ঠাকুর শ্রীমুখে, ভাগবত, ভক্ত ভগবান এক। ভাগবত ধর্মের আশ্রয় করলে কি হয় ? বলছেন ; গুণকীর্ত্তন করলে, নাম করলে, নামের এমনই মাহাত্ম্য হাজার মনের নৌকা চড়ায় আটকে গেছে, নড়ছে না, নুন বোঝাই, মাঝিরা দু তিনজন পাড়ে নেমে গুণ টেনে নিয়ে যায়। তেমনি নামের গুণে-ই তুমি চলে যাবে তোমার গন্তব্য পথে। নাম কি যেমন তেমন! নাম আর নামী আলাদা নয়। তাই প্রেমবতার মহাপ্রভু জীব উদ্ধারের জন্য হরিনাম বিলিয়ে গেলেন। কেবল বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। বলছেন বিদ্যাসাগর মশায়কে 'যদি' তাতে বিশ্বাস থাকে তা'হলে পাপ-ই করুক, আর মহা

পাতকই করুক, কিছুতে-ই ভয় নাই। এই বলে ভক্তের ভাব আরোপ করে নামের মাহাত্ম্য গাইছেন—'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি। আখেরে এদীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী। নাসি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান—আদি বিনাশি নারী-এসব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।

তারপর সৎসঙ্গ—সাধু ঈশ্বরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। জ্বালান প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালাতে হয়। সাধু থেকে বিশ্বাস, ঈশ্বরে ভালবাসা নিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য বলছেন, "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।" সাধুসঙ্গ গৃহীর পক্ষে চাল ধোয়া জল—বিকার কাটে—ইন্দ্রিয় ভোগের বিকার।

সৎ সঙ্গে ভাব ভক্তি ভালবাসা এই কটি-ই সহজে হয়। সাধু জীবন সঙ্গ আমাদের ঈশ্বর ভাবতে শেখায়—গেয়ে শোনালেন আর একটি রামপ্রসাদের গান—'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, (ও সে) যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়। কালীপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয়। (যদি চিত্ত ডুবে রয়)। তবে পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছু-ই কিছু নয়।' চিত্ত তদ্গত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। এর সাথে চাই অভ্যাস আর নিষ্ঠা। কষ্ট করে হলেও সৎসঙ্গ করতে হয়। গৃহীর পক্ষে খুব দরকার। নিষ্ঠা কি? শ্রীরামকৃষ্ণ গোপীদের নিষ্ঠার কথা বার বার বলেছেন কিন্তু আমরা কতটা বুঝি? নিষ্ঠার প্রথম কথা একাগ্র হওয়া। মনকে একটি ইষ্টে বা আদর্শে স্থির নিবদ্ধ করা! যতদিন গুরু হয়নি, ততদিন আমি জানিনা আমার ইষ্ট কি বা কে? তখন যখন যেমন মনে হচ্ছে, ভাল লাগছে তাঁকেই ধ্যান জপ করছি। আজ একটা কাল একটা মন কেবল একটি দেবতাতে দাঁড়াচ্ছে না। গুরু হয়ে গেলে, গুরু-দেব কি করলেন, তিনি আমার ইহকাল, পরকাল জানেন, আমার সংস্কার কেমন তা-ও জানেন; এসব বুঝে কোন দেবতা আমার ইষ্ট স্থির করে দিলেন। কৃপা করে বলে দিলেন, আজ থেকে এই মন্ত্র, ইষ্ট-মন্ত্র তোমাকে দিলাম। এই মন্ত্রের সাধনা করলেই তোমার ইষ্ট বা ভগবান লাভ হবে। সেই দিন থেকে আর দিক্-ভ্রান্তের মত আজ একে কাল তাকে ভজতে হবে না। প্রাণের সকল অনুরাগ দিয়ে ইষ্ট চিন্তা ধ্যান জপ করলে-ই হবে। এক দুয়ারে

মাথা খুঁড়লে-ই হবে, পাঁচ দুয়ারের দরকার নেই। ইষ্ট মন্ত্রের মধ্যেই ইষ্ট দেবতা আছেন। তাঁর সেবাই চরম কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিয়েছেন, একটি সংসার চিত্রের। সংসারে শ্বশুর, ভাসুর, দেওর স্বামী সকলেই আছেন, বউ সকলের-ই সেবা করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে কিন্তু স্বামীর সাথে তার আলাদা ব্যবহার। প্রাণ ঢালা ব্যবহার, যেটি আর অন্যের সঙ্গে হয় না। এটি 'ইষ্ট' তিনি আমার সর্বস্ব। ইষ্ট প্রকৃতপক্ষে স্বামী। আমার সর্বস্ব। অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধা করবো না তা নয়, প্রণাম করবো না তা নয়, প্রণাম করবো, শ্রদ্ধা করবো কিন্তু আমার বলে সর্ব্বস্ব থাকবে, আমার স্বামীটি।

এইটি নিষ্ঠা। অব্যাভিচারিনী ভক্তি। এ না হলে ভক্তি পাকে না। উড়ো উড়ো থাকে। আমরা ইষ্টে দৃঢ় করে মন বসাতে পারি না। সংস্কার নানা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়ে মারে। আমরা বিভ্রান্ত পথিকের মত পথ চলে পরিশ্রান্ত হই কিন্তু গন্তব্যে পেঁাছোতে পারি না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, এক ব্যক্তি গুরুমন্ত্র নিয়েছেন, ইষ্ট দেবতা স্থির হয়েছে। গুরু বলে দিয়েছেন, উনি তোমার ইষ্ট, এঁকে সর্বদা জপ ধ্যান করবে তাতেই তোমার সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কিন্তু বাড়ীতে যখন-ই কিছু হয়, পূজা, বৈধীকর্ম বা অসুখ-বিসুখে মানত করেন—তখন নয় ৺মা কালীকে বা ৺বাবা বিশ্বনাথকে। কিন্তু গুরু ইষ্ট নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন অন্য এক দেবতাকে। বরাবর করে আসছেন আজ আর পুরানো সংস্কার বাদ দিয়ে ঝেড়ে ফেলে নতুন সংস্কার সৃষ্টি করতে পারছেন না। একে ইষ্টে নিষ্ঠা বলা যাবে না। জিজ্ঞাসা করলে উল্টে বলবেন, কেন তাতে হয়েছে কি? ৺মা কালী বা ৺বাবা বিশ্বনাথ কি দেবতা নয়? ইষ্ট নির্দিষ্ট হয়েছে বলে কি ওদের দেবত্ব চলে গেছে? শুধু কি তাই, বিজ্ঞের মতই বলবেন—আমি যদি ৺মা কালীর মধ্যে আমার ইষ্টকে দেখি, ৺বাবা বিশ্বনাথ বা গণেশ বা অন্য যেকোন দেব দেবীর মধ্যে আমার ইষ্টকে দেখি তাতে দোষের কি আছে? তাতে তো আমার ইষ্টকেই মানা হলো। আমি বলি, তা- না করে যদি আপনার ইষ্টের মধ্যে-ই এদের এখন থেকে দেখেন তাতে ইষ্টও রইলেন পুরানো সংস্কারের দেবতারাও হারিয়ে গেলেন না। নিজেই বুঝে দেখুন কোনটাতে গুরুবাক্য

লঙ্ঘন হয় না। ইষ্টে পুণঃ পুণঃ মন হয়, মনে ইষ্টের ছাপ বার বার পড়ে। এতো জপ। যতদিন না ইষ্টলাভ হয়, ইষ্টমন্ত্র পুণঃ পুণঃ জপ করতে হবে। ইষ্ট-মন্ত্র তো পুনঃ পুনঃ জপ করতে গুরু আদেশ করেছেন। ধ্যান করতে বলেছেন, সকল কাজে সকল সময় মনে জপ-ধ্যান স্মরণ মননের দ্বারা জাগিয়ে রাখতে বলেছেন। কারণ ইষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বের মঙ্গল। এটি নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠাকে অভ্যেস করতে হয় ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে—স্বাভাবিক করতে হয় প্রাত্যাহিকতার প্রাঙ্গণে। যতদিন এই তদীয়তা ইষ্ট সর্ব্বস্ব না করা যায় ততদিন ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। কথা হচ্ছে প্রাণ-মন নির্বিচারে ঢেলে দেওয়া। অহৈতুকী ভক্তি একে বলে। ভালবাসার কোন হেতু নেই। কোনো কিছুর জন্য-ই না।

ভগবান বারবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, এই প্রাণঢালা ভালবাসায় ভগবান বাঁধা পড়েন আর তা বিফলে যায় না। সর্বশাস্ত্রের সার গীতায় যেমন বলেছেন—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যাসি শাশ্বতং ॥ সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য—মামেকং শরণং ব্রজ। অহস্তাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ ॥" বলছেন আমাকে নিষ্ঠা কর, স্থিত হও। সব পাপ থেকে আমি-ই রক্ষা করবো। ভাগবতে আছে, নব-যোগীন্দ্রের একজন, নিমি-রাজাকে বলছেন, "যানাস্থায় নরো রাজন ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবণ্ নিমীল্য বা নেত্রেণ স্খলেন্ন পতেদিহ ॥" (১১।২।৩৫)। ভাগবত ধর্ম অবলম্বন করলে মানুষ কখনো দিকভ্রান্ত হয় না, প্রমাদগ্রস্ত হয় না। সে যদি চোখ বুজেও দৌড়ায় তবু পড়ে না।

নতুন যুগে নতুন বেদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এই ভাবটি আমরা বিশেষ করে দেখতে পাই। মানুষ দুর্বল, অন্নগত প্রাণ, সমস্যা জর্জরিত, তাই এ যুগে নরদেবতা অনেক নেমে এসে, পাশে বসে আপন জনের মত বলছেন, কিছু না পারো, "আমাকে ধরো" "বকলমা দাও", সব পাবে, ধমার্থ কাম মোক্ষ যে যা চাও অবশ্য-ই পাবে কিন্তু—কিন্তু কি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিজের মুখের কথাই আসুন শুনি—একটি ব্রাহ্মণ যুবককে সম্বোধন করে বলছেন—৭ই মার্চ ১৮৮৫, "জ্ঞানচর্চা ছাড়—ভক্তি নাও—ভক্তি-ই সার। আজ

তোমার কি তিন দিন হ'ল ?

যুবক (হাত জোড় করিয়া) আজ্ঞা হ্যাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলছেন : "বিশ্বাস কোরো"—"নির্ভর কোরো"—তাহ'লে নিজের কিছু-ই করতে হবে না। মা কালী সব করবেন।" বলছেন—আমাকে বিশ্বাস করো—নির্ভর করো—অর্থাৎ ভালবাসো। আমি তোমার হয়ে আর সব করবো। এতটুকু চাইলেন। দিলেন হাত ভরে, প্রাণ ভরে,—ঈশ্বর মানুষ হয়ে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে "ত্যাগ"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়ে অনেকেরই প্রথম ধারনা হয়, যেহেতু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গৃহীদের জন্য বলেছেন, গৃহী এই পাঁচখণ্ড কথামৃত সঙ্কলন করেছেন "ত্যাগ বৈরাগ্যের" কথা কথামৃতে তেমন একটা নেই। যা আছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। একেবারে না বললে নয়, এমনভাবে। সত্যাই কি তাই ? একটু গভীরে গিয়ে কথাটা ভাবতে হবে।

প্রথম কথা যিনি এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের উৎস, যাঁর গোমুখ থেকে কথামৃত গঙ্গা মানব-কল্যাণের জন্য, ধর্ম স্থাপনের জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছেন, তিনি কি প্রকৃত সত্যকে গোপন করে নিছক কতগুলি গল্প উপমা গান বা কতগুলি লোক সংগ্রহ করে নেচে কুঁদে দিন কাটিয়ে—অপর পাঁচজনের মতই নিঃশেষ হয়ে গেলেন ! আর তাঁকেই বলবো অবতার ! অবতার তো তারণ করতে আসেন। ধর্মে যখন গ্লানি দেখা দেয়, মানুষ যখন সত্য জীবন অনুসন্ধান ভুলে যায়, গীতা বলেছেন, মানুষের মনের মলিনতা দূর করতে ভগবান আবির্ভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার ভাবলে এটিও ভাবতে হবে। তিনি সত্যকে মানুষের জীবন যাত্রার অনুকূল করে বলে গেছেন, নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন তাঁর অনুশীলন। তাঁর জীবন প্রতি কাজের নজির।

ত্যাগ, আদর্শ জীবনের, ঈশ্বর লাভ পথের একমাত্র আশ্রয়। আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা বারবার এই কথা—স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ।" ত্যাগ ছাড়া ঈশ্বর

অমৃত লাভ অসম্ভব। এই অসম্ভব জেনেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতে ত্যাগের কথা উহ্য রেখেছেন, এ কথা ভাবা যায় না। এখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে কিভাবে ত্যাগের কথা আছে সেটি দেখতে হবে। খোলা চোখে আমরা গীতাকে কি দেখি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষাদযোগ থেকে শুরু করে মোক্ষযোগ এই আঠারোটি অধ্যায়ের মধ্যে কত যোগের কথা—জ্ঞান, কর্মভক্তি, রাজযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, বিভূতিযোগ, জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ, অক্ষর-ব্রহ্মযোগ বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ বলেছেন। অধ্যাত্মবিষয়ের এমন কিছু যোগ নেই, যা বলেন নি।

যোগ মানে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়া। কি ভাবে যুক্ত হওয়া যায়। গীতাতে দেখছি অসংখ্যযোগ, কিন্তু আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে শুনলাম, তিনি বলছেন, গীতা দশবার বললে ত্যাগী হয়, গীতার সার কথা "ত্যাগ"। হে জীব আসক্তি ত্যাগ করে; সংসার আসক্তির কথা বলছেন, ঈশ্বরে আসক্তি করো। জীবনমুক্ত হও। তুমি মানুষ মানুষই থাকবে, সংসার থাকবে, সংসারী তুমি থাকবে না। এইটি গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। নানা ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গূঢ় সত্যটি প্রকাশ করেছেন। মানুষের জীবন ধারনের জন্য যতটুকু সংসার দরকার সেটুকু তো থাকবেই কিন্তু জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অমৃতত্ব লাভ, সেটির জন্য চাই সংসার আসক্তির পূর্ণ ত্যাগ। ত্যাগ বলতেই আমরা প্রথমে বুঝি— সংসার ত্যাগ, কর্মত্যাগ। হাত-পা গুটিয়ে জড়পিণ্ড হয়ে অর্থাৎ বেঁচে মরে থাকা। এদিকে আমার পেট থাকবে, মনে মনে সব আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা থাকবে, কেবল ত্যাগ করলাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও ভগবান যে অনন্ত শক্তি মানুষকে দিয়েছেন, দেহমনকে চালনা করে মানুষ জীবন সফল করতে, তাদের উপযুক্ত ব্যবহার। একে তামসিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলা উচিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের জন্ম-লগ্নেই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ (শ্রীম) এই কথা শুনে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক ঘর ভক্তদের বলছেন,— "কর্ম কেউ জোর করে ত্যাগ করতে পারে না। যখন একবার হরি বা রাম নাম করলে—রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন

কর্ম ত্যাগের অধিকার হয়েছে। কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।" এই তো শ্রেষ্ঠ ত্যাগের কথা—এ দিয়েই তো কথামৃত শুরু। শ্রীম-র কানে এই ত্যাগের কথাই তো প্রথম প্রবেশ করেছিল।

প্রকৃত ত্যাগের অধিকারী কে? জীবন ধারণের কর্ম আছে। কর্ম ঈশ্বর লাভের জন্যও আছে। যে কোন কর্মই ইচ্ছা হলো আর ত্যাগ করলাম, ভাল লাগলো না, ছেড়েছুড়ে দিয়ে বললাম, আমি সব ত্যাগ করেছি, ত্যাগী সাজা এতে হয়, কিন্তু ত্যাগী প্রকৃত হওয়া যায় না।

প্রথম দিন মাষ্টারমশায় কর্মত্যাগে কখন মানুষের অধিকার যে কথাগুলি শুনলেন, তা হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য বিধিবাধীয় কর্ম অর্থাৎ প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি বা ভালবাসার জন্য যে প্রস্তুতি তার জন্য বিধি অনুযায়ী কতগুলি কর্ম করতে হয়। এইগুলি করলে ঈশ্বরে ভালবাসা, অনুরাগ, ভক্তি, প্রেম আসে তখন আর এ কর্মের প্রয়োজন থাকে না। একটি ঘরোয়া উপমা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—একজন ওস্তাদ খুব ভাল গান বাজনা করেন। গান গাইবেন, আসর তৈরী হয়েছে। সকলেই তার গানের কথা বলছেন, কত কথা—এমন সময় তিনি এসে পড়লেন তখন আর একটিও কথা নেই। তখন কেবল তাঁকে দেখে আনন্দ। যাকে এতক্ষণ পাবার জন্য দেখার জন্য ব্যাকুল সকলে হয়েছিল, সে এসে গেছে। কর্মও তাই। যার জন্য কর্ম করা, তাকে পেলে আর দরকার নেই।

দ্বিতীয় দর্শনের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলছেন, সংসারী, গৃহী যারা, যারা বিবাহ করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে—তাদের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, সংসারের দায়িত্ব পালন করা। স্ত্রী পুত্র তাদের ভরণ পোষণ করা। এই সকল কর্ম দায়িত্বহীনের মত অবহেলা করাকে কর্ম ত্যাগ বলে না। এসব ভণ্ডামি এবং অন্যায়। এসব মনুষ্যত্বহীনের কথা। যে, যে আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সংসারীই হোক বা সন্ন্যাসী হোক তাকে নিজ নিজ আশ্রমের সকল কর্ম করতেই হবে, তবে সে উন্নত কর্মের অধিকারী হবে। তার আগে নয়। এখানেও একটি নিত্য দেখা উপমা দিলেন—"প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয় দিন ছিল। কাজকর্ম,

নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম মাগ ছেলে সব শ্বশুর বাড়ীতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপুলে। আমি বকলুম, দেখদেখি ছেলেপুলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে মানুষ করবে? লজ্জা করে না, মাগ-ছেলেদের আর একজন খাওয়াচেছ।…আমরা অনেক বকলুম, আর কর্ম কাজ খুঁজে নিতে বললুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ মুখের তিরস্কার দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য হওয়া ত্যাগ নয়। দায়িত্ববোধ মনুষ্যত্ব। হুঁস হারিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। আর মানুষ না হলে তার জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা কিছুতেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যার এখানে আছে তার সেখানে আছে। অর্থাৎ যার কর্মে নিষ্ঠা নাই সে যে কর্মই হোক, সে কিকরে ঈশ্বর লাভ করবে, যা শ্রেষ্ঠ কর্ম।

ত্যাগ মন্ত্র নয়, ত্যাগ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন—এ জীবনের জন্য চাই প্রার্থনার মত একটানা উপাসনা। কর্মের মধ্য দিয়েই আসবে ত্যাগ। এই কথাই যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীমর প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শনের দিনের চালচিত্রের মতই ত্যাগের রেখা-রূপের আভাস দিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচখন্ড কথামৃতের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে এক ত্যাগের শিক্ষাই দিয়েছেন। কর্মযোগী যারা তাদের শিখিয়েছেন, সংসারের সকল কর্ম করে কি করে ত্যাগী হতে হবে। জ্ঞানী যারা, অর্থাৎ যাদের ভোগ বাসনা নেই তাদের শিখিয়েছেন জ্ঞানের পথে বিচারের মধ্যদিয়ে ত্যাগী হতে। তাঁর নিজের জীবনই একথার বড় ব্যাখ্যা। কথায় বলে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগীর বাদশা। এমন স্বাভাবিক ত্যাগ ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি। কেবলই কি "মাটি টাকা টাকা মাটি" ব'লে দুই ফেলে দিলেন জলে! মাটিও টাকাতে সমান আসক্তি জ্ঞান করলেন; না আরও অনেক বেশী। গায়ে কোন ধাতুদ্রব্য লাগলেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁকে যেত। স্ত্রীলোকের স্পর্শে সমস্ত ভাব মুহূর্তে শিশুর মত হয়ে যেত। কোন জিনিষ সঞ্চয় করার উপায় ছিল না। একদিনের ঘটনা বর্ণনা করলে বোঝা যাবে। শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের বাগান বাড়ী গেছেন, খুব

পেট খারাপ, শম্ভু মল্লিকের বাড়ীর লোকেরা একটু আফিং দিয়েছেন, খেলে পেটের অসুখ সেরে যাবে। ঠাকুর হাতে করে নিয়ে ৺কালীমন্দিরে নিজের ঘরের দিকে ফিরছেন, কিন্তু পথ আর দেখতে পাচ্ছেন না—উলটা পথে পা স্বাভাবিক ভাবে চলে যাচ্ছে—তখন তিনি বুঝতে পারলেন আফিং নিয়ে যাওয়া চলবে না। ফিরে এলেন ; তখন বৈঠকখানায় কেউ নেই, জানালার ফাঁক দিয়ে ফেলে বললেন, "ওগো তোমাদের জিনিষ রইল, তবে নিস্তার। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী নহবতে আছেন, ঠাকুর গেছেন। মা তাঁর হাতে একটু মশলা দিয়েছেন ঘরে নিয়ে যেতে। কিন্তু নিয়ে যেই বেরিয়েছেন পা গঙ্গার পোস্তার দিকে নিয়ে চলেছে হুঁসও নেই—হৃদয় ঠাকুর, ভাগ্নে, দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে নিয়ে আসেন। সামান্য সামান্য দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্যেই তাঁর অসামান্য ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই। বড় বড় ত্যাগের কথা তো সকলের জানা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করেছেন, স্ত্রীর সাথে কেবলই ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ, দেহ সম্বন্ধ ছিলই না। মানুষ "আমি অহংকারে" পূর্ণ, সেই আমি কোন দিনই তাঁকে স্পর্শ করে নি। কেবলই "তুহু"-মা তুমি। আমি খাই দাই বগল বাজাই—আর সব মা জানেন। "আমিই" সংসার। "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যে আমি সংসার করে, অহংকার করে সেটি "বজ্জাৎ" আমি। ত্যাগ করতে হয় "বজ্জাৎ আমি।" যে আমি ঈশ্বরের দাস, সে আমিতে দোষ নেই। ত্যাগ যতক্ষণ, স্বভাবসিদ্ধ না হয় ততক্ষণ কর্ম আছেই, ততক্ষণ ঝড়ের এঁটো পাতা হওয়া যায় না। ততক্ষণ আমি দৌরাত্ম্য থাকে। স্বপ্নে বাঘ দেখে ভয় পেয়েছে, ঘুম ভেঙেও নিস্তার নেই, বুক দুর দুর করছে। সহজে ভয় যায় না। অহংকারও অমনি সহজে যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল সহজ ত্যাগ। সিঁথির মহেন্দ্র পাল রামলালের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে গেছেন ঠাকুরের সেবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—কাকে দিয়ে গেছে, আমাকে না তোর খুড়ীকে। রামলাল বলছেন, না আপনাকে। একবার ভাবলেন দুধের পয়সাটা এর থেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু তা কি হয়? সন্ন্যাসী মন ছাড়বে কেন? ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হলো, ঘুম নেই। জেগে উঠে

বললেন, ওরে রামলাল, সাকালে উঠেই দিয়ে আয়, আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে পাচ্ছি না। সকালে দিয়ে এলে শান্তি।) একেই শাস্ত্রে বলেছেন—"উর্ধ্বে সৌরতম্"—সমস্ত ইন্দ্রিয়, গ্রন্থিতে ত্যাগ। অস্থি মজ্জায় ত্যাগ। এই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি কি শিক্ষা দিবেন? ত্যাগ দরকার নেই, ঈশ্বরকে দরকার আছে। তা নয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে কোন্ ত্যাগের কথা বলেছেন—কথামৃতের কথাই বলি—ইং ১৮৮২, ২৮ অক্টোবর। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ভক্ত ও নেতারা উপস্থিত। তাদের লক্ষ্য করে বলছেন "সংসারী লোকেদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের একটাই উদ্দেশ্য মানুষ জানুক, দেহসুখ, টাকা, মান, যশ, এসব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরে ভক্তি ভালবাসায় তাঁকে লাভ করা। জানা উদ্দেশ্য। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"অনিত্যসুখংলোকম্‌মিং প্রাপ্য ভজস্ব মাম।" সুখ-দুঃখ দু-দিনের জন্য এটি দৃঢ় করে জানতে বলছেন।

এমন ত্যাগের কথা বলছেন যা সংসারীদের সইবে। অসহ্য হবে না। ত্যাগ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটা ভীতি আছে। ত্যাগ কথাটাই সত্ত্বগুণের ভাব মনে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু যাদের সত্ত্বগুণ নেই তাদের মনের ভাব হচ্ছে, যদি সবই ত্যাগ করবো তবে এ জীবনের লাভ কি? জীবন বলতে ভোগকেই জানি, তাই ভয় ত্যাগ করলে থাকবে কি? আমি কি নিয়ে থাকব। জীবন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাই আমাদের নেই তাই ত্যাগের মধ্যে ভয়ের বিভীষিকা দেখি। আমরা ভগবানকে চাই কেন, পুজা, পাঠ, দান ধ্যান করি কেন? প্রথম কারণ এসব কর্মের দ্বারা আমাদের ভোগ সুখ বৃদ্ধি পাবে। আর একটু যদি বড় করে ভাবতে পারি তাহলে বলবো, পুণ্য অর্জন কবার জন্য। কাজেই ভগবানকে পেতে গিয়ে যদি ভোগ সুখ ত্যাগ করতে হয়, তবে এতে লাভ কি? আমাদের ভগবান যদি ভোগ বৃদ্ধির জন্য হয় তবে আছি। ভগবানকে আমরা উপায় হিসাবে ব্যবহার করি বা করতে ভালবাসি। আমাদের নিজের শক্তিতে যা সম্ভব না, ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান

হয়ে সে ভোগ সুখ আমরা পেতে লালায়িত এবং এর জন্য ভগবানের পূজা, আরাধনা, পাঠ, উৎসব করতে খুব রাজী কিন্তু ত্যাগ অর্থ ভোগ সুখ ত্যাগ হলে ওটা বরং অপরে করুক তাকে আমরা বাহাদুরী দেব, দু-চারটে সাধু বাক্য বলবো, হয়ত দানও কিছু দিতে পারি কিন্তু নিজে পালন করা সম্ভব নয়। বলবো, ও আমাদের নয়।

এই যে আমরা সংসারে যারা মুখ গুঁজে পড়ে আছি, তাদের সংখ্যাই তো বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কথাই অনেক বেশী ভেবে ছিলেন আর ভেবেছিলেন বলেই Suger coated pillএর মতই ত্যাগকে রইয়ে সইয়ে নানাভাবে বলেছেন যাতে আমরা একেবারে মুখ ফিরিয়ে না থাকি। তাই একদিন নিজেই গাইছেন, "এসে পড়েছি যে দায় সে দায়, বলবো কায়, পর কি জানে পরের দায়।" তাঁর নিজের দায়। ঈশ্বর দায়ে পড়েই এমনি অবতার হয়ে আসেন।

কেশব সেনের সাথে নৌকা বিহারে গেছেন। ঐ এক কথা ব্রাহ্মভক্তরা প্রশ্ন করছেন ঠাকুরকে—"মহাশয় সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না? "মনের ভাব, অর্থ স্ত্রী পুত্র বিষয় এতো সাধের সংসার ঘিরে আশা আকাঙ্ক্ষা তা কি সবই ছাড়তে হবে? তা না হলে কি ঈশ্বরকে পাব না। ওজনে কোনটা বেশী, সংসার না ঈশ্বর, এ ধারণা তো নেই। আমরা লাভ তো সংসার ভোগেই জানি। ঈশ্বর পেলে কি লাভ হয় জানি না তাই সংসারের প্রলোভনের তুলনায় ঈশ্বর অকিঞ্চিৎকর। তাই বলি সংসার রেখেই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব কি না! তবে খুব যদি বলেন তো সামান্য কিছু ত্যাগের কথা ভেবে দেখতে পারি। তা যদি হয় তবে বলুন সেইটুকু ত্যাগ করতে চেষ্টা করবো। ভোগ আর ত্যাগ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ এধারণাই আমাদের হয় না। একটু দান টান করলাম, তীর্থে গেলাম দৈহিক কষ্ট করে বা মহোৎসব করলাম মাঝেমধ্যে অনেক লোক খাওয়ালাম, স্কুল হাঁসপাতাল করলাম। এ সবের মধ্যে তো—ত্যাগ অবশ্যই আছে, এতে কি হয় না।

ব্রাহ্মভক্তের মনের ভাব বুঝতে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন অসুবিধা

হলো না। তিনি বুঝলেন, এও কর ওয় কর এই রকম একটা পথ বাতলে দিলে ওদের সুবিধে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ জাতসাপ যখন ধরেছেন ছাড়বেন না। নিজেই বলছেন—হাসপাতালে নাম লেখালে অসুখ না সারা পর্যন্ত্য ডাক্তার সাহেব রোগীকে ছাড়েন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ডাক্তার সাহেব। তিনি ছাড়বার জন্য অবতার হয়ে আসেন নি—এসেছেন রোগ সারাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন (সহাস্যে) ঃ—"নাগো। তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বশে আছে। সারে মাতে। (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ আছ।"

কথা শুনে সকলের মুখে হাসি ফুটেছে—ভাব, শুনেও শান্তি হলো—তাই বলুন।

তা হলে আমাদেরও হবে। "রসে বশে আছো—কি কথা! তা না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ! সংসার রসে মগ্ন থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। এখন যদি কিছু ত্যাগ উপরিভাবে করতে হয়, তা করা মুস্কিল হবে না। ঈশ্বর চাইবো একেবারে কিছু ছাড়বো না, তাতো হয় না। এবারে আপনি বলুন বেশ লাগছে শুনতে 'সব' ছাড়ার যখন কথা নেই—সারে মাতে থাকার কথা যখন আপনি বলছেন তখন আর কা কথা। অন্যলোকে যাই বলুক না কেন, আপনার কথাই আমাদের ভাল লাগছে। এই তো আমাদের ভাব। "সারে মাতে" মানে কি? সংসারেও থাক, ঈশ্বরকেও ধরো। একটাতে মেতে যেও না—তোমরা সংসারে মেতে তো আছই। আমি সংসারে সব ছেড়ে ঈশ্বরে পুরোপুরি মাততে বলছি না। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে থাকো, ছেড়ে থেকো না ঈশ্বরকে।

নিজেই নিজের কথা বলছেন, আমাকে দেখে ভয় পেও না। আমার জীবন, আমার কর্ম, আমার ধর্ম "সব নজীরের জন্য" সকল ভাবের সকল স্তরের মানুষের জন্য। নকস খেলা জানো? আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। আমার ঈশ্বর বৈ কিছু ভাল লাগে না। তোমরা সেয়ানা। দুটোতে আছো—আমার ঐ একটা। তাই তোমরা আমার মত জ্বলে যাও নাই।"

ঠাকুর মন বুঝে কথা বললেন, লোককে টানতে হবে, নিজের পথে আনতে হবে। বাছুর কি জন্মেই দাঁড়াতে পারে, ছুটতে

পারে? উঠবে পড়বে পা শক্ত হবে, তবে দাঁড়াবে, দৌড়বে। শিশুকে মা তি তি করে হাঁটতে শেখান। শিশুর কত ভয়, পড়ে ব্যথা পাবে কিন্তু মা আছেন হাত বাড়িয়ে। মিষ্টি মুখে গুঁজে দিচ্ছেন। বলছেন, এসো, হেঁটে এসো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি, ভালবেসে ত্যাগের পথে তি তি করে হাঁটতে শেখাচ্ছেন দেখছেন খুব ব্যাথা যেন না পাই—তা হ'লে ভয়ে সরে যাব ওপথ থেকে। "তোমরা বেশ আছো।" নিজে বলে ভরসা দিচ্ছেন। বেশ না বলে মন্দ বললে—আরকি ওপথে এগোব। থাক্ আমার দরকার নেই—যারা পারবে তারা করুক। সরে পড়বো।

শুধুই কি ভরসা দিলেন—দিব্য গেলে বলছেন, ওগো—ভেব না আমি ছেলে ভোলাবার জন্য কথা বলছি, না, সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে। "মন নিয়ে কথা......মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে।......মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। একজনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন একই মানুষ।"

কেশবচন্দ্র সেন মস্ত মানুষ, ব্রাহ্মসমাজের নেতা, কত লোকে তাঁর কথা শুনে ধর্মজীবন গড়েছেন। দেশে বিদেশে কত খ্যাতি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলছেন, কেশব দেবী মানুষ। যোগ ভোগ দুই-ই আছে। তাঁকে বলছেন না, সবত্যাগ করে এসো। যতটা সইবে ততটা কর। আমার কথা ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে নিও। একদিন কেশবের বাড়ী গেছেন ব্রহ্মদের উপাসনা দেখবেন। কেশববাবু প্রার্থনা করছেন, ভগবান এই করো, আমরা যেন ভক্তি নদীতে ডুবে যাই। অমনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, "ও কেশব, ওসব কি বলছো—একেবারে ডুবে গেলে, চিকের আড়ালে যারা বসে আছেন তাদের কি হবে। বরং বলো, ভগবান আমরা যেন এক একবার ডুবি আবার আড়ায় উঠি। যা পারবে তাই বলো।" চিকের আড়ালে বসে আছেন কেশববাবু ও অন্যান্য উপস্থিত ভক্তবৃন্দের পরিবারের লোকেরা, বৌয়েরা, ঝিয়েরা। এইটি শ্রীরামকৃষ্ণের

বিধান। ত্যাগ অবশ্য দরকার কিন্তু জোর করে ত্যাগ করা যায় না। বাসনা-কামনা ত্যাগ করা হুট্ করে হয় না। দুঃখে কষ্টে জীবন যন্ত্রণায় যে বৈরাগ্য আসে, সেটি মর্কট বৈরাগ্য। তার চেয়ে বরং সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ধরে সংসার করা ভাল। কেল্লার থেকে যুদ্ধ করা যেমন। "ত্যাগ তোমাদের সব কেন করতে হবে। বাড়ী বরং সুবিধে, আহারের জন্য ভাবতে হবে না। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।" পূর্ণ বৈরাগ্য এলে অন্যকথা তখন ঝড় উঠার অবস্থা। ঈশ্বর বৈ আর কিছু চাই না।

সংসারীর মনে জোর দিচ্ছেন, ঈশ্বরেতে মন রেখে এগোও, ত্যাগ আসবে। অবধূত চব্বিশগুরুর মধ্যে চিলকে একগুরু করেছিলেন—চিল একটা মাছ মুখে করে ত্রিভুবন ছুটে বেড়াচেছ হাজার কাক তার পিছু ধাওয়া করেছে—চিল উপায় না দেখে মুখ থেকে মাছটা ফেলে দিল। সব কাক তাকে ছেড়ে মাছের পিছু গেল। চিলের শান্তি। ত্যাগ হয়ে গেছে—বাসনা ত্যাগ। এই ত্যাগ সংসারীর।

এই ত্যাগের কথাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে পাতায় পাতায় আছে। কেবলই কি চিল। পুরানে জনক, ব্যাস, বশিষ্টের কথা আছে। এরা সকলেই সংসারে ছিলেন। জনক তো রাজা ছিলেন তাকেই আবার ঋষি বলা হয় কেন? বাইরে যেমন রাজা ছিলেন, মনেও ত্যাগের রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে, "মিথিলায়াং প্রদীপ্তানাং ন মে দহ্যতি কিঞ্চণ"—রাজধানী মিথিলা নগর পুড়ে যাচেছ জনকের ওদিকে হুঁস নেই। যাক ওতে আমার কি? শাস্ত্র আলোচনা করছেন। জনক বিদেহী। দেহজ্ঞান নেই। এই তো ত্যাগ, সব মন ভগবানকে দিয়ে দেয়া সংসার থেকে তুলে। "আমিই নাই।" যে আমি সংসার করে তাকে ত্যাগ কর, এই কথা বার বার নানা জনে বলেছেন কথামৃত। কেশববাবু, প্রতাপ মজুমদার বলেছিলেন, আমাদেরও জনক রাজার মত। আমরা ঐটে পারবো তার বেশী নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বললেন, "ওগো, মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁট মুণ্ডু হয়ে আগে নির্জনে বসে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর,

তবে তো জনক রাজা হবে।” এসব কথায় মোটামুটি একটা স্বস্তির ভাব আছে। সব ত্যাগ করতে হবে না—সংসার থাকবে, এমনটা আমাদের চলতে পারে।—একজন ভক্ত সদরওয়ালা আনন্দ চাপতে পারলেন না—একগাল হেসে বলেই ফেললেন যাক্—“সংসার ত্যাগের যে প্রয়োজন নেই, বাড়ীতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, একথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হলো।” (১৮৮৪, অক্টোবর ১৯) ১ম খণ্ড।

কেবলই কি সদরওয়ালা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন—সংসার ত্যাগ প্রয়োজন নেই শুনে ভক্তেরা অনেকেই ভাবছিলেন, ঈশ্বরকে চাইনা বলা যায় না। কিন্তু তার জন্য সব ত্যাগ কেমন যেন ব্যাপারটা গোলমাল করে দেয়। ভক্তছাত্র ভাবছেন, তাহলে পড়াশোনার আর প্রয়োজন কি? যদি বিবাহ না করি চাকরীর প্রয়োজন হবে না। মা বাপকে কি ত্যাগ করতে হবে? আর যারা বিবাহ করেছেন সন্তান হয়েছে তারা ভাবছেন, পরিবার কি প্রতিপালন করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে আমরা কি করবো? ইচ্ছা তো করে নিশিদিন হরি প্রেমে মেতে থাকি। অন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে, তাঁকে দেখে ইচ্ছে হয়, ভক্তি নদীতে ডুবে থাকি।

তিনিই বলছেন, নিজেরাই তো দেখছ, সংসার অনিত্য। কত এলো গেল রইলো কি কিছু? কি ভোগ করবে? সংসারের অনিত্যতা জেনে, ঈশ্বরের শরণাগত হও। সংসারে থাকবে ঈশ্বরকেও পাবে। ঈশ্বরের জন্য যা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর পেলে সব পাবে। ত্যাগের মহিমা কত ভাবেই না বোঝালেন। ত্যাগকে ছোট করা তো দূরের কথা বরং বলছেন কেমন হ'লে ত্যাগের পথে চলা যায়। সীমিত ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগকে জীবনে আনা যায় সে পথই পাঁচখণ্ড কথামৃতে আছে। “যার পেটে যেমন সয়।” যে যেমন অধিকারী তাকে তেমন বলছেন তা না হলে বুঝবে কেন? বেগুনওয়ালাকি হীরের মূল্য জানে? জহুরী-ই একমাত্র জহর চিনে, মূল্য দিতে পারে।

'মাষ্টারমশায় কত অনুনয় করছেন আমাকে সন্ন্যাস দিন-শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তোমার গার্হস্থ্য সন্ন্যাস। ভাগবতের পণ্ডিত তো চাই, তা না হ'লে কে ভাগবত শোনাবে। তোমার ত্যাগ মনে,

তুমি গুপ্তযোগী গিরিশচন্দ্র সন্ন্যাসের জন্য মাথা খুঁড়লেন—না, তোমার ওপথ নয়। তুমি ভক্ত তোমার পাঁচ আনা পাঁচশিকে বিশ্বাস। সবই পূর্ণ ত্যাগের উঠবার সিঁড়ি। যার যা সয়, মা তাকে তাই দেন।

আবার যখন বালক ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্তানদের সাথে কথা বলছেন দেখছেন কোন গৃহী ধারে কাছে আছে কি না? জ্বলন্ত ত্যাগের কথা, বৈরাগ্যের কথা। সম্পূর্ণ ত্যাগ না হলে কিছুতেই কিছু না। একমাত্র ত্যাগ। নরেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য,—বলছেন আমার কি হলো? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তুই কি চাস—বাড়ীর একটা ব্যবস্থা করে আয় সব হবে। হোমাপাখীর দল—গায়ে একটুও পৃথিবীর মাটি, মলিনতা লাগে না যেন। ভীত। এক দৃষ্টি মা। এই ত্যাগ সকলের না এই ত্যাগে সকলেরই ভয় - দুই একজন মাত্র এতে পরমানন্দ দেখেন। অমৃতত্ব খুঁজে পান। মাষ্টারমশায় নিজেই শেষ জীবনে বলতেন ঠাকুরের জীবনের জ্বলন্ত কথা হচ্ছে ত্যাগ। এটি দেখতে যদি চাও—মঠে গিয়ে বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ছেলেদের দেখ। নৈকষ্য-কুলীন। গায়ে একটুও দাগ নেই। শ্রীশ্রীমা বলেছেন—"এবার ত্যাগই তাঁর বৈশিষ্ট্য।" কথামৃতে সেটি আছে প্রচ্ছন্ন ভাবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কিছু রেখে কিছু ঢেকে বলেন নি। বলেছেন অধিকারী ভেদে। আমাদের মনে হয় তিনি হয়ত এও হয়, ওয়ো হয় বলে গোজামিল দিয়েছেন। তা ঠিক না। তিনি তো স্পষ্ট করেই বলছেন, একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না।' মনে রাখতে হবে তিনি কিন্তু ঈশ্বর পথের পথিকদের কথাই বলছেন। যে ঈশ্বরকে চায় না, তার এখনও সময় হয়নি তার আলাদা কথা, তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তুমি বিল্ডিংটিল্ডিং দেখ গিয়ে, আমরা একটু কথা বলি।

সাধারণ মানুষ কি এক দিনেই বড় ত্যাগের জন্য মন থেকে একেবারে আসক্তি মুছে দিতে পারে। তার জন্য চাই বিরাট প্রস্তুতি। অভ্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইটি জনে জনে বারে বারে, কথামৃতের কথায় কথায় শিখিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। চাই বিবেক, চাই বৈরাগ্য। সৎ অসৎ বিচারের নাম বিবেক বৈরাগ্য

অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এইটি হুট্ করে হয় না। রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনী কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়।—তারপর মনের ত্যাগ ও বাহিরের দুইই চাই।

এই বলেই দুঃখ ক'রে বলছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—"আমি সাধে কি ত্যাগের কথা ভোগের সঙ্গে মিশিয়ে ঔষুধ গেলার মত করে দি কারণ "কলকাতার লোকেদের বলবার যো নেই, ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর—বলতে হয় মনে ত্যাগ কর।"

(১লা জানুয়ারী)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে সংসার ও সংসারীর কর্ত্তব্য— বা কর্ম্মযোগ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত মূলত সংসারীর জন্যই বলা কথামৃত-কার নিজেও একজন সংসারী, গৃহী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে যেমন আধার সে তেমন বুঝতে পারে। মাষ্টার-মশায় তাঁর মত করেই বুঝেছিলেন এবং যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ-ভাবে লিপিবন্ধ করে রেখেছিলেন নিজের দিনলিপিতে। সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীতে যেমন যেমন পরিবেশের মধ্য দিয়ে আসে তেমন রং ধারণ করে। আমরা নানা রং দেখি, রামধনু দেখি, সবটাই সূর্যের রশ্মি। অবস্থা ও পাত্র ভেদে বিচিত্র দেখায়, তেমনি ঈশ্বরের কথা যে যেমন আধার তেমনি বোঝে। কেবল শ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃতই যদি পড়ি, স্পষ্ট ধারণা হবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে অনাদি সংসারী ছিলেন এবং সংসার ধর্মের কথাই বর্ণাঢ্যভাবে বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসার বলতে প্রথমে যে কথা বলেছেন, তা হচ্ছে, স্ত্রী পুত্র, পিতা মাতা নিয়ে একত্রে বাস করা এবং আনুসঙ্গিক দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য আছে তা পালন করা। মাষ্টারমশায় শ্রীরাম-কৃষ্ণকে দর্শনের দ্বিতীয় দিনেই শুনলেন—ঠাকুর, প্রতাপ মজুমদারের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কারণ তিনি বিবাহ করেছেন, ছেলে পুলে হয়েছে কিন্তু তাদের প্রতিপালন না করে,

সাধু হওয়ার অজুহাতে শ্বশুর বাড়ীতে তাদের রেখে দক্ষিনেশ্বরে এসে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তীব্র তিরস্কারের সুরে বললেন, 'লজ্জা করে না যে, মাগ-ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুর বাড়ীতে ফেলে রেখেছে। অনেক বকলুম, আর কর্ম খুঁজে নিতে বললুম। তবে যায়।''

একথা সেইদিনই মাষ্টারকে শোনাবার দরকার ছিল না কিন্তু বললেন কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি কথার ইঙ্গিত অর্থবহ। মাষ্টারের চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিলেন, যে আশ্রম গ্রহণ করেছ, যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছ তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। এটি গৃহস্থ্যের কর্ত্তব্য, সংসারীর দায়িত্ব। এটি বাদ দিয়ে সুবিধামত আর একটি বেছে নিলে ধর্ম রক্ষা হয় না। তার দুকূল নষ্ট হয়।

মাষ্টারমশায়ও তাই করেছিলেন। দায়িত্বে অবহেলা করে জীবন যন্ত্রণায়, সংসার জ্বালায় তিতি বিরক্ত হয়ে গৃহস্থের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন, জীবনের উপর চরম প্রতিশোধ নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে নিরস্ত করলেন সংসারীর প্রথম কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যে সংসারের কর্ত্তব্য বা দায়িত্বের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সে সংসারের সংজ্ঞা সং আর সার নয়।

মানুষ জীবনকে দুটি আশ্রমে ভাগ করা হয়েছে। একটি সংসার আশ্রম অপরটি সন্ন্যাস আশ্রম। আবার সংসার আশ্রমকেই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। একটি আর একটি-র পরিপূরক। একজন সন্ন্যাসীকে প্রথম তিনটি আশ্রমের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। মানুষ জীবনের পূর্ণতা লাভের চরম আশ্রম সন্ন্যাস। যখন মানুষের ভোগ বাসনা সম্যকরূপে কেটে যায় তখন সংসারী সংসার ত্যাগের অধিকারী হন। মানুষ কর্ম সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কর্মের নাশ হলে আবার সে তার মূল কারণে ফিরে যায়। এইটি জগত লীলা। মানুষকে কর্মের বন্ধন কাটাবার জন্য কতগুলি কর্ম অবশ্য করতে হয়। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস প্রত্যেক অবস্থারই কতগুলি কর্ত্তব্য

আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবমানব হয়ে এসেছিলেন পৃথিবীতে মানুষকে দেবমানব করতে, তাই তিনি যে আশ্রমের যেটি অবশ্য কর্ত্তব্য তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেই মানুষকে জীবনে শ্রেষ্ঠ লাভের পথ দেখিয়েছেন। এই পথ দেখাবার প্রথম কথা তিনি সোনার অক্ষরে সকলের মনে লিখে দিতেন তাঁর দেব-দুর্লভ ভাষায়, "মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।" এর থেকে একটুও কম কিছু না। তারপর যে, যে আশ্রমে আছেন তাকে তিনি সেই আশ্রমের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করতে উপদেশ দিয়েছেন। আরও বলেছেন, লাফিয়ে, ডিঙিয়ে কেউ শেষ ধাপে উঠতে পারে না। যেমন ছাদে উঠতে গেলে একটি একটি করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে যেতে হবে। গৃহস্থ্যকে তার কর্ত্তব্য অবশ্যই করতে হবে কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে যে তার কর্ত্তব্য কেবল গৃহস্থ্য হয়ে থাকা নয়, কর্ত্তব্য কর্ম করে আরও এগিয়ে যেতে হবে. তাকে তার চরম উদ্দেশ্যে। ঈশ্বর লাভ করতে হবে। এটি গৃহস্থ্যকেও করতে হবে সন্ন্যাসী-কেও করতে হবে।

শ্রীম একটি অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা করছেন ঃ—ইঃ ১৮৮৪; অক্টোবর ১৯। সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজে পুনর্বার এসেছেন, শ্রীযুক্ত বেনীপালের বাগানে। শরতের মহোৎসব। বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত, তাছাড়া অনেক বিশিষ্ট ভক্ত, সদরওয়ালা, আরও গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবেন তাঁর অমৃত কথা শুনবেন। যেমন একদিন জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভক্তাবতার ঈশার মুখ থেকে তাঁর বারো জন নিরক্ষর মৎস্যজীবীগণ শুনেছিলেন, যে ধ্বনি পূর্ণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা রূপে পাঁচ হাজার বৎসর আগে বেরিয়েছিল আর বিনয় নম্র ব্যাকুল 'গুড়াকেশ' কৌন্তেয় পান করেছিলেন।

মানুষ একই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে কতবার শুনেছেন কিন্তু আশ মেটে না। আর একই প্রশ্ন বারবার করেছেন—জনে জনে, তিনিও অক্লান্ত ভাবে বার বার উত্তর দিয়েছেন, পাথরের দেওয়ালে পেরেক বসবার জন্য। মন তো আমাদের পাথরের দেওয়ালের মতই অভেদ্য। প্রশ্ন করছেন জয় গোপাল সেনের ভাই ;

এক ॥ আমরা সংসারী লোক আমাদের কিছু বলুন।

দুই ॥ মহাশয়, সংসার কি মিথ্যা ?

তিন ॥ সদরওয়ালার প্রশ্ন—মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ করতে হবে ?

চার ॥ আমরা গৃহস্থ্য, কতদিন এসব কর্ত্তব্য করতে হবে ?

পাঁচ ॥ সন্তান প্রতিপালন কত দিন ?

ছয় ॥ স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য কতদিন ?

সাত ॥ সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান লাভ হয় ? ঈশ্বর লাভ হয় ?

আট ॥ বিষয় রস শুকোবার এখন উপায় কি ?

নয় ॥ কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচখণ্ডে এই প্রশ্নগুলিই বার বার করা হয়েছে। মাষ্টারমশায় দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দর্শনের মধ্যেই মুখ্যত এই প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের খোলা-খুলি উত্তরে মাস্টার মশায়ের সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি আর একটি বারও কোন প্রশ্ন তোলেন নি। কেবল সংগ্রহ করেছেন শ্রীমুখ থেকে ঝরা মনিরত্ন কোঁচড় ভরে তাই তো আমরা পেয়েছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

আমরা এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের সংসার কি ও উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর কেমন ভাবে দিয়েছেন তাই লক্ষ্য করবো ও আমাদের নিজের নিজের সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করবো।

প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, কি জান, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার করতে হবে, সংস্কার প্রারব্ধ, এসব মানতে হয়। তুমি সংসারী হয়ে জন্মেছ, তোমার নিজের কর্মের ফলে। এখন যদি ভাল কর্ম কর, সামনে ভাল জন্ম হবে। কর্ম চাই, কর্ম শেষ হলে জীবন মুক্ত হয়। সংসারীর কতগুলি কর্ম আছে তবে মনে রাখতে হবে কর্মই উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা। কর্ম না ফুরালে জন্মমৃত্যুর চাকার মধ্যে আসতেই হবে। যেমন কুমোরেরা হাঁড়ি রোদে শুকোতে দেয়, যদি গরু মাড়িয়ে দেয়, শুকনো গুলি ফেলে দেয়, কিন্তু কাঁচাগুলি আবার চাকে দেয়। শুকনো দিয়ে কিছু হয় না। তেমনি কর্মরস যার শুকিয়ে গেছে তাকে আর সংসারে আসতে হয় না।" তাই বলছিলাম, ঈশ্বরকে

না জানা পর্যন্ত্য কর্ম আছেই। ততক্ষণ সংসার মিথ্যা নয়। তুমি যেমন সত্য, সংসার তেমন সত্য। সংসারের পাঁচটা কাজও সত্য। তাঁকে জেনে সংসার করলে সংসার অনিত্য নয়। তাঁকে ভুলেই তো মানুষ "আমার আমার করে।" বিষয় আসয়ে কাম কাঞ্চনে আসক্ত হয়। এইটি মায়া। এই 'আমি' আর 'আমার।' যেখানে 'আমি' নেই, 'আমার' নেই, সেখানে মায়া নেই সংসার নেই। কিন্তু তুমি আছ যেন পাঁচ বছরের ছেলে; সব আছে সব করছে কিন্তু কোন কিছুতেই আঁট নেই। এত শুনছো, এত দেখছ কিন্তু হ'লে কি হবে—যতক্ষণ শুনা, ততক্ষণ স্থায়ী—তারপর যে কে সেই।"

ইচ্ছা থাকলে পালাতে পারে না—গানে আছে, "বিল ক'রে ঘুণী পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে, গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে। গুটি পোকায় গুটি করে, পালালেও পালাতে পারে। মহামায়ায় বদ্ধগুটি, আপনার নালে আপনি মরে।"

আবার বলছেন, "তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো, সংসার অনিত্য। এই দেখ না কেন? কত লোক এলো গেল। কত জন্মালো, কত দেহ ত্যাগ করলো। সংসার এই আছে, এই নেই। অনিত্য। যাদের আমার আমার করছো, চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই। তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হল না। আমার হারুর কি হবে? গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে এই-রূপ সংসার মিথ্যা। আর তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়। যখন নিশ্চয় করতে পারবে এই সংসার দু-দিনের জন্য, স্ত্রী-পুত্র, পরিজন বিষয় সব ঈশ্বরের, আমি কেবলমাত্র তাঁর দাসানুদাস, তিনিই এই সংসারের কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা তখন সংসার অসার বলে বোধ হবে না। রামপ্রসাদের গানে আছে, "কালী নামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরুপ হবে না'। ঈশ্বরে শরণাগত হও সব পাবে। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ সব পাবে। এইরূপ সংসার বিদ্যার সংসার।"

"তাঁকে জেনে—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কাজ করো। তাঁকে জানলে দেখবে জীবজগৎ তিনি-ই হয়েছেন। ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে যেন গোপালকে

খাওয়াচ্ছো। পিতা-মাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দু-জনই ভক্ত কেবল ঈশ্বর প্রসঙ্গ। ঈশ্বরের কথা নিয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। এইরূপ স্ত্রী বিদ্যাশক্তি।"

"হয়তো ভাববে এমন লোকতো দেখি না, যা দেখি তা তো এর-ই ঠিক উলটো। আছে, তবে কম। এমনটি হ'তে গেলে স্বামী-স্ত্রী দু-জনেরই সাধনা চাই। ভাল হতে হবে। তা-না হলে সর্বদাই অমিল। যদি না মিল হয় তা হ'লে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, বাবা কেন এখানে বিয়ে দিলে। না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম, না পরতে পারলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না! তুমি আমায় কি সুখে রেখেছ। চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন। ওসব পাগলামি ছাড়ো।" আবার হয়তো ছেলে অবাধ্য। তারপর কত আপদ বিপদ, রোগ, শোক আছে, অনেক ছেলে মেয়ে, বিয়ে দিতে পারছে না, ছেলে মূর্খ বা বেকার। এইরূপ স্ত্রী অবিদ্যাশক্তি, এই সংসার অবিদ্যা-সংসার।

ভক্ত প্রশ্ন করছেন সময় কই! সারাদিন পেটের জন্য কর্ম করতে হয়, আরও কত সমস্যা রয়েছে। এত প্রতিবন্ধক তবে মশায় উপায় কি?

উপায় অবশ্যই আছে তা না হলে তিনি এলেন কেন? এতো কথাই বা বললেন কেন? অবতার আসেন সেই পথটিই পরিস্কার করে দেখাতে, মানুষকে ঐ পথে তুলে দিতে। ভগবান মানুষ হয়েছেন, মানুষের সকল দুর্বলতা নিজে স্বীকার করেছেন আবার নিজেই রক্তক্ষয়ী সাধনা করে দেখিয়েছেন উপায়। এইতো মানুষ লীলা।

শ্রীমুখে বলছেন সংসারে সাধন করা কঠিন, অনেক ব্যাঘাত তা তোমাদের বলতে হবে না। তবে কি জানো, কঠিনের মধ্য দিয়ে না গেলে বড় আনন্দ হবে কি করে! উপায়, দাসীর মত সংসারে থাকা। নিজের সব ছেলেপুলে গ্রামে, সহরে, বাবুর বাড়ী কাজ করছে, বাবুর ছেলে মানুষ করছে—মুখে বলছে আমাদের বাড়ী, আমার ছেলে, হরি; কিন্তু মনে বেশ জানি এরা আমার কেউ নয়।

দাসী পারে, তুমিও পারবে। অভ্যেস করতে হবে! একদিনেই কি হয়। বড় মাছ ধরবে, ভাল চার করতে হবে, ছিপ নিয়ে পুকুরে অনেকক্ষণ বসতে হবে, কত আয়োজন করতে হয়! হাত ঘুরিয়ে দিলেই কি বাড়ীর চারদিকে প্রাচীর হয়।

জানো তো, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল খুললে আঠা লাগে না। তেমনি ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস তেল হাতে মেখে সংসার কর দেখবে কঠিন-টাই সহজ হবে।

আবার প্রশ্ন—বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে? সংসার কি ত্যাগ করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—ভয় পেলে! না তোমাদের কেন ত্যাগ করতে হবে? সংসারে থেকেই হতে পারে।

সংসার তো কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র। কত রকম সমস্যা, লড়াই লেগেই আছে। বাইরের দ্বন্দ্ব, ভেতরের দ্বন্দ্ব। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ আছে, তাছাড়া অন্ন চিন্তা, ভাল থাকার চিন্তা। যুদ্ধ যেমন কেল্লার থেকে করা সুবিধা তেমনি জীবনে বেঁচে থাকার যুদ্ধ সংসারে থেকেই ভাল। সংসার একটি কেল্লা। সংসার থেকে বেরিয়ে গেলে যদি তীব্র বৈরাগ্য না আসে তাহলে বড়ই কষ্ট। পেটের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে:—দশ জায়গায় যেতে হবে, ঈশ্বর চিন্তা উবে যাবে। কষ্টের সীমা থাকবে না। সংসারে থেকে ঈশ্বর চিন্তা করলে শরীরের জন্য যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করার লোক থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, বৈরাগ্য যদি তীব্র না হয়, যদি সংসারের দুঃখ কষ্টে সাময়িক বৈরাগ্য দেখা দেয় ও তার তাড়নায় কেউ সংসার থেকে বেরিয়ে যায়, সে আদর্শ রাখতে পারে না, বৈরাগ্য মনোভাব শুকিয়ে গেলেই তখন বিপদে পড়ে যায়। বাড়ী ফিরে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনটাই না। এই ভাবকে মর্কট বৈরাগ্য বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যতদিন না সত্যিকারের বৈরাগ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা—সংসার ভালবাসা থেকে বেশী না হয় ততদিন পাকা বৈরাগ্যের জন্য সংসারে থেকেই প্রস্তুতিকাল কাটান উচিৎ। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মন প্রস্তুত হলে আপনা

থেকেই বৈরাগ্যের উদয় হবে তখন সংসার পাতকুয়া মনে হবে। অত্মীয়স্বজন কাল সাপ মনে হবে। সে মন আর সংসার করতে পারে না। মনের প্রস্তুতি পর্ব সংসারের মধ্য থেকেই হলে ভাল। মনে সংসার রয়েছে কিন্তু নানা দুঃখ কষ্টে অভাব অভিযোগে মন বিষিয়ে গেছে—মনে হচ্ছে আর কেন—এবার সন্ন্যাসী হই। হতে বাধা নেই কিন্তু একে সন্ন্যাসী হওয়া বলে না। ঘর পালান বলে—এ লোকের কোন কূল নেই। না সংসার না সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী মনের এক অবস্থা। জীবনের একটি উচ্চতর আশ্রম। সংসারের মধ্যে যার শুরু। বৈরাগ্য কখন সত্য হয়—তখন ঈশ্বরে আসে ভালবাসা আর সংসার জীবনে বিরাগ। ঘায়ের মামড়ী যেমন কাঁচা অবস্থায় টেনে ছিঁড়লে ঘা হয় রক্ত পড়ে তেমনি মনের কাঁচা অবস্থায় সন্ন্যাস নিলে, মনে ঘা বেড়ে যায়। অনেক কষ্ট হয়, জীবনের আদর্শ লাভ সুদূর পরাহত হয়। মনের প্রস্তুতির জন্য চাই দিন কতক নির্জনে থেকে ঈশ্বরের চিন্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, আমি এই কথা শ্রীযুক্ত কেশব সেনকে বলেছিলাম, প্রতাপ মজুমদারকে বলেছিলাম। এরা কেউ কেউ মস্ত মাপের লোক। দেশ জোড়া খ্যাতি, ধর্মীয় নেতা বিদ্বান, বিরাট বক্তা। তারা বলেছিলেন, আমদের জনক রাজার মত। সেটি কি ? জনক রাজা "এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়ে ছিল দুধের বাটি।" যোগ ভোগ দুই ছিল। রাজাও ঋষি ছিলেন। সংসার নির্লিপ্ত ছিলেন। কিংবদন্তি আছে, মিথিলা পুড়ে যাচ্ছে আগুনে, তিনি শাস্ত্র আলোচনা করছেন, অন্যান্যরা ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন—জনকের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং নাম দহতি কিঞ্চণ।" বিদেহী। দেহ জ্ঞান নেই। এই তো রাজা জনক। মুখে বললেই কি জনক রাজা হওয়া যায়। যায়, সে অন্য জনক। ছেলে মেয়ের জনক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন কেশবকে, জনক রাজা হেঁট মুণ্ডু হয়ে আগে নির্জনে বসে কত তপস্যা করেছিলেন, তোমরা কিছু করো, তবে তো জনক রাজা হবে ! অমুক তরতর করে ইংরাজি লিখতে বলতে পারে, তা-কি একেবারেই লিখতে না বলতে পেরে ছিল ? অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিল, কত চেষ্টা, অভ্যাস করতে

হয়েছে, তবে হয়েছে।

এই বলেই শেষ করলেন না, মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য আর একটু রসিয়ে বললেন। রসরাজ কিনা, জানেন রস না দিলে মনে ধরবে না, কাজ হবে না। বৈকুণ্ঠ সান্ন্যালকে বলেছিলেন, "পচা মাছ প্যাঁয়াজ রসুন দিয়ে রেঁধেছি তোদের জন্য। মুখরোচক করে, তবু তোরা যাতে খাস।" বলছেন কেশবকে তোমাদের রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যেঘরে বিকারী রোগী সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার, তেঁতুল—বলতে গেলেই মুখে জল আসে। সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই তো জানেন। মেয়ে মানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। ভোগ বাসনা জলের জালা বিষয় তৃষ্ণার শেষ নেই আর এই বিষয় রোগীর ঘরে। এতে কি বিকার রোগ সারে? কি করতে হবে তাহলে? বলছি শোন, "দিন কতক ঠাঁই নাড়া হয়ে থাকতে হবে, যেখানে আচার তেঁতুল নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে ভয় নেই। ঈশ্বরে ভালবাসা লাভ করে সংসারে এসে থাকলে কামিনী কাঞ্চনে কিছু করতে পারে না। তখন জনক রাজা হওয়া যায়। কিন্তু মনে রেখো প্রথম অবস্থায় সাবধান হতে হবে। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখন চারদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গোরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায় যদি সংসার রূপ জলে ফেলে রাখ, দুধে জলে মিশিয়ে যাবে। তখন মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে পারবে না। যখন নির্জনে থাকবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে। তখন যেন কেউ আপনজন সঙ্গে না থাকে।"

তাতো হলো কিন্তু নির্জনে কতদিন থাকতে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন মনের কথা বলেছো—এক সঙ্গে বেশী দিন পারবে কেন? আস্তে আস্তে যেমন সয়। তা এক মাস হ'তে পারে, ১০ দিন হতে পারে, না হয় এক সপ্তাহ; যদি তাও না পারো, তিনদিন বা একদিন তাও ভাল কিন্তু শুরু কর। কেবল শুনলে কি হবে!

আবার প্রশ্ন করলেন একজন—সময় কৈ, কত কাজ করতে হয়। "সময় আছে, সময় নিজে করে নিতে হয়। ঈশ্বর জানেন কে কোথায় আছে, কার কি কাজ। ফাঁকি দেওয়া তাঁকে চলবে না। সত্যি-ই যদি সময়ই নেই তাকে কেঁদে কেঁদে বলো আমি তোমাকে ডাকতে চাই সময় করে দাও। তাঁর উপর আন্তরিক ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো, ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে কি তার মন্দ করে? তবে মন মুখ এক করে বলতে হবে। বিড়াল ছানার মত, কেবল মিঁউ মিঁউ করে ডাকে মা এসে মুখে করে নিয়ে গিয়ে কখনো গৃহস্থের বিছানায় রাখে কখনো হেঁসেলে রাখে। তার পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই। ঝড়ের এঁটো পাত হয়ে থাকো। ঝড়ে এঁটো পাতাকে কখন ঘরের ভিতর লয়ে যায় কখনো আস্তা কুঁড়ে। হাওয়া যেদিকে যায় পাতা-ও সেদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায় কখনও মন্দ জায়গায়। তোমাদের এখন সংসারে রেখেছেন ভাল, এখন এই স্থানে-ই থাক—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জাগায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে। সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাকে সমর্পণ কর—তখন দেখবে তিনি-ই সব করছেন। গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন—"সর্বধর্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাম সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা সুচ।" দেখলে সব দায়িত্ব তাঁর। সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই তাঁর ইচ্ছা। তা-না হলে আর কি-ই বা করবে? শোন, একজন কেরানী জেলে গিছিল! জেল খাটা শেষ হলে সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই করে নাচবে না কেরানী গিরি-ই করবে? যার যা কাজ করতেই হবে যতদিন কর্ম সংস্কার আছে। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারের সকল কাজ কর।

আর একটা প্রশ্ন করবো। করো-ই না যার যা মনে সন্দেহ আছে, আমি নিরসন করছি—উত্তর দিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপণতা নেই! নেই আলস্য, বারে বারে একই কথার জবাব করতে। "শাস্ত্রে সু জামিতা ন অস্তি।" বার বার বলতে শাস্ত্রের আলস্য নেই।

প্রশ্ন ।। আমরা গৃহস্থ, কতদিন সব কর্ত্তব্য করতে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ, মানুষের দেবতা। মানুষের কোথায় কোন কাঁটা

বিঁধছে খুব ভাল জানেন, বলছেন—তোমাদের কর্ত্তব্য আছে বই কি? মেনে নিচেছন, কাছে টেনে নিচেছন মানুষকে। ভাল না বাসলে কি শাসন করা যায়। এটি শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য। ভালবেসে আপন করে তারপর অন্য কথা। স্বামী বিবেকানন্দ তাইতো বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আর কি—ঐ ইংরাজীর চারটি অক্ষর 'Love'—ভালবাসা। কি ভালবাসা? ভাল তো সবাই বাসে কিন্তু সবাই কি সকলকে আপন করতে পারে? দেখি না তো? তবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার—বৈশিষ্ট্য কি? তিনি মানুষের দুর্বলতাকে ভালবাসতেন—আমরা বাসি সবলতা অর্থাৎ কেইল-ই গুণ। তা তো সবাই বাসে। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে দেবতা করতে এসেছেন। "ভাল যারা আছে—তাদের ভাল করার বাহাদুরী কি?" মার সাথে কথা বলছেন—"যারা মরে আছে তাদের মেরে কি হবে?" তাদের বাঁচাতে হবে। তাঁর সবল হাতখানা দুর্বলের দিকে, অযোগ্যের দিকে, পতিতের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন—ধরো আমাকে, উঠে দাঁড়াও। সব ঈশ্বর। এক ঝোড়ো মাটি সোনার উপর পড়ে আছে। ঝোড়া ফেললে-ই সোনা। কেউ পতিত নয়, অযোগ্য নয়, সব আমার। হুঁস-টা কেবল ধুলো বালি মেখে মেখে, বাজে কাজে হারিয়ে ফেলেছ। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমাদের "চৈতন্য হোক।"

সংসারের ধুলো কাদা গায়ে লাগবে-ই, ধুয়ে নিলে-ই হবে। কাজলের ঘরে থাকলে কালো দাগ লাগবে না? লাগবে, ধুয়ে ফেলবে।

সংসারের পাঁচটা কর্ত্তব্য অবশ্য-ই করবো ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করা। অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণ পোষণের জোগাড় করে রাখা। এ সব-ই করতে হবে। যদি না কর তুমি প্রকৃত গৃহস্থ্যের ধর্ম পালন করলে না। তারপর সংসারে নির্দয় হলে চলবে না। দয়া যার নেই সে মানুষ-ই না। তবে একটি কথা সকল কাজের মধ্যে ঘড়ির টিক্ টিক্ টিকের মত যেন মনে প্রাণে ঠিক থাকে—আমি অকর্ত্তা ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা। নিজেকে অকর্ত্তা জেনে কর্ত্তার মত কাজ করবো আর কি! কর্ম আদি কাণ্ড, উদ্দেশ্য নয় জীবনের—তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে—চৌদ্দ আনা

মন ঈশ্বরে দিয়ে দু আনা দিয়ে সংসার কর। ভাবছো তা কেমন করে হবে? হয়। জনক, ব্যাস, বশিষ্ট ঈশ্বর লাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দু-খানা তরবার ঘোরাতেন। একখানা জ্ঞানের, এক খানা কর্মের। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিষ্যদের অনেকে গৃহী ছিলেন।

সারাজীবন কেবল রোজগার করতে আর সন্তান প্রতিপালন করতে কেটে গেল—কর্তব্যের আর শেষ হয় না। তা করলে চলবে না।

প্রশ্ন॥ সন্তান প্রতিপালন কত দিন?

উত্তর॥ সাবালক হওয়া পর্যন্ত। পাখী দেখনি, বড় হলে যখন সে আপনার ভার নিতে পরে, তখন ধাড়ী ঠোক্‌রায়, কাছে আসতে দেয় না। জীব জানোয়ারের এই রীতি তোমরাও তাই করবে। তা না করে, ঐ যে মনের মধ্যে চিরদিনের জন্য সংসার পুষে রাখা—ছেলে বড় হবে, রোজগার করবে, আমাকে খাওয়াবে। কত আশা কত সুখের কল্পনা জা'নতো। যত সুখ কল্পনায়, যত দুঃখ আশঙ্কায়। ছেলে গেল তো নাতি নিয়ে আর একবার সংসার। এতো মনের লালসা, বাসনা। বাসনায় আগুন দিতে হয়। বাসনার শেষ নেই। ভোগে মেটে না। "ন জাতুকাম কামনা উপভোগে ন শাম্যতি।"

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যও আছে—বেঁচে যতদিন থাকবে কেবল যে অন্ন বস্ত্র, ভোগ বিলাসের বস্তু জোগাবে তা নয়, ধর্ম উপদেশ দেবে, আদর্শ গৃহী হবে। স্ত্রী কেবল শয্যাশায়িনী নয়, সহধর্মীনী। তার ভবিষ্যতের মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

শাস্ত্র বলেছেন—সীমিত ভোগ। 'তেন তক্তেন ভুঞ্জী থা'। ত্যাগ হবে আদর্শ। উদ্দেশ্য। তা সীমিত ভোগের মধ্য দিয়েই আসবে। ভোগে ডুবে যাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তোমরা সংসারী তোমরা এও রাখো, ওয়ো রাখ। সংসারও রাখ ধর্মও রাখ একথা আমি মহিমাচরণ, ভক্ত সাধক তাকে বলেছিলাম, তাতে মহিমাচরণ বল্লে—'এ-ও' কি আর থাকে?

আমি বল্লুম, প্রথম প্রথম থাকে, তারপর মন থেকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। ঝিনি

সংসারে বদ্ধ তিনিই মুক্ত হতে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলে-ই বদ্ধ—নিক্তির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন? যখন নিক্তির কাটাতে কামিনী কাঞ্চনের ভাব পড়ে। ঈশ্বর ধরে সব কাজ কর, সংসার কর, সব কাজ উপাসনা হবে। ঈশ্বর ছেড়ে যে কাজই করবে বন্ধন আসবে। গীতায় ভগবান অর্জুনকে কর্মে কৌশল শিখিয়ে দিলেন—'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর; যুদ্ধ চ'। আমাকে ধরে, শক্ত করে ধরে যুদ্ধ কর। যা ইচ্ছা কর। ভয় নেই। 'অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং যোগেশ্বর প্রভুরেব চ।' আমি বাসুদেব, "সর্বমিতি" একটু চুপ করে থেকে আবার বলছেন—ত্যাগের কথা শুনে ভয় পেলে তোমরা। না না ত্যাগ যা করতে হবে, মনে। কেবল সংসারের প্রতি আসক্তি কমিয়ে আনো। পশ্চিমদিকে যত পা এগোবে, পূর্বদিকে তত পা পিছনে পড়বে। সংসারের প্রতি আসক্তি যত কমবে তত ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে অনেক ভক্ত ভাবছেন. ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ করতে বললেন না বরং বলছেন সংসার কেল্লা, এই কেল্লা থেকে কাম-ক্রোধ ইত্যাদির সাথে যুদ্ধ করতে পারা যায়! আবার বলছেন সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আদর্শ কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেশবকে বললেন, তুমি দৈবী মানুষ তোমারই ল্যাজ খসেছে—আর কারুর হয় নাই। ইচ্ছা করলে জলে থাকতে পারো, ডাঙ্গায়ও থাকতে পারো। দেবেন্দ্র ঠাকুরকে বললেন, তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি। কিন্তু একটা কথা বলতে ভোলেননি, মনে রেখো মাঝে মাঝে নির্জনে থাকতে হবে। ঈশ্বরকে কর্তা মানতে হবে। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করে সংসারে এসে থাকলে কিছু ভয় নেই। বলছেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে না—তোমাদের মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হয়ে কর।

এই প্রসঙ্গে নিজের কথা একটু বললেন। আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা। পুরানে আছে রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করার পর বললেন, আমি সংসার ত্যাগ করবো। দশরথ তাঁকে বোঝাবার জন্য বশিষ্ঠ দেবকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, রামের তীব্র

বৈরাগ্য। তখন বললেন, রাম, আগে আমার সাথে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ করো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয় তুমি ত্যাগ কর। রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্ত্বাতে সমস্ত সত্য বলে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

অবশ্যি এই ভাবটি নেওয়া কঠিন। রামচন্দ্রের জ্ঞানের উদয় হয়েছে। জ্ঞান মানে ঈশ্বরকে জানা। তিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, তিনি ঈশ্বরকে সর্বভূতে দেখছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন, —জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব ঈশ্বর। তিনিই হয়েছেন, তখন কি ত্যাগ করবেন? এইতো অদ্বৈত জ্ঞান। যার দুই নেই তাঁকে ত্যাগ করার প্রশ্ন কোথায়? রামের সংসার ত্যাগ করা না করা এক রকম। সাধারণ সংসারীর কথা আলাদা। সাধারণ মানুষের গলা পর্যন্ত সংসার। তার জন্য ত্যাগের শিক্ষা, তাই সাধন ভজন, তাঁকে চিন্তা যত করবে ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিষে আসক্তি কমবে। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হবে তত-ই। বিষয় বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে। পশু ভাব চলে যাবে, দেব ভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হবে। তখন সংসারে যদিও কেউ থাকে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তরা অনাসক্ত হয়ে সংসারে ছিল। ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হওয়া। সংসারীর ত্যাগ সেই জন্য মনে। সন্ন্যাসীর ত্যাগ—ভিতরে ও বাইরে। সংসারীর এই অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকাকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব গার্হস্থ্য সন্ন্যাসী বলেছেন। গৃহী ও সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গৃহী যেমন গৃহীর আদর্শ, সন্ন্যাসীরও আদর্শ। সন্ন্যাস চরম আশ্রম, সংসার যার শিক্ষাগার। উদ্দেশ্য দুজনের-ই এক, ভগবান লাভ। উপায়ও দু-জনের এক, সাধনা। নিষ্ঠা ও তন্ময়তা। ঈশ্বরকে ভালবাসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সংসারীরা বলে কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? কেন ঈশ্বর এমন করলেন—তিনি ইচ্ছা করলে-ই তো সকল মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

হ্যাঁ—কথাটা সত্য, তিনি ইচ্ছা করলেই পারতেন কারণ তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি যে লীলা করবেন বলে সৃষ্টি করেছেন খেলার

আসর বসিয়েছেন—এইতে তার আনন্দ! খেলা দেখনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—ছুটোছুটি খেলা হচ্ছে—বুড়ী ছুঁয়ে দিলে খেলা শেষ—কিন্তু বুড়ীর ইচ্ছা না, তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হয়। একটু ছুটোছুটি পছন্দ। তেমনি সংসারলীলা চলুক কিছুক্ষণ। আর কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে? তিনি তো একাই মালিক। ভৃত্য কি মালিককে প্রশ্ন করতে পারে, কেন তুমি এমন কাজ করলে? আর কেন আসক্তি যায় না?

কে বললে যায় না? যায়। তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা-হলে ইন্দ্রিয় সুখ, ভোগ করতে বা অর্থ মান সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না। উপমা দিলেন, বাদুলে পোকা একবার যদি আলো দেখে, তাহলে অন্ধকারে যায় না। সংসারী বাদুলে পোকা ছাড়া কি? চোখ বুজেই তো সংসার সংসার করছে। চোখ খুলে তাকাবার সময়ও পায়না। সংসারে সবাই হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে সে রাজাই হোক, অতি সাধারণ সংসারী হোক। অপূর্ব উপমা। কালিদাস একদিন উপমা জগতে জ্যোতিষ্ক ছিলেন, কথায় বলতো উপমায় কালিদাসস্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্য উপমা জগতে উদয় হবার পর চাঁদের মত-ই ম্লান হয়ে গেছেন কালিদাস। এখন উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণস্যাই চলতি কথা। ঈশ্বর চিন্তা করলে কামিনী-কাঞ্চন অতি তুচ্ছ, চিতাভস্মের মতই বোধ হয়—পুরাণ থেকে টেনে আনলেন অপূর্ব এক দৃষ্টান্ত —রাবণকে একজন বলেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়া নানারূপ ধরছো, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাওনা কেন? রাবণ বললে তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পর বধূ সঙ্গঃ কুতঃ—যখন রাম চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা। তা রামরূপ কি ধরবো?

ত্যাগ ত্যাগ করে মাথা খারাপ করার কিছু নেই। সংসার সংসার করেও হতাশ হবার কিছু নেই। ঈশ্বর জানেন কাকে কোথায় রেখেছেন। কার কি প্রয়োজন। ত্যাগ শেষ কথা। ত্যাগ না করলে জ্ঞান হয় না। ঈশ্বর লাভ করা যায় না। ঠিক কথা! ত্যাগ তো সংসারের আর একটি ধর্ম। সং-সরতি ইতি সংসার। সরে সরে যাচ্ছে। এক জায়গায় থাকছে না। আজ যা আছে

কাল তা নেই। ত্যাগ স্বাভাবিক। ত্যাগ সকলকে-ই শিক্ষা করতে হচ্ছে। দেহ মনের দিকে তাকালে দেখি নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে। আজ যা ভাল লাগে কাল লাগছে না। নানাভাবে ভোগের মধ্য দিয়েই একটু একটু করে পরিমার্জিত হয়ে, অর্থাৎ—ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবন নতুন রূপ নিচ্ছে। বিবর্তন কি ত্যাগ নয়?

সংসারে বাপ মাকে কি দেখি? তারা তো নিত্য কত ভোগ-সুখ সন্তানের জন্য ত্যাগ করছেন। প্রিয়জনের জন্য ত্যাগ তো সংসারের রীতি। আর এই ত্যাগের মধ্যে আছে ভালবাসা। এইটি ত্যাগের প্রেরণা। যে যত বেশী ভালবাসতে জানে সে তত বড় ত্যাগ করতে পারে। যারা পৃথিবীতে আজও আলো শিখার মত আদর্শ হিসাবে জ্বলছেন, তাঁদের জীবনের ইতিহাস তো তাই বলে। তাঁরা জগতকে, মানুষকে ভালবেসেছিলেন। কথা, ত্যাগ নয় ভালবাসা। ত্যাগে আছে শূন্যতা কিন্তু ভালবাসাতে আছে সব পাওয়ার পূর্ণতা। ত্যাগে মনে হয় কি যেন হারালাম কিন্তু ভালবাসা যেন বেশী করে পাওয়া। যীশু, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এঁরা কি কিছু হারিয়েছেন? না। কোন ভাবে-ই না।

একটি ঘটনা উল্লেখ করলে মন্দ হবে না। সম্রাট নেপোলিয়ানের কথা—তিনি নানাদেশ জয় করে দেশে ফিরে যেতে না যেতেই শুনলেন, বিজিত দেশ অনেক-ই বিদ্রোহ করেছে। স্বাধীন হয়ে গেছে। তাই দেখে আক্ষেপ করে বললেন—আশ্চর্য—এ কদিনেই আমার সাম্রাজ্য ঘসে পড়ছে, আর ঐ যে নগ্ন ফকির কতকাল গেল কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য কেবল বেড়েই চলেছে। যীশুর কথা। যীশু ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। মাথা গোঁজার জায়গা ছিল না। কিন্তু যুগ পেরিয়ে যুগের মানুষের বুকে সাম্রাজ্য গড়ে গেছেন তা কোনোদিনই ধ্বংস হবে না। তবে তিনি হারালেন? এমনি বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগের সম্রাট কিন্তু সে ত্যাগ দ্বারা মানুষের মনে চিরকালের সম্রাট হয়ে আছেন। সে সিংহাসন চিরকালের।

ভাল না বাসলে ত্যাগ আসে না। বুদ্ধ, যীশু অনেক দিন আগের। দধিচী তো পৌরাণিক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এই তো সে দিনের। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ আমরা বুঝি না। কিন্তু বিবেকানন্দের ত্যাগ আমাদের মাপে আসে না। শ্রীরামকৃষ্ণ

জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি চাস? তখন মনে খুব বৈরাগ্য, ঈশ্বর দেখার জন্য খুব পাগল। সব ছেড়ে ছুঁড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করেছেন। আমি চাই সমাধিস্থ হয়ে থাকতে। মাঝে মাঝে উঠে একটু জীবন ধারণের মত খেয়ে আবার সমাধি। শ্রীরামকৃষ্ণ তিরস্কার করলেন,—সে কি! আমি যে ভেবেছি তুই বিরাট বটবৃক্ষের মত হবি—শত শত লোক তোর ছায়ায় এসে শ্রান্তি ক্লান্তি অপনোদন করবে। কি দুঃখ কষ্টে মানুষ দিন কাটাচ্ছে। আর তুই কিনা নিজের মুক্তির জন্য, সমাধির জন্য ব্যাকুল। এই শেষ কথা। ৩৯ বৎসরের জীবনে একটি দিনও নিজের জন্য নিঃশ্বাস ফেলেন নি। একটি মানুষও যতদিন পর্যন্ত্য অভুক্ত, অমুক্ত থাকবে, আমি ততদিন তাদের পাশে থাকবো। তাদের জন্য শত দুঃখের জন্ম নিতেও দুঃখিত নই। মানুষকে ভালবেসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাঁর ই মন্ত্রে দীক্ষিত বিবেকানন্দ ঐ মানুষকে ভালবেসে-ই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন। এইটি ত্যাগের ইতিহাস। ত্যাগ আসে বৈরাগ্য থেকে, সংসার বিরাগ থেকে, এটি ত্যাগের পঞ্চাশ ভাগ আর পঞ্চাশ ভাগ ভালবাসা ঈশ্বরে। দুইয়ে মিলে একশ পূর্ণ। পথে মা যাচ্ছে কুকুর ঘেউ ঘেউ করলো, মা ছুটে পালাল প্রাণ বাঁচাতে, সেই মা যখন ছেলে সাথে থাকে, বাঘ এলো, মা কি করে? ছেলেকে বাঁচাবার জন্য বাঘের মুখে নিজে ঝাঁপ দেয়। কেন? কিসের উন্মাদনায়, কিসের প্রেরণায় জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত—সন্তানের স্নেহে উন্মাদ। ভালবাসায়। আদর্শে এমনি উন্মাদনা, একতানতা এলে-ই সব ত্যাগ হয়ে যায়। তখন আর সংসার থাকে না। মীরাবাঈয়ের হয়েছিল, মহাপ্রভুর হয়েছিল—যাঁরা জগতে পূজ্য, ইতিহাস পুরুষ তাদের জীবন এই সাক্ষ্যই দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বার বার বলছেন, এব গ্লাস মদ খেলে সংসারে থাকতে পারে কিন্তু গলা পর্যন্ত খেলে কি করে সংসার করবে? সব তখন বেতাল হয়ে যায়। গলা পর্যন্ত না খাওয়া পর্যন্ত্য সংসারে-ই থাকতে হবে। কিন্তু গোলাপী নেশা করে। সব করা যাচ্ছে কিন্তু ঈশ্বরকে ধরে। অভয় দিচ্ছেন, সাহস দিচ্ছেন সংসারীকে।—"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার

করে সে ধন্য। সে বীর পুরুষ। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নেই। পানকৌড়ী জলে সর্বদা ডুব মারে—কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলে-ই আর গায়ে জল থাকে না। পিঁপড়ের মত সংসারে থাকতে হয়। এই সংসারে নিত্য-অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে এক সঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। গোলেমালে মাল আছে—তোমরা গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

এসব কথা শুনে সংসারীদের স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দিত হবার কারণ আছে। ত্যাগ কথাটায় গৃহীর বড়-ই ভয়। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজের একজন ভক্ত তো বলেই ফেললেন একদিন, 'সংসার ত্যাগের যে প্রয়োজন নেই, বাড়ীতে থেকেও যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—একথা শুনে-ও আমার শান্তি ও আনন্দ হলো।

তা-তো হলো কিন্তু, চুপ করে বসে থাকলে কি হবে? তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে কি হবে? যোসো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, দেখা দাও বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। বিষয়, স্ত্রী পুত্রের জন্য প্যাগল হয়ে বেড়াতে পারো। তাঁর জন্য পাগল হও। ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

কথাটা কি জানো—একেবারে মানুষ কিছু করে না তা নয়। বিপদ, আপদ নানা ফাঁদে পড়ে করে, কাঁদেও কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। আবার ভুলে যায়। সংসারে আসক্ত হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই; তাই এত কর্ম ভোগ। নিজের মা-বাপের মত জ্ঞান করতে হয়। আপনার মা বোধ থাকলে এখুনই হয়। তিনি তো ধর্ম মা নন। আপনার-ই মা। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আবদার কর। ছেলে যখন আবদার ধরে, কোন মতে শোনে না তখন মা তাকে শান্ত করেন, কোলে নেন। তোমরা তাই করো অবশ্য দেখা দেবেন।

চাই মন পরিষ্কার। সংসারের দোষ কি? মন নিজের কাছে নেই। থাকলে তো ভগবানকে দেবো। মন বন্ধক দেওয়া আছে কাম-কাঞ্চনে। তাই সর্বদা সাধু সঙ্গ করতে হয়। সাধু কে? যিনি

সং চিন্তা করেন। ঈশ্বরের কথা বলেন, ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তণ করে সদাসর্বদা। যার কাছে গেলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। তিনি সাধু। কি ভাবে সাধুসঙ্গ করতে হয় তা-ও জানতে হয়। সাধুর কাছে গেলেই সাধু-সঙ্গ হয় না। সাধুর কাছ থেকে সাধুত্ব নিতে জানতে হয়। সাধুর কাছে যাবার সময় মনকে ঈশ্বর বিষয়ে মগ্ন রাখতে হয়। চিন্তা করতে করতে যেতে হয়। পিছুটান রাখতে হয় না। কোন রকমে দায় সারা করতে নেই। এখুনি ফিরতে হবে, অনেক কাজ দাঁড় করিয়ে যেতে নেই। সময় জ্ঞান না রেখে সাধুর সঙ্গ ভগবৎ প্রসঙ্গ করতে হয়। সংসার প্রসঙ্গ একেবারে না। আবার ফেরার সময় পথে বা ঘরে এসে সেইসব কথা মনে মনে স্মরণ মনন করতে হয়। আলাপ আলোচনা করতে হয়।

মহিমাচরণ ভক্ত সাধক একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন, দেখো, তিনি ইচ্ছাময়, এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর ঐ কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। উপনিষদ বলেছেন—"যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্য। তবে ব্যাকুল হয়ে গুরু বা শাস্ত্র যেমন বলেছেন কিছু কর্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়। ব্যাকুল হলে তিনি-ই সব সুযোগ করে দেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ দুই রকমে হয়। কর্মযোগ, আর মনযোগ। কর্মযোগ—কামনাশূন্য হয়ে অনাসক্ত হ'য়ে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে ও কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ দুটো জিনিষ কর্মের মধ্যে থাকবে না।—একটা হচ্ছে ফলাকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় অহংবোধ আমি করেছি এই কতৃত্ব বোধ। ঈশ্বর-ই সংসারের কর্ত্তা। আমি অকর্ত্তা। তিনি যেমন আজ্ঞা করবেন আমি করবো। প্রভু তুমি সব। এটি কর্ম সন্ন্যাস যোগ। আর মনের যোগ কর্ম ত্যাগ করে শুধু নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তা করা। এটি সন্ন্যাসীদের।

বলছেন, সংসারে থেকে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? কিন্তু তা বলে ত্যাগ বা সন্ন্যাসকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছোট করেন নি। তাঁর নিজের জীবন-ই তো ত্যাগের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এমন ত্যাগ কেউ কোনদিন দেখেনি। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী এক কথায় বলেছেন,

"এবার ত্যাগ দেখাতে-ই এসেছেন।" সংসার বা সন্ন্যাস অধিকারী ভেদে বুঝতে হবে। সকলে কি ত্যাগের অধিকারী হতে পারে? বুদ্ধদেব সকলকে, গুণাগুণ বিচার না করে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন তার মারাত্মক ফল ভারত ভারতীর অধ্যাত্ম জীবনকে বিষাক্ত করে ফেলেছিল। ত্যাগ তপস্যার অভাবে আমাদের দেশ ভরে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন কি শ্রীম-কে বার বার বলেছেন, তোমাদের গৃহস্থ সন্ন্যাস। তা-না হলে ভাগবত শোনাবে কে? মা তাই তোমাদের একটা পাশ দিয়ে রেখেছেন। তোমাদের মনে সন্ন্যাস। আবার কথামৃতেই দেখতে পাই এক ঘর ভক্তদের সাথে কথা বলছেন তার-ই মধ্যে, নরেন্দ্রনাথ ভাবী বিবেকানন্দকে আস্তে করে বলেছেন—"বাবা ত্যাগ না হ'লে কিছুই হবে না।" অমনি একজন বলে উঠলেন, ওকে কি বললেন?—শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন ও আমাদের একটা কথা, তোমাদের নয়। এতে তোমাদের অধিকার নেই। তবে কি শ্রীরামকৃষ্ণের মন মুখ এক নয়। তা কেন? যে, যে কথার অধিকারী। যার পেটে যা সয়। মা তাকে তেমনি মাছের ঝোল করে দেন। সকলের পেটে—পোলয়া, কালিয়া সহ্য হয় না।

উপসংহারে আমরা এ কথা বলতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তায় ধর্ম-সাধনা ও কর্ম সাধনা এক। গৃহস্থ সন্ন্যাস বা কর্ম সন্ন্যাস ও সন্ন্যাস উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। একটির পর আর একটি মনের স্বাভাবিক গতিতে এসে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কখন ই ভূমা আর ভূমির মধ্যে কোন ব্যবধান দেখতেন না। দেখতেন না লীলা আর নিত্যকে আলাদা করে। এটি কেবল পথ ও মতের সমন্বয় নয়, এটি একটি অপূর্ব ভাব সমন্বয়। এটিকে বলতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট উদার ও মুক্ত মনের মহিমা।

মনে হয়, সংসারকে গ্রহণ করে সংসার উত্তীর্ণ হবার সাধনার দিকে সংসারী মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য-ই আদর্শ গৃহী মহেন্দ্রনাথের কাছে রেখে গেলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। হবু সন্ন্যাসী যুবক তারকনাথ টুকে রাখছিলেন অমৃত কথাগুলির কিছু কিছু। শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন না টুকতে, নিষেধ করলেন। তোদের এই কাজ নয়। স্পষ্টই এটি গৃহীর জন্য। এর-ই সাথে যদি আর একটু দৃষ্টি প্রসারিত করি, শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর জীবনের

দিকে, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের দিকে; দেখি জীবন ও জগতকে তার ভাল মন্দ সুখ দুঃখ স্বপ্ন সাধ নিয়ে যথার্থ মর্যাদার সঙ্গে সামগ্রিক গ্রহণ করেছেন। শুধু কি তাই, প্রাত্যাহিকতাকে ভরে দিয়েছেন ঈশ্বর দিয়ে। জীবনকে মিলিয়ে দিয়েছেন মহা-জীবনের মুক্ত আঙিনার সাথে। সর্বতোমুখী জীবন রচনায় অমল অঙ্গীকার ছিল শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিটি কথায় ও কর্মে—আর তাঁর মন্ত্রটি হলো, "ঠাকুর ই আমাদের সব, তাঁকে ধরে থাকলে পা বেচালে পড়বে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বিশ্বাস

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তা হ'লে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে নয়, মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।" [কঃ থাঃ মঃ ১ম খণ্ড ১৮৮২, ৫ই মার্চ]

একজন ভক্ত—মহাশয়, এইরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"অবশ্য আছে।···তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই।" [ঐ]

প্রথম প্রশ্ন যেটি মনে জাগে, এ কোন্ বিশ্বাসের কথা শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব বলছেন—যে বিশ্বাস হয়ে গেলেই সব হয়ে যায়। যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা চলি ফিরি, কাজ কারবার করি, ধর্ম করি, সংসার করি, সে তবে কোন বিশ্বাস ? বিশ্বাস কি নানা রকমের হয় ?

প্রথম আমাদের বুঝতে হবে বিশ্বাস বলতে আমরা নিজেরা কি বুঝি ? 'বিশ্বাস' একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এর ব্যাখ্যা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় 'ঘি' কেমন খেলে ? উত্তর, যেমন না তেমন। তাতে কিন্তু বোঝা গেল না ঘি-এর স্বাদ কি ? এটি একটি মনের ক্রিয়া, ইংরেজীতে

বলা যায় feeling. এই রকমের অনুভূতিকে বোঝাতে হলে অন্য একটা ভাবের আশ্রয় নিতে হয়। বিশ্বাস কথাটা বুঝতে পারি না কিন্তু 'বিশ্বাস করি'—এই কথাটার একটা ধারণা করতে পারি। আমি একটা কিছু করছি। সংসারে চলার পথে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে আমাদের এই দুর্লভ বস্তুটির অপরিহার্য। জাগতিক, সাংসারিক, ধর্মীয় সকল বন্ধন বা কর্ম এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোন বা যে কোন সামাজিক সম্বন্ধ সবটাই, একে অন্যের উপর বিশ্বাস স্হাপন করে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মক্ষেত্রেও গুরুশিষ্য, গুরু ভাই ভগ্নী একই অবস্হা। আবার দেখি ব্যবহারিক জীবনে ডাক্তারকে রোগী বিশ্বাস করে নিজেকে ব্যাধি মুক্তির জন্য সঁপে দেয়! মক্কেল দেয় নিজেকে তুলে উকিলের হাতে মামলার হাত থেকে উদ্ধার পেতে। এ সবই বিশ্বাসের উদাহরণ। ধারণা, এরা আমাকে ডোবাবে না ; অর্থাৎ আমার ধারণার অমর্যাদা করবে না। বিশ্বাস ভাঙবে না। বিশ্বাস এই ক্ষেত্রে একটি আচরণ বিধি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, পশুপাখী, জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও তাই। এই রকম বিশ্বাস সাধারণত আরোপিত। এ ছাড়া সমাজে বাস করা, মানুষে মানুষে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব! এই আরোপিত বিশ্বাসের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার থেকে আসে।

শুনলাম, অমুক লোক খুব ভাল, ভাল ডাক্তার বা উকিল অমনি নিজের কোন কিছু না জানা থাকা সত্ত্বেও অন্য লোকের মুখে শুনে প্রাথমিক বিশ্বাস করে তার সঙ্গে যুক্ত হই ও সম্বন্ধ গড়ে তুলি। বিশ্বাস সংস্কার বলা যেতে পারে। আর এ সংস্কার জন্ম-জন্মান্তরের, কারণ মানুষ কোন কিছুই বাইরে থেকে শিখে না, সমস্ত জ্ঞান-ই ভিতরে আছে, বাইরের ঘটনা ভিতরের জ্ঞানকে উসকে দেয়। সংসারে যে 'বিশ্বাস' নিয়ে আমরা চলাফেরা করি সে বিশ্বাসে স্বার্থগন্ধ থাকে। একে বিশ্বাস করলে আমার কতটা লাভ হবে, আর না করলে ক্ষতি কতটা হবে! অন্য পাঁচটা কাজের ব্যাপারে যেমন লাভ লোকসান খতিয়ে কাজে হাত দি, তেমনি বিশ্বাস করতে গিয়েও এ ভাবের ব্যতিক্রম খুব কম সময়েই হয়। একজনকে হয়তো বিশ্বাস করলাম, কিন্তু যতটা আশা করে বিশ্বাস

করেছিলাম ততটা হলো না, অমনি বিশ্বাস চটকে গেল। অন্যত্র গেলাম। এতো সবসময়ই হচ্ছে। এক কথায় দোকানদারী। আমার স্বার্থের সিদ্ধির কমতি হলেই বিশ্বাস ভেঙে যায়। বিশ্বাসের ভাঙা গড়া নিয়ে আমাদের কারবার—আমাদের ব্যবহারিক জীবন, এ বিশ্বাস হতেও যতক্ষণ ভাঙ্গতেও ততক্ষণ। বিশ্বাস কতটা করি, না করি তার একটাই বোঝার উপায় ; কতটা নির্ভর করি। নির্ভরতা বিশ্বাসের কষ্টি পাথর। বিশ্বাস করি কিন্তু নির্ভর করি না তখন বোঝা যাবে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করি না।

এই বিশ্বাসের দ্বারা সংসারের কাজ, জগতের কাজ স্বার্থ সিদ্ধিই হয় না, বার বার ভেঙ্গে যায়। এমনি সারা জীবনও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনতে পারা যায় না। এই তো দেখছি বেশী। মামলা. মোকদ্দমা, হানাহানি, বিদ্বেষ হিংসা যা-কিছু অশান্তির কারণ সব-ই এই অমূল্য বস্তু বিশ্বাসের অভাব থেকে। ব্যক্তি জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে সর্বত্রই এক অবস্থা।

এই বিশ্বাসে নিজের জীবনে বা লোক জীবনে শান্তি সুখ আনা যায় না তা দিয়ে কি ঈশ্বর লাভ সম্ভব ? এ কি সত্যই ভাবা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বলছেন, বিষয়ীর বিশ্বাস কেমন—"উত্তপ্ত লোহায় জল যতক্ষণ স্থায়ী হয়, ততক্ষণ।" নাই বললে-ই চলে। "বিষয়ীরা মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে, কিন্তু বিশ্বাস করে না।" শোনা কথা আওড়ায় মাত্র। ছেলেপুলেরা যেমন খুড়ী জ্যেঠীর ঝগড়া শুনে বলে. আমার ঈশ্বরের দিব্যি, তোর ঈশ্বরের দিব্যি। এ যেন কথার কথা, কোন মূল্য নাই। সত্য-ই তো এসব কথার ধক্ কতটুকু ? বিশ্বাস করি নির্ভর করি, যাই করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে করে কে—মন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, 'মন নিয়েই সব'—মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম কথাবর্তা চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো, তাহলে ঈশ্বর চিন্তা, হরি কথা এই সব হবে। মনেতেই বন্ধ, মনেতে-ই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ সংসারেই থাকি বা অরণ্যে-ই থাকি, আমি ঈশ্বরের সন্তান"

মনকে যা বোঝানো যাবে তাই মন বুঝবে। শ্রীরামকৃষ্ণ

বলছেন—যদি সাপে কামড়ায় 'বিষ নাই' জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি বিশ্বাস করে আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত এই কথাটি রোক্ করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। এই বিশ্বাসের জন্মের কথা। মনকে রোক্ করে বিশ্বাস করতে শিখাতে হবে। আবার যদি রাতদিন 'আমি পাপী, আমি পাপী' এই মনকে বিশ্বাস করতে শিখান হয়, সে তাই হয়ে যায়।

ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস এমন হওয়া চাই। কি আমি তাঁর নাম করেছি আমার এখনও পাপ থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ একজন সদাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কথা বলছেন—নাম কৃষ্ণ কিশোর. বৃন্দাবন গিয়েছিল রাস্তায় হঠাৎ জলতৃষ্ণা পেয়েছে। একটা কুয়োর কাছে গিয়ে দেখলে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বললে, ওরে তুই এক ঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বললে, আমি হীনজাত মুচি। কৃষ্ণ কিশোর বললে, তুই বল শিব। নে এখন জল তুলে দে। এত কালের সংস্কার কিন্তু তার চেয়ে বড় সংস্কার ঈশ্বরে বিশ্বাস— ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়। দুটোই সংস্কার কিন্তু ভগবান সকল সংস্কারের শ্রেষ্ঠ সংস্কার,— এই বিশ্বাসটি কৃষ্ণ কিশোরের হয়েছিল। সংস্কার তো মনকে আশ্রয় করে কর্মে রূপ নেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বড় কথা তাঁর নামে 'ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস কর।' গান গেয়ে গানের মাহাত্ম্য বিশ্বাসের মাহাত্ম্য শুনাচ্ছেন—"আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মরি আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।"

যে ভাব-ই আশ্রয় করা যাক না কেন, ব্যবহারিক জীবনের কর্ম-ক্ষেত্রে হোক বা অধ্যাত্ম সাধনায়-ই হোক ঠিক বিশ্বাস না হলে ফল লাভ হয় না।

বিশ্বাসেরও একটা সাধনা চাই তবে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। আর বিশ্বাসের আঁট যদি দৃঢ় হয় তাহলে বেশী খাটতে হয় না। ব্যবহারিক জীবনে কি দেখি, ঐ দূরে আকাশে যে প্লেনটা যাচেছ— তাতে চড়ে দূর দূর দেশে যেতে ভয় নেই কারণ শুনছি বহুলোক, দামী দামী মানুষ যাচ্ছে আসছে, এসব লক্ষ্য করে মনকে বুঝিয়েছি কি আর ভয়, সবাই তো যাচেছ—তখন বিশ্বাস করে

ঐ যন্ত্রের উপর ভরসা রেখে মানুষ পাইলটএর উপর বিশ্বাস রেখে দূরে পারি দি। আবার কতো দুর্ঘটনাও হচ্ছে—মানুষ কি তাতে প্লেনে চাপা ছেড়ে দিয়েছে? এই হচ্ছে বিশ্বাস এবং নির্ভরতা।

তেমনি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে, গুরু বাক্যে বিশ্বাস, শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস না করলে মন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শিখবে না অন্তরে যে বিশ্বাস সংস্কার চাপা আছে জাগবে না।

বিশ্বাস একবার হয়ে গেলেই আর ভাবতে হবে না—কিন্তু এ বিশ্বাস কেমন করে হবে? বিশ্বাস শুনে শুনে হয়, বিশ্বাস সঙ্গগুণে হয়, যেমন সঙ্গ করা যাবে তেমন ভাবের বিশ্বাস সৃষ্টি হবে, বিশ্বাস কর্মের ফল দেখে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে—বিশ্বাস কি করে হবে শিখাচ্ছেন, ভক্তদের বলছেন—বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে—রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো তাঁর। কিন্তু তাঁর দাস হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র পাড়ে গিয়ে পড়ল। তার সেতুর দরকার হয় নাই। আর একটা কাহিনী—বলছেন—বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিয়েছিল। সে লোকটি সমুদ্রের পাড়ে যাবে, বিভীষণ তাকে বললে, তোমার ভয় নেই তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে যাও, কিন্তু দেখ যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময় তার ভারী ইচ্ছা হল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে। খুলে দেখে যে কেবল 'রাম নাম' লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে 'এ-কি! শুধু রাম নাম লেখা রয়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল। দুটো কাহিনী এক কথাই বলছে—বিশ্বাস করলে কি হয়—আর অবিশ্বাস করলে কেমন ঠকতে হয়।

বিশ্বাসের কতগুণ বর্ণনা করছেন "যার বিশ্বাস আছে, সে যদি মহা পাতক করে - গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ করবো না, তার

কিছুতেই ভয় হয় না।

এই জাতের বিশ্বাসের মধ্যে আছে শ্রদ্ধা—আর সম্পূর্ণ আত্ম নির্ভরতা। বিন্দুমাত্র "কিন্তু" থাকবে না। এ বিশ্বাস নিশ্চয় আ্বকা বুদ্ধি থেকে আসে। এ বিশ্বাসকে "কিন্তু" অন্ধ বিশ্বাস বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে কতগুলি বিশ্বাস অন্ধ কতগুলি বিশ্বাস চোখওয়ালা হয় না। বিশ্বাসের কথা হচ্ছিল, নরেন্দ্র-নাথ ঠাকুরকে কথার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, অন্ধ বিশ্বাস সব কিছুতে করা ভাল না। উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, "তুই চোখওয়ালা বিশ্বাস আমায় দেখাদেখি। নরেন্দ্রনাথ উত্তর খুঁজে পান নি।" আমরা যাকে অন্ধ বিশ্বাস বলি, তা অনেক সময়ই emotional, আগ পাছ না ভেবে একটা কিছু করে বসি, ফলে দুর্ভোগ হয়। অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্যে ভাব প্রবণতা ও লোভ থাকে বেশী ক্ষেত্রে। একটা ঘটনা উল্লেখ করছি—একটা লোক হেঁকে বলে যাচ্ছে টাকা ডবল করে দেবে বা তামা সোনা করে দেবে। অনেকেই শুনছে—অনেকেই হেসে আজগুবি কথা মনে করে চলে গেল। ওর মধ্যে দুই-একজন সেই লোকটার পিছু পিছু গিয়ে গোপনে জিজ্ঞাসা করলো, সত্যি কি তামা সোনা হয়? লোকটা বলল, আমি মুখে বললেই কি তুমি বিশ্বাস করবে? থাকে তো করে চোখে দেখে নাও। আরে এও ভাগ্যের কথা, সবাই কি বিশ্বাস করে, না সব্বাইয়ের ভাগ্যে এসব জোটে। লোভ তুঙ্গে উঠলো—হয়তো শিকেটা তার এবার মাথায়ই ছিঁড়বে। আচ্ছা এই নাও, দেখো ফাঁকি দিও না যেন।

এসো একটু আড়ালে, কারণ রাস্তার উপরে করা বিপদ আছে, হয়তো তোমার হাত থেকে কেউ সোনা কেড়ে নেবে। লোভ বোঝালো ঠিক কথা—একটু আড়ালে যেই গেল লোকটা বলল, আসছি রইল আমার ব্যাগটা, সেই যে গেল আর ফিরলো না. সব গেল। আচ্ছা এটাকে বিশ্বাস বলবো?—এইরকম ছোট বড় নিত্যই হচ্ছে। চাকুরীর জন্য, বেশী অর্থ পাইয়ে দেবার জন্য একে ওকে বিশ্বাস করে কত দুর্ভোগ না ডেকে আনছে লোকে। আর কেবলই বলছে—কাউকে বিশ্বাস করার যো নেই। সব ঠগ জুয়াচোর হয়ে গেছে।

বিশ্বাস করার মধ্যেও কতগুলি নিয়ম আছে। সেগুলি হচ্ছে কাকে বিশ্বাস করবো—সে মানুষের কি গুণ থাকতে হবে। আবার আছে অবস্থা, কতগুলি অবস্থা আছে যখন বিশ্বাস করলে বিপদ হয়, আবার অবস্থা বুঝে, আগ পাছ ভেবে বিশ্বাস করলে ভয়ের আশঙ্কা কম।

ব্যবহারিক জীবনে বিশ্বাস করতে গেলে ও মানুষের বা অবস্থার গুণাগুণ বিচার না করে করি না। ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন, তাকে ব্যবহার করে, পাঁচ জন সংসারে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা কম।

তেমনি অধ্যাত্ম জগতে বিশ্বাস করতে হবে শাস্ত্রগুরু ও মহা পুরুষদের। শাস্ত্র সাধুদের জীবন বা তাঁদের উপলব্ধি। গুরু ও মহাপুরুষ সত্যদ্রষ্টা। তাঁদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে ভাল ছাড়া মন্দ হবার উপায় নেই। কারণ প্রথম কথা তাঁদের কোন স্বার্থ নেই—তাঁরা কেবলই মঙ্গল চান। মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁদের জীবন ও কর্ম। এঁরা ঐ পথে গিয়েছেন, দেখে এসেছেন তবে না সব বলে গেছেন, কোথায় কি অসুবিধা আছে। মহাজনরা যে পথে গেছেন সেটাই ঠিক পথ।

কিন্তু একটা কথা মনে হতে পারে সাধু বা মহাত্মা ক'জন। তাঁদের বাইরে অসংখ্য লোক। দু চার জন ব্যক্তির কথা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে আর বেশী সংখ্যককে বিশ্বাস করবো না—এ কেমন যুক্তি? আমরা যেমন কোন কথা হলেই বলে থাকি, কেন অমুকটা করার দোষ কি? সকলেই তো করছে। বলি মহাত্মা সাধু যাদের বলছো, তাঁদের কথাই কথা আর অপরের কথা কথা নয়, এটা যুক্তির ধোপে টেকে না। সাধু মহাত্মাদের কথা কেন নিতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে তার অবশ্যই বলিষ্ঠ কারণ আছে। যাঁরা অতিন্দ্রিয় দর্শী তাঁরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনের সমস্যা সমাধান করেছেন। শান্তির অধিকারী হয়েছেন। তাঁদের জীবন আনন্দময় হয়েছে। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কি চায়, একটু আনন্দ একটু শান্তি। এই শান্তির আনন্দের পিছনে দিন রাত ছুটে বেড়াচ্ছে, মরু ভূমিতে মরিচীকার পিছনে আর পরিবর্তে পাচ্ছে অশেষ দুঃখ। যারা শান্তির

অধিকারী হয়েছেন, তাঁরাই সাধু, মহাত্মা, তাঁরাই প্রকৃত মানুষের পথ প্রদর্শক। তাঁরাই অন্ধকারের আলো-বর্ত্তিকা। তারাই বার বার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন, দেখান সঠিক পথ। বলেন বিশ্বাস কর, ঘুরতে হবে না, শাস্ত্রের অসার ভাগ নিতে হবে না। আমরা কাশীতে গিয়ে কাশীর সব দেখে এসেছি তাই পথ ঘাট জানি। জগতের বহু লোক তো মনীষী, মহাত্মা, কালজয়ী মানুষ হন না। হন দু-চার জন। তাঁরা যীশু, বুদ্ধদেব, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ। এঁদের জন্ম, কর্ম সর্বস্ব মানুষের মঙ্গলের জন্য।

প্রত্যক্ষদর্শীকে বিশ্বাস করাকে কোন মতেই অন্ধ বিশ্বাস বলা যায় না। বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধার আর একটি নাম। যাকে আমরা শ্রদ্ধা ভক্তি করি তাঁকে বিশ্বাস করি। এই শ্রদ্ধা, ভক্তির গুরুত্বের উপর বিশ্বাসের দৃঢ়তা নির্ভর করে, কাজেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির মত বিশ্বাসযোগ্য বস্তু বা ঘটনা হয় না। সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ করা ইন্দ্রিয়জ। মহাত্মা বা সাধুদের প্রত্যক্ষানুভূতি অতীন্দ্রিয়। মনের উচ্চভূমিতে উঠে দেখা। সাধারণের দেখার থেকে মহাপুরুষদের দেখা জানা অনেক আলাদা। তাতে ভুল হবার উপায় নেই, তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ।

সাধারণ মানুষও কিন্তু নিজে যা দেখে প্রত্যক্ষ করে তাকে কোন মতেই অবিশ্বাস করতে পারে না। তাই কথায় বলে, শোনার থেকে দেখা ভাল। বিশ্বাস এই ভাবেই হয়। ইন্দ্রিয়জ বিশ্বাস হয় আবার ভেঙ্গে যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রমাদ ডেকে আনে। এই বিশ্বাসের মধ্যে আছে স্বার্থের আবরণ ও কামনা বাসনার বিক্ষেপ—সত্য জিনিষ দেখতে দেয় না।

বিশ্বাস করলেই অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। পুরাণে একলব্যের কাহিনী আছে। একলব্য দ্রোণাচার্য্যকে নিজ গুরু করতে চেয়েছিলেন অস্ত্র শিক্ষার জন্য। দ্রোণাচার্য্য তাঁকে প্রত্যাখান করেন। একলব্য ছাড়ার পাত্র ছিলেন না—এতো দৃঢ়তা ছিল তাঁর মনে, বিশ্বাসে। সে দ্রোণের মাটির মূর্তি গড়ে তার সামনে অস্ত্র শিক্ষা করে সিদ্ধ হন। একথা জানতে পেয়ে দ্রোণাচার্য্য এসে তাঁর গুরু দক্ষিণা চান এবং একলব্য দক্ষিণা হিসাবে তাঁর

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে গুরুকে দেন। এর থেকে বুঝতে পারি কত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। গুরুর প্রতি কত নিষ্ঠা ও বিশ্বাস একলব্যের ছিল। এমন বিশ্বাসে ভগবান অবশ্যই লাভ হয়। এ বিশ্বাস বড় দেখা যায় না। দু একজনের হ'তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকের বিশ্বাসকে খুব উচ্চস্থান দিয়েছেন। নির্ভেজাল বিশ্বাস। অহেতুকী ভালবাসা যেমন, বালকের বিশ্বাসও তাই। কোন কারণ নেই কিন্তু ষোল আনা বিশ্বাস। মা বলেছেন, ইনি তোর বাবা, ইনি তোর দাদা—কোন যুক্তি বা কোন কিছুতেই এ বিশ্বাস নষ্ট করা যায় না। কেউ বলেছে ঐ ঘরে জুজু আছে, অমনি বিশ্বাস সত্য-ই জুজু আছে।

জটিল বালকের গল্প বলেছেন ঠাকুর, পাঠশালায় যেতে ভয় করছে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মা বললেন ভয় কি, ওখানে তোমার মধুসূদন দাদা আছে। যখন ভয় করবে, তাঁকে ডাকবে, দেখবে তিনি এসে তোমাকে পাঠশালায় নিয়ে যাবেন। বলা আর অমনি বিশ্বাস। পাঠশালায় যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে এসে ভয় হলো অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। ডাকতে শুরু করলো, কোথায় দাদা মধুসূদন? আমার ভয় করছে—এসো, মা যে বলেছে তুমি আমাকে পাঠশালায় নিয়ে যাবে—এসো। এলেন মধুসূদন দাদা। এই যে আমি এসেছি —ভয় কি, আয় আমার সাথে পাঠশালায় নিয়ে যাব। যখন ডাকবি আমি আসব। এ বিশ্বাসের কোনই হেতু নাই – কেবলই মায়ের কথায় বিশ্বাস। বুদ্ধি বালকের নেই—কাজেই প্রশ্ন ও নেই বিচারের। এ বিশ্বাস বহু জন্মের সংসার ছাড়া হওয়া মুস্কিল।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—মদোমাতাল, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে যখন যান তখন অনেক বয়স, বালক মোটেই না কিন্তু বিশ্বাস তাঁর বালকেরই মত। চার পাঁচ দিন মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন একেবারে ষোল আনার উপর আঠারো আনার বিশ্বাস, তুমি ভগবান আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ, গালাগাল করছেন নেশার ঝোঁকে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, অবতার এ জ্ঞানে পূর্ণ-বিশ্বাস। অপরে তর্ক করছে, কি করে বুঝলে ভগবান—তিনি

বলছেন এটি তর্কের বস্তু—belief কারণ ধরো ভগবান তোমার সামনে এসে বললেন, আমি ভগবান তখন অবশ্যই তুমি বলবে প্রমাণ দেখাও, তুমি যে ভগবান। এই তো তর্ক। ভগবানকে তুমি বুঝবে কি করে?—তুমি কি তাঁকে কখনো দেখেছ না জান? তোমার যা জানা তা কতটুকু! তাঁকে এক বিশ্বাস করা ছাড়া জানার কোন উপায় নেই—যেটি আছে সেটি তাঁর, ঈশ্বরের একান্ত কৃপা—তিনি ধপ করে না বুঝালে, দেখালে কেউ জানতে পারে না তাঁকে—তাই বিশ্বাস,—একমাত্র বিশ্বাস। সরল না হলে বিশ্বাস আসে না। শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ ঘোষ সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি।

গীতাতে আমরা যে বিশ্বাস দেখি সে বিশ্বাস নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন। অর্জুনের হয়েছিল। অর্জুনের বিষাদ উপস্থিত—যুদ্ধ করতে এসে মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। বুদ্ধি-ভ্রংশ হলো। অর্জুন বলছেন—"কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।"
(২।৭ গীতা)

আত্মীয়স্বজনদের বধ করে কি প্রকারে জীবন ধারণ করবো—এই চিন্তায় আমি বড়ই দুর্বল বোধ করছি—আমি আমার স্বধর্ম যুদ্ধ ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবো কিনা বুঝতে পারছি না। আমি প্রার্থনা করছি—আপনি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন কোনটা আমার মঙ্গল—আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছি আমি আপনার শরণাগত আমাকে উপদেশ দিন।

এই শুনে মনে হয় নাকি—এতকাল তা'হলে শ্রীকৃষ্ণের সাথে অর্জুনের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? অবশ্য-ই গুরুশিষ্যের না। ছিল বন্ধু-সখার তাতে প্রপন্নতা ছিল না—ছিল না শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গুরুর শ্রদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণের কথা, পরামর্শ কি অর্জুন নেন নি বা ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন না? তাও না। ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বরের মত শ্রদ্ধা বিশ্বাস করতে হয় তা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণও তেমনি ব্যবহারই করতেন কিন্তু যখন

অর্জুন বিষাদগ্রস্ত, বিপদে পড়ে প্রপন্ন হ'য়ে—স্পষ্ট ভাষায় বললেন, আজ থেকে আমি তোমার শিষ্য। শিষ্যকে যেমন করে উপদেশ দিতে হয় শরণাগতকে রক্ষা করতে হয়—তাই কর প্রভু। এটি একমাত্র গুরুতে আত্ম নিবেদন না করলে এ বিশ্বাস আসে না। তখন শিষ্যের মধ্যে গুরুরূপ জন্ম নেন—সে গুরু সচ্চিদানন্দ নিজে—তখনই কেবল গুরু তাঁর অভয় হস্ত প্রসারিত করে শিষ্যকে তাঁর বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। অর্জুনের ক্ষেত্রেও তাই হলো। এবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রকৃত সারথী হলেন কেবল রথের না, দেহ রথের, মন রথের, সকল কর্মের। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত গীতাময় অষ্টাদশ অধ্যায়ে নানা যোগের, নানা উপায়ের কথা বললেন, কি কি করলে অজ্ঞানতা দূর হয়, ঈশ্বর লাভ হয়, জাগতিক সুখ হয়, জয় ইত্যাদি তো বটেই। বলা সব শেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

সর্বধর্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
গী—১৮৬৬

বিষাদ যোগ থেকে মোক্ষ যোগে এসে শ্রীকৃষ্ণ এতো সব যোগের, পথের কথা বলে—শেষে বলছেন—'বাসুদেব সর্বমিতি"—আমিই সব। আমাকে ধরলে পরে আমার স্মরণ-মনন শ্রদ্ধাবণত চিত্তে করলে, আমি ঈশ্বর এই বুদ্ধিতে নিশ্চিত হলে—কোন ধর্ম কর্মের দরকার হয় না। অন্যান্য ধর্মকর্ম আমি ঈশ্বর এটি নিশ্চয় করার জন্য—আমিই সকলের কারণের কারণ এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য—আর এটি জেনে নিয়ে আমার শরণাগত হ'লে আমিই সকল পাপ থেকে মুক্ত করি। এইটি হচ্ছে সারকথা কিছুই ভাবতে হবে না। সকল ভাবনা আমার।

অর্জুনকে এত বললেন কেন—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে উত্তীর্ণ করার জন্য। তারপরও জিজ্ঞাসা করছেন—অর্জুন, তুমি যে একাগ্রচিত্তে গীতাশাস্ত্র শুনলে তাতে তোমার 'অজ্ঞান-সম্মোহঃ', অজ্ঞানজনিত বিবেকবুদ্ধি দূর হয়েছে কি? না হলে বলো আবার বলবো। অর্জুন তখন বলছেন—

"নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।'

(১৮।৭৩)

আমাদের কথা হচ্ছে—'এখন এত সব শুনে অর্জুন বলছেন, আমি গত সন্দেহ হয়েছি অজ্ঞানসুলভ বুদ্ধি দূর হয়েছে, আমি এবারে নিশ্চয় করতে পেরেছি—তুমি বাসুদেব—তুমি একমাত্র জীবের আশ্রয়স্থল, দেখতে মানুষের মত হলেও। আমি এতকাল তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, এতো কাছে থেকেও বুঝিনি তুমি কে? তোমার কথাতে এবারে দৃঢ়নিশ্চয় করেছি তুমি স্বয়ং ভগবান। আমি সত্য বলছি—'করিষ্যে বচনং তব।' এখন আমি একমাত্র তোমার কথায় চলবো। অন্য কথা নয়। অর্জুনের ধ্রুব স্মৃতি লাভ হয়েছে—অজ্ঞান মোহনাশ হয়ে আত্মস্মৃতি লাভ হয়েছে। এটি সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানের ফল।

এই বিচারবুদ্ধি থেকেও ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে, যেমন হলো অর্জুনের। একেই জ্ঞান বলে। আবার ঐ জ্ঞানই বিশ্বাস। গীতায় বলেছেন, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং।'

পরিশেষে একটিই কথা—'মামেকং স্মরণং ব্রজ'—সে বুদ্ধি যেমন করে হোক। ভগবান যত উপদেশই দিন তাঁর শেষ কথা—"আমাকে বিশ্বাস করো, নির্ভর করো, তোমাকে কিছু করতে হবে না—মা-কালী নিজে সব করবেন।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩য় খণ্ড ৭ই মার্চ) ১৮৮৫

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলেছেন বিশ্বাসের মত বস্তু নেই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।' আপন মা বিশ্বাস থাকলে তো এখুনি হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমা বলতেন, বিশ্বাস তো শেষ কথা। হলেই হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবারও বলেননি সকলে সংসারে বদ্ধ হয়ে আছে ঈশ্বরকে ডাকে না। তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন, "জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার ভুলে যায়। সংসারে আসক্ত হয়।" যেমন হাতীকে স্নান করিয়ে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিলে, আর ধুলো কাদা মাখতে পারে না। ঈশ্বরে মানুষের বিশ্বাস নাই, তাই এত কর্মভোগ। এ বিশ্বাসের একমাত্র উপায়—অনুরাগের সাথে অভ্যাস যোগ।

দ্বিতীয় খণ্ড

ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে মনীষী মিলন ঃ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনায় লিখেছেন, "তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে নতুন তীর্থ রূপ নিল জগতে।"

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন একটি মহান তীর্থ বিশেষ। এই তীর্থে এসে মিলেছে বহু সাধকের বহু গুণী-জ্ঞানী-মানী সাধকের সাধনার ধারা। এ সকল মনীষীরা শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থে অবগাহণ করেছেন, শ্রান্তি ক্লান্তি অপনোদন করেছেন, তৃপ্ত হয়েছেন। আর তাঁদের অনুসরণ করে এসেছেন অসংখ্য তীর্থ-যাত্রীর দল। সকল স্তরের মানুষ। এমন করে মানুষের আত্মাকে ইতিপূর্বে কেউ স্পর্শ করে নি। আলোড়িত করেনি। নিজের মধ্যে বিশ্ব আত্মাকে সংহত করেছিলেন সাধনার দ্বারা তাই শ্রীরাম-কৃষ্ণ হতে পেরেছিলেন সকলের আপনার জন।

শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ, ভারতের নবজাগরণের যুগ। একটি গৌরবময় অধ্যায়। সকল দিকেই মানুষ মাথা নাড়া দিয়ে উঠতে প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষ জাগরণের প্রবাহ সীমায় বন্ধ থাকে না। বাংলা তথা এই জাগরণের সূচনা পর্বের কিছু আগে-ই নব ইউরোপে জাগরণের জোয়ার বয়ে গেছে, তার-ও ঢেউ ভারতের জাগরণের পালে মৃদুমন্দ আঘাত করেনি তা নয়। ভারতে এই নবজাগরণের পথিকৃত রামমোহন রায়। জাগরণ পরাণুকরণ নয়। ভারতের জাগরণের ধরণ ঠিক ইউরোপীয় জাগরণের অনুকরণে হয়নি। এর বৈশিষ্ট্য ও রূপ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মূলতঃ জাগরণ আত্মসত্তার বিকাশ। বিকাশ দুই ভাবে হয়, বাহ্যিক ও অন্তরের। ইউরোপীয় জাগরণ ছিল সম্পূর্ণ ব্যাহ্যিক ও স্থূল। জড়বস্তুর বিকাশ। ভারতের বিকাশ মূলত আত্মার বিকাশ। ধর্মের বিকাশ অন্তরের বিকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই বিকাশের প্রত্যক্ষ ফল। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে
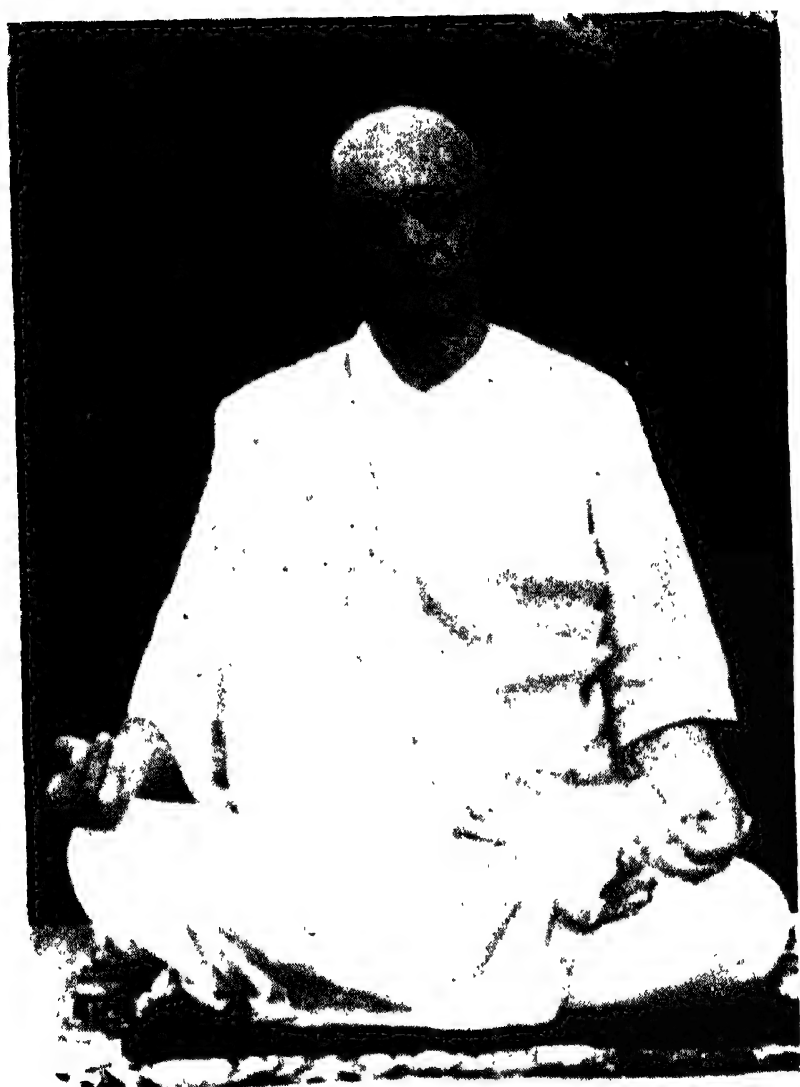
কেন্দ্র করেই বাংলা তথা ভারতের মহাজাগরণ ফুলে ফলে পল্লবায়িত হয়েছে। এইটি এখন সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এই জাগরণের সূচনা বীজাকারে দেখতে পাই। 'নব জাগরণের আর এক নাম বিপ্লব। এই বিপ্লব সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে প্রথম দেখা দেয় বিশেষ ব্যক্তি জীবনে। বিশেষ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন জাগরণের ঋত্বিক। আর যে পরিবর্ত্তন সূচনা করে তা দেখা দেয় আদর্শে ও জীবনের মূল্যবোধ ও আত্মচেতনায়।

প্রাক্ শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ ছিল ভারতের দুর্দিন। বিদেশীরা কেবল দেশ জয় করে-ই ক্ষান্ত ছিল না, তারা চেয়েছিল রাজ্য জয়ের সাথে সাংস্কৃতিক আধিপত্য। চালিয়েছিল শাঁড়াশী অভিযান। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও মিশনারীদের দ্বারা প্রচার। ধর্মান্তর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নানা ভোগ্য পণ্যের আবিস্কার, ভারত-বাসীর উপর যাদু-মন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল। দলে দলে লোক আপাত বিদেশী চাক্‌চিক্যে আকৃষ্ট হয়ে ধর্ম ত্যাগ করে নিজের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ত্যাগ করে পরাণুকরণে মত্ত হয়ে উঠেছিল। দেশের সুমহান ইতিহাসের প্রতি আস্থা হারিয়ে, নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে মৃতপ্রায় এক জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—সেটি-ই তার প্রাণ। ভারতের প্রাণ ধর্ম, ধর্ম-বিশ্বাস। বহু আক্রমণ বহু-অত্যাচার ভারতের উপর হয়েছে, ভারত কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাস হারায়নি। কালের গতির সাথে সাথে কিছু কুসংস্কার, আবর্জনা এসে নির্মল জলের উপর কচুরীপানার মত জমেছিল সত্য। সংস্কার প্রয়োজন ছিল। সংস্কারের মধ্যে যা একদিন প্রাণদ ছিল আধুনিকতার সাথে পাল্লা দিতে পারছিল না। এই অবস্থাকে রুখতে সমকালীন মনীষীরা নানা দিকে নানা আন্দোলন গড়ে তুললেন। সকলেরই এক চেষ্টা হিন্দু ধর্মের পুনরোজ্জীবন, চাই বিশুদ্ধ ধর্ম। এই মহতী প্রচেষ্টার প্রথম সারির যাঁরা তাঁদের মধ্যে এক নম্বর ছিলেন, রাজা রামমোহন রায়। ১৮২০তে তিনি সৃষ্টি করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। ধর্ম আন্দোলন হলেও আধ্যাত্মিকতা ছিল গৌণ। সমাজ সংস্কার ছিল মুখ্য। বেদকে তিনি প্রামাণ্য স্বীকার করলেও বিদেশী

ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য করে বেদাশ্রিত হিন্দু ধর্মকে ছাট-কাট দিয়ে নতুন পোষাক পরালেন। প্রতিমা পূজাকে পুতুল পূজা বললেন। কিছু সহরের লোক আকৃষ্ট হল সত্য, কিন্তু যে কাজের জন্যে নতুন রূপ দিলেন সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মকে বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে তা বিফল হলো। ব্রাহ্মধর্ম সম্প্রদায়ে পরিণত হল। বৈদিক যুগের পর দু হাজার বৎসর ব্যাপি উপনিষদিক ও পৌরাণিক যুগ বয়ে গেছে, যার ফলশ্রুতিতে অসংখ্য ভারতীয় নরনারী প্রতিমা পূজা পার্বণ ইত্যাদি দ্বারা ধর্ম জীবনকে সুগঠিত করে চলছিলেন তারা মুহূর্তে বাদ পড়ে গেল। ব্রাহ্ম ধর্ম হলো মুষ্টিমেয় লোকের ধর্ম। তারপর তারা আর একটা বড় রকমের ভুল করলেন, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকে এক আসনে বসালেন। বেদ মানলেন কিন্তু বেদের অনুশাসন গ্রহণ করলেন না। মূলতঃ সমাজ সংস্কারকেই ধর্ম আখ্যা দিলেন প্রকৃত অধ্যাত্মানুভূতি অবহেলিত হলো। ধর্মের প্রাণটি বাদ দিয়ে খোলটি নিয়ে টানাটানি হলো মাত্র। রামমোহনের উত্তরসূরি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব চন্দ্র সেন। তাঁরা রামমোহন থেকে বেশী দূর এগোতে পারলেন না কারণ তাঁরাও রামমোহনের ধারাকেই বজায় রাখলেন। সমাজ সংস্কারই রইল মূল কথা।

ইউরোপীয় নবজাগরণের ধাক্কা সামলাতে ভারতেও সৃষ্টি হলো নানা আন্দোলন। উত্তর ভারতে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, আর দক্ষিণ ভারতে থিওজাফিষ্ট। ব্রাহ্মদের মত-ই আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী, নতুন আর একটি সম্প্রদায় গড়লেন। তিনিও বেদকে মানলেন, হিন্দু রইলেন কিন্তু হিন্দু দেবদেবীকে পুতুল বলে অবহেলা করলেন। প্রতিমা পূজাকে মহাপাপ বললেন। আর্য হিন্দুদের নিলেন কিন্তু ভারতে বসবাসকারী অসংখ্য আর্য ছাড়া অনার্য, দ্রাবীড়, কোল, ভীল, সাঁওতাল সব বাদ হয়ে গেল। ভারত চিরকাল-ই বহু জাতির দেশ। বহু সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে ভারতীয় কৃষ্টি ও ইতিহাস। পণ্ডিত দয়ানন্দজী ব্রাহ্ম সমাজের মত-ই বিশুদ্ধ ধর্ম পথ বাদ দিয়ে সমাজ—সংস্কারকে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের পথ ধরলেন।

আর এক শ্রেণীর চিন্তানায়কেরা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবী তারা হিন্দুয়ানী বজায় রেখে বুদ্ধিবৃত্তিকে মূল করে বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে আইনের দ্বারা সমাজ সংস্কারকে হিন্দু ধর্মকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাবার কথা ভাবলেন। চাইলেন নারীমুক্তি বিধবা বিবাহ শিক্ষার বিস্তার অবাধ বিবাহ। এদের মুখপাত্র হলেন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যিক বঙ্কিম-চন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কেরা।

তবুও একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, ব্রাহ্ম আন্দোলন. দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজ, থিওজাফিস্ট এদের ভারতে নব-জাগরণের অবদান অনেকখানি। যেদিন নবজাগরণের এই প্রথম সারির নায়কেরা আন্দোলন গড়ে তুলেছেন সেদিনের প্রেক্ষিতে তাঁদের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথম বিদেশী আগ্রাসের ধাক্কায় তাঁরাই বুক পেতে দিয়েছিলেন। ভুল কিনা ইতিহাস বিচার করবে, কিন্তু এরাই আগামী দিনের অগ্রদূত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন—তা স্বীকার করতেই হবে। এবং এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিতে সাধনা করে পুরোপুরি দেশজ থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য অজ্ঞ ভারতবাসীর মত পুতুল পূজা করে সনাতন হিন্দুধর্মের অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে 'যত মত তত পথে' সাধনা করে প্রাচীন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে নতুন আধুনিক শিক্ষিত ভারতের সাথে মিলনের মধ্যদিয়ে ভাবের, চিন্তার সুসামঞ্জস্য নমন্বয় রূপ জগতকে উপহার দিলেন সেখানে কেউই বাদ পড়ল না।

আর্য অনার্য ভারতের কোন অংশকেই ত্যাগ করতে হলো না, উপরি দেশী বিদেশী হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই রয়ে গেলেন ভারতীয় হয়ে নিজ নিজ ধর্ম আচরণের আঙিনায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ১২ বৎসর ঈশ্বর সাধনার পর, আরো ১২ বৎসর মানব সাধনার জন্য তীর্থযাত্রা শুরু করেন। তাঁর এই পরিক্রমা প্রকৃত-পক্ষে ছিল তীর্থ পরিক্রমা, কারণ তাঁর কাছে ছিল মানুষই প্রথম ভগবান—সেই ভগবানের তল্লাসে গেলেন একের পর এক তীর্থে—এবং সেই তীর্থই নবজাগরণের ঋত্বিকরা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব চন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখরা। রবীন্দ্রনাথের

ঋষিদৃষ্টি, এই সকল তীর্থকে দেখেই বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম বিস্তৃত জীবন লীলাপথে, তীর্থগুলি নিয়েছে নতুন এক মহামিলিত তীর্থের রূপ। আসুন আমরাও শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করি।

প্রথম তীর্থ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছিল মহান প্রজ্ঞাদৃষ্টি। এই দৃষ্টি নিয়ে মানুষকে দেখতেন। দেখতেন খোলা চোখে, কি জানতে চাইতেন খোলা মনে। যিনি একদিনও ঈশ্বরকে ডেকেছেন, তা যেমন ভাবেই হোক, তিনিই তাঁর আত্মীয়। তাঁকে দেখতে ব্যাকুল হোতেন। নিজেই বলছেন মথুরা মোহন বিশ্বাসকে—"সেজ বাবুকে বল্লুম, আমি শুনেছি দেবেন্দ্রঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে, আমার তাঁকে দেখবার ইচ্ছা হয়। সেজবাবু বল্লে, আচ্ছাবাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব। গেলাম। সেজবাবু আমার কথা বল্লে, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন—ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বললুম, দেখি তোমার গা—দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে দেখলাম গৌরবর্ণ তার উপর সিঁদুর ছড়ান, তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।"

আবার বলছেন, "দেখলাম যোগ ভোগ দুই আছে; অনেক ছেলেপুলে ছোট ছোট, ডাক্তার এসেছে, তবেই হলো, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি, আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও"

তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনাল। ব্যাখ্যা ক'রতে বললাম তা বললে "এ জগৎ কে জানতো?ঃ ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য।" অনেক কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র খুশী হয়ে বললেন, আপনাকে উৎসবে আসতে হবে। আমি বললাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেবেন্দ্র বললেন, না আসতে

হবে ; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।" আমি বললাম, "তা পারবো না। আমি বাবু হতে পারবো না।"

"তারপরদিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রর চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে। অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না। (সকলের হাস্য)"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১খ ১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর)

আমরা কথামৃতের উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। দেবেন্দ্রনাথ সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। সত্যরক্ষার জন্য পিতৃঋণ স্বীকার করেছিলেন সামান্য দু-এক লক্ষ টাকা নয়, কোটি টাকা পিতৃঋণ পরিশোধ করেছিলেন সমস্ত বাধা বিপদ অগ্রাহ্য করে। সংসারে থাকলেও ঈশ্বরচিন্তা থেকে কখনো দূরে সরে যাননি। মাঝে মাঝেই নির্জনে পাহাড়ে গিয়ে কিছুকাল ঈশ্বর চিন্তায় কাটাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'জনক' আখ্যা দিয়েছেন। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র "ইসাবাস্যম ইদম্ সর্বম, যৎকিঞ্চ জগত্যাম্ জগত।....মা গৃধ্কস্য সিদ্ধনম্"—ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। অর্থাৎ জগৎ চিন্তাকে ঈশ্বর চিন্তা দিয়ে ভরে দাও। ঈশ্বরই জগত, জগতের আলাদা অস্তিত্ব নেই। তাই ভাবতে কষ্ট হয়,—সেই দেবেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করেও, পরদিন ব্রাহ্মোৎসবে আসতে বারণ করে পাঠান। ঈশ্বরই যদি মূল তখন বাধা কোথায় ? শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন দেবেন্দ্রনাথকে দেখতে, রাজা দেবেন্দ্রনাথকে নয়, অভিজাত দেবেন্দ্রনাথকে নয়, যে দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর চিন্তা করেন, তাঁকে। যদি ব্রহ্মোৎসব কেবল ঈশ্বরের স্মরণোৎসব হতো তবে বাধা কোথায় ? কিন্তু বাধা নিশ্চয়ই ছিল, আভিজাত্যের বাধা। উচ্চসংস্কৃতির বাধা, বাধা উচ্চশিক্ষার, সম্পদের, নাম কামের বাধা, লোকলজ্জার বাধা।

ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণের মত নিঃসম্বল, নিরক্ষর, আভিজাত্য বিহীন উপাধি শূন্য, সামান্য রানী রাসমনির পুরুতের তখনও প্রবেশাধিকার মেলেনি। ব্রাহ্মধর্ম তখনও উচ্চশ্রেণীর ধর্ম ছিল। মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকে বৌদ্ধিক দৃষ্টি থেকে দেখেছিলেন। উপনিষদের কাব্যমাধুর্যে মুগ্ধ ছিলেন

বেশী; উপনিষদের উপলব্ধি ছিল গোণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে দেখা, উপলব্ধি করাই সব। কেবল জানা নয়, সত্যকে, আদর্শকে বাস্তব করে তোলাই ছিল মুখ্য। নিজেই বার বার বলেছেন, দুধ দেখা এক, শোনা এক আর দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া আর এক।"

দেবেন্দ্রনাথ যখন বেদ থেকে কিছু অংশ শুনিয়ে ছিলেন—"এ জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত আর জীব হচ্ছে এক-একটি ঝাড়ের দ্বীপ,—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, আমি পঞ্চ-বটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐরকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সাথে মিল দেখে ভাবলুম, তবে তো দেবেন্দ্র খুব বড়লোক।" দেখলাম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার চেয়ে বড় নিজস্ব উপলব্ধি। যুক্তির থেকে বড় ছিল প্রত্যক্ষ।

এ আলোচনার থেকে যেন এমন কথা না ভেবে বসি, আমাদের উদ্দেশ্য কাউকে ছোট বা বড় করা। আমাদের যারা আলোচ্যব্যক্তি সকলেই প্রাতঃস্মরণীয় ও মহামানব। আমরা সমালোচনা করছি না আলোচনা করছি ইতিহাসের প্রয়োজনে।

ইতিহাসের প্রয়োজন কি তাই দেখা ও অনুধাবন করা। কোন কিছুর মূল্যায়ণ করতে তথ্যের বিকৃতি যেমন ক্ষতিকর তেমনি 'মিথ' বা অতিকথনও সমভাবে ক্ষতিকর ও মূল্যায়ণের অন্তরায়। কোন মানুষই একক ভাবে সম্পূর্ণ নয়। নাটকের এক একটি চরিত্রে যেমন নিজ নিজ চরিত্র রূপায়ণ করেন, আর নাটকের সকল চরিত্র ছোট বা বড় মিলেই নাটকের উদ্দেশ্য বা বক্তব্য রূপ গ্রহণ করে ও রসোত্তীর্ণ হয় এই মনীষী মিলনও তাই। ঊনিশ শতকে নবজাগরণের যুগে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জাগরণ হয়েছিল বিশেষ বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করতে। তাই বলতে হবে ছোট বড় নয়, বরং বলা উচিত একে অপরের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন পাঁচফুলের সাজি। নানা বর্ণের ফুলে একটি সুন্দর তোড়া সৃষ্টি হয়। আমরা আলোচনা করবো, কিন্তু সচেতন থাকবো 'মিথ' বা অতিকথনের ধোঁয়া থেকে সমসাময়িক মহামানব-দের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে।

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেছিলেন।

এবং ঐ সম্প্রদায়ের যারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তারা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মের উপাসক। একেশ্বরবাদী। এরা সকলেই শিক্ষিত পাশ্চাত্য বিদ্যার অধিকারী বিত্তশালী, এদের সাথে সম আসনে বসবার সেই যুগে ক'জনই বা অধিকারী ছিলেন। এরা অধ্যাত্ম চিন্তার যে পথ প্রবর্ত্তন করলেন, সেই যুগের সাধারণ জনগণ যারা অধিকাংশ শিক্ষাবিহীন দরিদ্র তারা প্রায় সকলেই দূরে থেকে গেলেন। সম্ভব ছিল না, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের কথা বুঝবার বা গ্রহণ করবার। এঁরা মানুষকে অবশ্য ভালবেসে ছিলেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তারা ছিলেন অভিজাত। ব্যবহার ছিল অভিভাবক সুলভ। জনগণকে নিয়ে তাঁরা কোন আন্দোলন করেন নি। করেছিলেন সমাজ সংস্কারের চেষ্টা,— স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন, তাও বিদেশী শাসকদের সাহায্যে। জনসাধারণ স্বাভাবিক কারনে-ই এদের থেকে দূরত্ব বোধ করতেন। অশিক্ষিতেরা শিক্ষিতদের সমীহ করতো কিন্তু বিশ্বাস করতো না। ইংরেজী জানা শ্রেণীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটলো সাধারণের কিন্তু এরা সকলেই চেয়েছিলেন বিশুদ্ধ ধর্ম ও আত্মার প্রকৃত মুক্তি। আন্তরিকতার মোটে-ই অভাব ছিল না। কিন্তু অন্তরায় ছিল দৃষ্টিভঙ্গির।

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কত আপনার জন ছিলেন। ১৮৭৫, ১৫ই মার্চ থেকে ১৮৮৪ জানুয়ারী পর্যন্ত অসংখ্যবার দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত ও যুবক ভক্তদের বাইরে কেশব চন্দ্র-ইএকমাত্র ব্যাক্তি যিনি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছেন। ১৮৮৩ ২৮শে নভেম্বর, কেশব পীড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখতে গেছেন। নিজমুখে বলছেন, "কেশব তোমার অসুখ হ'লে-ই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম মা, কেশবের

যদি কিছু হয় তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব, চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনে ছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়। (কথামৃত ২য় খণ্ড)

কেশবচন্দ্রের উপর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাহার জন্য ব্যাকুলতা। বেলঘরের জয়গোপাল সেনের বাগানে সশিষ্য যখন কেশব সাধন ভজন করছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৭৫ ১৫ই মার্চ তারিখে ভাগ্নে হৃদয়রামকে সঙ্গে করে সেখানে যান। কেশবের কথা তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীতে বসে-ই শুনেছিলেন। তখন কেশবের খুব নাম ডাক। দেশে বিদেশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা তথা ভারতের যুবকরা তাঁর গুনে মুগ্ধ।

১৮৭০ সালে বিলেতে গিয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন, অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ইংরাজী কাগজে লিখেছিল, "Whot Keshab Tings to-day, world will think to-morrow. ব্রাহ্ম সমাজের নেতা। বহুলোক তাঁর উপদেশে তখন জীবন গঠন করতে চেষ্টা করছেন। বেলঘরের বাগানে কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন "তোমরা কেমন করে ঈশ্বরকে ডাক— দেখতে এসেছি, তোমার নাম শুনে, কিছু বল।" ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজে দেখেছিলেন-- তখন তিনি যুবক। একটু কথাবার্তার পর কেশবকে বলেছিলেন— "তোমার-ই ল্যাজ খসেছে অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসারের বাইরেও থাকতে পার, আবার সংসারেও থাকতে পার। যেমন ব্যাঙাচির ল্যাজ খোসলে জলে-ও থাকতে পারে, আবার ডাঙাতে-ও থাকতে পারে।" বেলঘরের বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব ২৮শে মার্চ ১৮৭৫ রবিবার 'মিরর' সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, (ইংরাজীতে)

"আমরা অল্পদিন, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেল-ঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালক স্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্ত স্বভাব কোমল প্রকৃতি আর দেখিলে বোধহয় সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে হিন্দু ধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা নাহলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবিত

যোগী পুরুষ কিরূপে দেখা যাইত।"

(কথামৃত ৫ খণ্ড ১৮৮২, ২রা এপ্রিল)

১৮৮০ খ্রীঃ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমহন মিত্র কমল কুটিরে কেশব বাবুর সহিত দেখা করেন। ভারী জানিতে ইচ্ছা কেশববাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন। কেশব বাবু বললেন, "দক্ষিনেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড়লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর এত অসাধারণ ব্যক্তি ইহাকে অতি সাবধানে রাখতে হয়; অযত্ন করলে এর দেহ থাকবে না; যেমন সুন্দর জিনিষ গ্লাস কেসে রাখতে হয়।" (কথামৃত ৫ম খণ্ড ১৮৮২, ২রা এপ্রিল) এমন কথা বলা কেশব বাবু-রই সাজে অপরে কি বুঝবে যে বলবে! জহুরী-ই জহর চিনতে পারে।

১৮৭৬ জানুয়ারী মাঘোৎসবে টাউন হলের বক্তৃতার বিষয়—ব্রাহ্মধর্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি।"—(Our faith and ex-priences), তাহাতেও হিন্দুধর্মের সৌন্দর্য্যের কথা অনেক বলেছিলেন। "In the days of the Vedes and the Vedanta, India was all communion (Joga). In the days of the puranas, India was all emotion (Bhakti). The highest and the best feelings of religion have been cultivated under the guardianship of specific divinities. (Our faith and experiences. Delivered in January 1876.)

কমল কুটীরে বসে কথা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন, "নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বর লাভ হ'তে পারে; মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন ভজন করে ভক্তি লাভ করে সংসারে থাকা যায়; জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিলেন; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে দেখা দেন। তোমরা যা করো, নিরাকার সাধন সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে ঠিক বোধ করবে, ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য। ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। সনাতন হিন্দু ধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে, নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে; শান্ত, দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর। রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোঁকর আছে;

কিন্তু আর একজন তারও সাত ফোঁকর আছে, সে নানা রাগ-রাগিনী বাজায়।"

"তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই ; নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলে-ই হ'লো। তবে সাকার বাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে ডাকলে ভক্তি প্রেম আরও বাড়বে। বেদ পুরাণ তন্ত্রে এক ঈশ্বরের কথাই আছে ও তাঁর লীলার কথা, জ্ঞান ভক্তি দুই আছে। সংসারে দাসীর মত থাকবে ; দাসী সব কাজ করে কিন্তু দেশে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলে মানুষ করে। বলে আমার হরি, আমার রাম, কিন্তু জানে আমার ছেলে নয়। তোমরা নির্জনে সাধন করছ। এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করে ছিলেন, সাধন করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়।"

১লা জানুয়ারী ১৮৮১ কেশবচন্দ্র এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের অনেকে প্রতাপ, ত্রৈলক্য, জয় গোপাল সেন, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র প্রভৃতিও আছেন। কেশবচন্দ্র এসেছেন হাতে দুইটি বেল ও ফুলের একটি তোড়া।

কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঐগুলি কাছে রাখিয়া দিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর-ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতি নমস্কার করিলেন।" (কথামৃত ৫ খঃ ২০৯, ২১০) শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবকে)—কেশব তুমি কিছু বল ; এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।" কেশব (বিনীত ভাবে, সহাস্য)—এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রী করতে আসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব, গাঁজা-খোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে আমিও একবার টানলুম। (সকলের হাস্য)

কালী বাড়ীর নহবতের বাজনা শুনে বললেন, দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা। তবে কেবল একজন পোঁ করছে আর একজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগ রাগিনীর আলাপ করছে। আমার-ও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করবো, কেন শুধু সোহং সোহং করবো। আমি সাত ফোঁকরে রাগ রাগিনী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করবো।'.........আনন্দ করবো, বিলাস

করবো। কেশবচন্দ্র অবাক হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন। আর বলিতেছেন জ্ঞান ও ভক্তির এইরূপ আশ্চর্য্য সুন্দর ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই। (কঃ ৫খ ২১০) একদিন সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বরে বাঁধা ঘাটে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে কেশবচন্দ্র উপাসনা করছিলেন। "উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেছেন তোমরা বলো "ব্রহ্ম আত্মা ভগবান" "ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ" "ভাগবৎ ভক্ত ভগবান।" কেশবাদি ভক্ত ব্রাহ্ম ভক্তগণ চন্দ্রালোকে ভাগিরথী তীরে সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল মন্ত্র ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন, বলো— "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব।" তখন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, মহাশয় এখন অতোদূর নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন বেস, তোমরা (ব্রাহ্মরা) যতদূর পারো তাহাই বলো।" (কঃ মৃঃ ৫খঃ পৃঃ ৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি) তোমরা বলো, জগতের উপকার করা। জগৎ কি এতটুকু গা। আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাকে সাধনার দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পারো নচেৎ নয়। (কঃ মৃঃ ১খণ্ড ১৮৮২, ২৭ অক্টোবর) একজন ভক্ত। যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম ত্যাগ করবো? শ্রীরামকৃষ্ণ। না; কর্মত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বর চিন্তা তার নাম গুণ-গান, নিত্য কর্ম। এসব করতে হবে।

ব্রাহ্মভক্ত। সংসারের কর্ম? বিষয় কর্ম? শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ তা-ও করবে। সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্মগুলি নিষ্কাম ভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর আমার বিষয় কর্ম কমিয়ে দাও। কেন দেখছি বেশী কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। (কঃ মৃঃ ১খণ্ড ২৭ অক্টোবর ১৮৮২)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও ধর্মালোচনা কেবল উনবিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বকালের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কেশবচন্দ্রের নানা সময়ের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে কত উচ্চ

ধারণা তিনি পোষণ করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ছাড়া, তখনকার যুগে আর এমন কেউ ছিলেন না যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকারী। জহুরী জহর চিনতে পারে! বেগুনওয়ালা জহরের মূল্য কি বুঝবে? তেমনি কেশববাবু সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের, তা বহুভাবে প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি। বলেছেন, 'কেশব কলির জনক'। অশ্বিনী দত্তের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'কেশব দৈবী মানুষ।' এই মহা-মিলনের সূত্র কোথায়? এই ভাবনা সেই যুগের মানুষকে বিশেষ করে নাড়া দিয়েছিল। দিয়েছিল কথামৃতকার মাষ্টারমশায়কে। মাষ্টারমশায় কৃতি ছাত্রই ছিলেন না, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। ছিলেন কেশবচন্দ্রের গুণমুগ্ধ। তিনি এই মিলনের দৃশ্য বর্ণনা করছেন কথামৃতের ১ম ভাগ ১৮৮২, ২৭ অক্টোবরের দিনলিপিতে; একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে উপস্থিত। কেশবের শিষ্যরা প্রণাম করিয়া বলিলেন, ''মহাশয় (শ্রীরামকৃষ্ণকে) জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে। চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন; কেশববাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। নৌকায় উঠিয়া-ই বাহ্যশূন্য সমাধিস্থ। মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়াই এই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। তিনি বেলা তিনটার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন ও তাঁহাদের আনন্দ। শুনিবেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধু চরিত্র ও বক্তৃতাবলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকে-ই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন। কেশব ইংরাজী পড়ালোক; ইংরাজী দর্শন সাহিত্য পড়িয়াছেন; তিনি আবার দেবদেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন। এইটি বিস্ময়ের ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোনখানে বা কেমন করিয়া হইল এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকে-ই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন কিন্তু আবার সাকার বাদী। ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী

প্রতিমার সম্মুখে ফুল চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য গীত করেন। খাট-বিছানায় বসেন, লাল-পেড়ে কাপড় জামা, মোজা জুতা পরেন কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকার বাদী, স্ত্রী লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেকচার দেন, সংবাদপত্র লিখেন, বিষয় কর্ম করেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষ মাপিবার একটি দণ্ড—ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, ঈশ্বরকে যে জীবনের আদর্শ করেছে সেই তার আপন-জন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ঠাকুর তাঁকে কাপ্তেন ডাকতেন, নেপালের রাজকর্মচারী অনুযোগ করছেন. কেশববাবু ম্লেচ্ছ, নিজের মেয়ের অন্য জাতের সাথে বিয়ে দিয়েছেন, আপনি কেন তাঁর বাড়ী যান, তাকে অত ভালবাসেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বলছেন, "কেন, তুমি যে পয়সার জন্য খোসামোদ করার জন্য লাট্ সাহেবের বাড়ী যাও তখন? কেশবভক্ত, ঈশ্বরকে ডাকে। যে ঈশ্বরকে ডাকে তার কোন জাতপাত নেই, তার কোন কিছুতেই অপরাধ হয় না।"

নাই বা কেশব প্রতিমা মানলো, নিরাকার তো মানে। সাকার নিরাকার দুই-ই পথ। এ ব্যবস্থা ঈশ্বরই করেছেন। ঈশ্বর কি জানেন না তাঁকে ডাকছে। ঈশ্বরের কাছে যাবার অনন্ত পথ আছে! যেমন—এই রাসমণির কালিবাড়ীতে প্রবেশ করার অনেক দুয়ার আছে। পথগুলি ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর লাভের উপায়। উপায় নিয়ে বাতবিতণ্ডায় লাভ কি? তিনি বলতেন, ডুব দাও, ডুব দিলে রত্ন মিলবে। উপর উপর ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মধর্ম ছিল মূলত সামাজিক ধর্ম, অধ্যাত্ম সাধনার প্রেরণা ছিল গৌণ। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। "সাকার মানো আর না মানো টানটুকু নিও।" শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন থেকে কেশবচন্দ্র নিলেন—ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, যুক্তি যা ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বড়। শিক্ষা মানুষ সকল অবস্থায়ই করতে পারে। শিক্ষার স্থান কাল পাত্র নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন— যাবৎ জীবি, তাবৎ শিখি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন হৃদয়ের কপাট খুলে দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্রকে, কেশবচন্দ্র তেমনিই মনের জানালা—

দুয়ার খুলে গ্রহণ করেছিলেন যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, লভ্য কাম্য। আদান আর প্রদানের মধ্যেই তো জীবনের প্রবাহ তা না হলে জীবনে দল বাঁধে। সংকীর্ণতাই মৃত্যু। সম্প্রসারণই জীবন। এখানে ছোট বড় নেই। আছে মিলনের আনন্দ। বৃথা তর্ক, বৃথা দ্বন্দ্ব, কে বড় কে ছোট, কে কার শিষ্য, কে কার গুরু! এই দুটি জীবনের মিলনের মধ্যে ভাবীকালের ভাব সমন্বয়ের, ধর্ম সমন্বয়ের এক কথায় বিশ্বধর্মের সোনার সুতোটি খুঁজে পাই। ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব নয়, কাটাকাটি নয়, ধর্মে সহাবস্থান। সকলেই ধর্ম করছে, ঐ অনন্ত ঈশ্বরের দিকে নিজের নিজের ক্ষমতা মত এগিয়ে যাচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত এই ধর্ম সমন্বয়ের একটি অয়েল পেণ্টিং করিয়েছিলেন। তার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও আরও সমকালীন ধর্ম, যেমন চিত্রিত ছিল, তেমন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ স্বরূপ কেশবচন্দ্র। কেশববাবু ঠাকুরকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "এর মধ্যে আপনিও আছেন।" —এঁদের উভয়েরই চিন্তা ছিল লোক কল্যাণ এবং তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা তাঁরা করে গেছেন। কেশব-চন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের দুই স্ফুট, কালের প্রয়োজনে প্রকাশমাত্র- মূলত সচ্চিদানন্দই, আলাদা কিছু না।

বারো বছর সাধনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ঐ দক্ষিনেশ্বরে মা ভবতারিনীর মন্দির চত্ত্বরে। যতদিন সাধনা পূর্ণ হয়নি, এই চত্ত্বরের বাইরে যান নি। সাধনার জগতের মধ্যেই নিবিষ্ট ছিলেন। বাইরের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এক চিন্তা, জগতের মাকে লাভ করতে হবে তা না হলে কিসের কি? তাঁর শ্রেষ্ঠ কথা আগে ঈশ্বর তারপর তাঁর জগৎ। তাঁকে জানলে তিনিই সব জানিয়ে দেবেন, তাঁর কত ঐশ্বর্য আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদিও বেদ উপনিষদে বা সকল শাস্ত্রে আছে কিন্তু ক'জন সেই দৃষ্টি নিয়ে জীবন জিজ্ঞাসায় অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান—বেদ পুরাণ সকল ধর্ম সকল শাস্ত্র থেকে নিজে সাধনা করে সকল মতে, মানুষের চোখের সামনে এনে দাঁড় করালেন, স্পষ্ট সহজ সরল ভাষায় বললেন সব ধর্ম সত্য' কিন্তু তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল।

দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে নাও দেখবে ঈশ্বরই জগত হয়ে আছেন।

একথা মানুষকে বলতে হবে, বলার জন্য তাঁর জন্ম কর্মসাধনা কিন্তু কেমন করে হবে! মা আমাকে নিয়ে চল, অন্যরা কেমন করে তোকে ডাকে। পণ্ডিতরা কেমন করে ডাকে। তিনি নিজে মতলব করে কিছুই করেন নি। জগদম্বার হাতের যন্ত্র, যেমন ছিলেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের। এক কথা, মা আমি কি জানি—সব তুই জানিস। গ্রাম্য পরিবেশ থেকে এসে, গ্রাম্য ঐতিহ্য নিয়ে, সনাতন হিন্দু ধর্মের সহজ পথে জগৎ রহস্য উদ্ধার করলেন। বলতেন, আমি তো মুখ্যু, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই শান্তিরাম সিং। তবে এত সব বলে কে? মা এমন একটি ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলেন, যাকে দেখলে জানলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল তত্ত্বটি উদ্ঘাটন করা যাবে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সভ্যতা, কৃষ্টি, বিদ্যা সামাজিক আচার ব্যবহার সব জানা যাবে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলতেন,—মেয়েরা একটি ভাত টিপে এক হাঁড়ি ভাত সিদ্ধ হলো কিনা বলতে পারে।—এও তেমনি। শ্রীকেশব নবজাগরণ যুগের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক, প্রতিনিধি। এই মহামিলনের মধ্যে কেশব পেলেন আধ্যাত্মিক প্রেরণা, দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা, নতুনত্ব; আর শ্রীরামকৃষ্ণ পেলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বহির্জগতের আনন্দ আস্বাদ ও বাঁচার প্রেরণা। কারো তাবেদার না হয়ে নির্ভীক হয়ে মাথা তুলে, ঈশ্বরের সন্তান হয়ে। "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—বাঁচবে অমৃতের পুত্র হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র জগতকে ঈশ্বরকে দেখেছিলেন দুটি কোণ থেকে। কিন্তু বিষয় বস্তু ছিল অভিন্ন।

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীদয়ানন্দ সরস্বতী ॥

নবজাগরণের হাওয়ায় যখন ভারতের নানা প্রদেশ উদ্বেলিত, সেই সময় উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দ হিন্দু ধর্ম রক্ষা ও পুণর্জীবনের জন্য এক নূতন আন্দোলন শুরু করেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্ম ১৮২৪ খ্রীঃ। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র গুলে খেয়ে ছিলেন। হিন্দু ধর্মকে বিদেশী ও বিকৃত দেশী ভাবধারা থেকে

রক্ষা করার জন্য আর্যসমাজ নামে এক সম্প্রদায় গঠন করেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যেমন বেদকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেও নিজ নিজ ধ্যান ধারণার দ্বারা কাট্ ছাট্ করে হিন্দু ধর্মের গ্লানি মুক্ত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, পণ্ডিত প্রবর দয়ানন্দজীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। মানতেন বেদ একমাত্র ধর্মশাস্ত্র। কিন্তু একটা কথা তিনি বলতে ভোলেননি, বেদের সেই ভাষ্য-ই গ্রহণীয় যে ভাষ্য স্বয়ং দয়ানন্দ সরস্বতীর সাথে মিলবে। ঋষিদের উপলব্ধি তাঁর নিজের ভাষ্যের সাথে না মিললে তাকে নেয়া চলবে না।

যুগ যুগ থেকে বৈদিক, উপনিষদিক যে ধর্ম ও তার পরবর্ত্তী কালের পৌরাণিক যুগের মানুষের দেবতা, শিব-কালী, রাম, কৃষ্ণ ও অজস্র দেবদেবী—দয়ানন্দজী তাঁর কলমে তাদের সকলকে বাতিল করে দিলেন—একমাত্র সর্বেশ্বর ঈশ্বর পূজার পাত্র, আর কেউ নয়। আর এই চিন্তা ধারার সাথে সামিল করে সমাজ সংস্কার করতে হবে। সমাজ সংস্কার চাই-ই তা-নাহলে নবজাগরণ কোথায় হলো ? বিশুদ্ধ বেদ বিধৃত ধর্ম থাক্ সমাজ সংস্কারের দ্বারা-ই ধর্ম গ্লানিমুক্ত হবে। আধ্যাত্মিকতা নয়, মূল কথা সমাজ সংস্কার। তবে বলেছেন বেদে সকলের অধিকার থাকবে, জাতি প্রথা থাকবে না, অবাধ বিবাহ এসব তিনি মানতেন।

ভারতের ভূগোল ও ইতিহাসের সামান্যতম ধারণা যার আছে তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, ভারত এক বহু সংস্কৃতির বহু জাতির বহু ধর্মের মিলনস্থান। এখানে আর্য আছেন অনার্যও আছেন। এখানে দ্রাবিড়, হূন, বহু উপজাতি অনন্তকাল থেকে বাসা বেঁধে আছেন। তাদেরও ধর্ম বেদ-বিধৃত—যুগ যুগ থেকে এরা ও ভারতের আর্যদের সুখ দুঃখের অংশীদার। এমনি সংস্কৃতির ও ধর্মের মধ্যে গড়ে উঠেছে মহাভারত। আর্যসমাজ করে পণ্ডিতজী আর্যকে আহ্বান করলেন, বাদ পড়ে গেল ভারতের বহু মানুষ। হ'লো সাম্প্রদায়িক ধর্ম। অনেক সম্প্রদায় ছিল আর একটি যুক্ত হলো তার সাথে মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে পণ্ডিতজীর সাক্ষাৎকার বড়-ই সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এখন সে কথাই বলবো।

ইং ১৮৭৫ খ্রীঃ কোন এক সময়ে কলকাতায় ঠাকুরদের নৈনালের

প্রমোদ-কাননে যখন বাস করছিলেন তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নেপালের রাজ-কর্মচারী বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সাথে পণ্ডিত দয়ানন্দকে দর্শন করতে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটি বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন চাতকের মত কেশবের জন্য ব্যস্ত হতে লাগল। খুব পণ্ডিত। বাঙলা ভাষাকে বলতো "গৌড়াণ্ড ভাষা"। ঈশ্বর মানতো। তা বলতো ঈশ্বর এত জিনিষ করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না? নিরাকারবাদী কাপ্তেন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) "রাম" "রাম" কচ্ছিল, তা বললে তার চেয়ে "সন্দেশ" "সন্দেশ" কর। (কঃ মৃঃ ২খণ্ড ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর)

যে সময়ের কথা বলছি তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, কেশবচন্দ্র বা দয়ানন্দজীর মতো ডাক সাইটের নন। পণ্ডিতজী কেশববাবুর জন্য ব্যস্ত হবেন তাতে আশ্চর্য কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাণের টানে পণ্ডিতজীকে দেখতে গিয়েছিলেন। পণ্ডিতজী হিন্দু ধর্মকে পাশ্চাত্য ভাবধারার হাত থেকে বাঁচাতে একটা পথ বের করেছেন। উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু যে হিন্দুধর্মের পুণর্জীবন চাইছিলেন সেই ধর্মের মর্ম-কথায় যে উপলব্ধি গভীরতা ও ব্যাপ্তি সে সম্বন্ধে খুব বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অবশ্য বলেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখলে বুঝতে পারা যেত না, পণ্ডিতরা কেবল শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিচার করেই মত্ত, আর ইনি শাস্ত্র মন্হন করে তার থেকে সার বস্তু মাখন খেয়েছেন। শাস্ত্রে যে সমাধির কথা আছে, আমরা তা নিয়ে তর্ক করি ইনি সমাধিতে ডুবে আছেন। এই পার্থক্য।" উপলব্ধি যে হিন্দুধর্ম, শাস্ত্রের মর্মকথা এটি জেনেও সেই পথে গেলেন না। নিলেন বিচারের পথ। লোককে বুঝিয়ে দেওয়ার পথ। তা-ও এমন ভাষায় এমন সাম্প্রদায়িক ভাবে যে, ভারতের জনসাধারণ কোনটা বুঝতে পারল না। শ্রীরামকৃষ্ণের মূল কথা, শাস্ত্র পাঠ বা মৌখিক বিশ্বাসে ধর্মীয় জীবন পূর্ণতা পায় না, ধর্মকে জীবনে বাস্তবরূপ না দিলে তা ধর্ম হয় না। ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন-ই যার কাছে গেছেন, তিনি তার সামনে রেখেছেন তাঁর নিজের জীবন। তাঁর জীবন পড়তে কোন

ভাষা বা কোন বিশেষ গুণের প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই এ জীবনের আকর্ষণ সকলে অনুভব করেন। তাঁর সঙ্গ-গুণে, জীবন স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়। মানুষ নিজেকে উন্নততর মনে করে, হয় ভয় শূন্য, নির্দ্বন্দ্ব।

দয়ানন্দজীও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি ধন্য, বুঝতে ভুল হয়নি শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করে যা লাভ করেছেন, কোন বাইরের বিদ্যা তা দিতে অসমর্থ। এ জিনিষ করে নিতে হবে, কেউ কাউকে দিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের মত পণ্ডিত বা দার্শনিক ছিলেন না কিন্তু ধর্মের সত্য, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করা, এটি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধিকে সহজ কথায় অনাড়ম্বর ভাবে ও সহজ ভাষায় মানুষের হৃদয়ঙ্গম করাতে পেরেছেন। সকল জাতের মানুষকে কাছে টানতে পেরেছেন। মানুষকে মানুষ জ্ঞানে গ্রহণ করতে পেরেছেন, বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত না করে। তিনি ধর্মের সকল গণ্ডী ভেঙ্গে দিলেন, হিন্দুধর্মের মূল সত্য-কে উন্মোচন করে। মানুষ আর ঈশ্বরের একত্বকে সাধনার দ্বারা প্রমাণ করলেন, পরীক্ষা করে দেখালেন যে, মানুষ যে যেখানে যেমন ভাবে ঈশ্বরকে ডাকে, পূজা করে, ঈশ্বর তা জানেন। যদি ভুল থাকে তিনি শুধরে দেবেন। চাই আন্তরিক ডাকা। সকল পূজাপদ্ধতি তা আর্যের হোক বা অনার্যের হোক, হিন্দুর হোক, বা মুসলমানের হোক বা খৃষ্টানদের হোক, তা অনুসরণ করে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। আমার-টা সত্য অপরেরটা ভুল। আমার পথ অনুসরণ না করলে ঈশ্বর লাভ হবে না, এই বুদ্ধিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মতুয়ার বুদ্ধি বলেছেন। ভুল বলেছেন। বলেছেন এই সংকীর্ণভাব থেকে-ই ধর্ম জগতে হানাহানি, হিংসা দ্বন্দ্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন তাই নতুন বেদ হয়ে দাঁড়ালো, যেখানে সকলের আশ্রয় আছে। সকল ধর্মের লোক এসে বললেন, "তুমি আমাদের।" পণ্ডিতজী প্রভৃতি ধর্মীয় চিন্তা নায়করা উপলব্ধি-হীন শাস্ত্রকে মেনে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম একমাত্র উপলব্ধি। শাস্ত্র কেবল ঈশ্বরের খবর দেয়। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা-ই ধর্ম। ধর্মকে আন্দোলন করে বাঁচা যায় না। ধর্ম জীবন-ই ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও ধর্মকে বাঁচাবার পথ। তাই শ্রীরাম-কৃষ্ণ জীবন শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ।

।। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর মহাশয় ।।

বাংলা নবজাগরনের যুগে একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে প্রায় ১৫/১৬ বৎসরের বড়। পাশাপাশি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে ছিলেন। কথায় বলে বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম কামার পুকুর, বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে। বর্ণপরিচয় পর্যন্ত্য যার বিদ্যা তাঁরাও চিরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে ঋণী থাকবেন। বলতে গেলে তিনিই বাংলার ছেলেমেয়েদের বর্ণ-মালার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এমন লোকের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক শুনে থাকবেন। বিদ্যাসাগরের অশেষ গুণ আর সেই গুণের কথা ফুলের সৌরভের মতই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ গুণগ্রাহী ছিলেন. বলতেন, যাকে লোকে গোনেমানে তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। শ্রীযুক্ত কেশব-চন্দ্র সেনের সাথে পরিচয়ের পর বিদ্বান, পণ্ডিত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সাথে মিলবার কৌতুহলবোধ করেন। দেখতে চাইতেন যাচাই করে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন। তাঁরা জীবন সমস্যাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। জীবন-সমস্যা সমাধানে কোন পথ নিয়েছেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কথামৃতকার ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮২ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরের স্কুলের মাষ্টার। এ যেন সোনায় সোহাগা। মাষ্টারকে বললেন, "আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ।" মাষ্টার সেই কথা বিদ্যাসাগরকে বলিলেন। "বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন, একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া পরে থাকেন?" মাষ্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুদ পুরুষ। লাল পাড় কাপড় পরেন জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালী বাড়ীতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তাপোষ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা মশারি আছে,

সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই। তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁহারই চিন্তা করেন।

১৮৮২ ৫ই আগষ্ট "ঠাকুর (গৃহে) প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগরকে পূর্ব পরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।" ঠাকুর তাঁর গুণমুগ্ধ। অনেক গুণ। প্রথম। বিদ্যানুরাগ। দুই॥ দয়া সর্ব জীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। তিন॥ স্বাধীনতা প্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে এক মত না হওয়াতে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের (Princip 1) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ॥ লোকাপেক্ষা করিতেন না। পঞ্চম॥ মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার) না আস তা হলে আমার ভারী মন খারাপ হবে। তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহে মার কাছে গিয়ে উপস্থিত। বললেন মা এসেছি।"

এবার কথা শুরু—এ যেন এক অপূর্ব নাটকের সংলাপ। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এ জাতীয় সংলাপ আসেনি। তাই একটু কথোপকথন না উল্লেখ করে পারা যায় না।

দৃশ্য॥ দেখিতে দেখিতে একঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ:—"আজ সাগরে এলাম। এতদিন খাল বিল হৃদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।" (সকলের হাস্য)। মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিরক্ষর। পাঠশালার দু পাতার বিদ্যা গ্রাম্য সংস্কৃতি। ভাষা চাল চলন বেশ ভূষা আদব কায়দা সম্পূর্ণ দেশজ ও গ্রামীণ। কিন্তু কথার গভীরতা ও ভাষার ঔজ্জ্বল্য অসীম। এ ভাষা খোসামুদের ভাষা নয়—সহজ সরল আন্তরিকতায় ভরা। একটি কথায় বুঝিয়ে দিলেন, আমি তোমাকে তোমার মত করেই নিয়েছি। [illegible]ই তুমি অসাধারণ, সাগরের [illegible] গম্ভীর অসামান্য।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বলেন—"তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।" বিদ্যাসাগর হারার পাত্র নন, সঞ্চয় তাঁর অনেক। রামকৃষ্ণের বিদ্যার ভাঁড় শূন্য তা জানেন—দেখছেন তাঁর কথার কতটা ধরতে পেরেছেন। কথাটা বিনয় নম্র বটে কিন্তু দাগ কাটা কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না গো, নোনা জল কেন ? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! ক্ষীর সমুদ্র, (সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগর—"তা বলতে পারেন বটে।" চুপ করে রইলেন। কথা টানতে পারলেন না। এ সংলাপ থেকে কি কেউ মনে করতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাবুদ্ধি কারো থেকে কম! বিদ্যাসাগরের সাথে সমান তালে কথা বলছেন। নির্ভয়ে। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কথা বলছেন, "তুমি বিদ্যা দান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হবে। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিস্কাম নয়। আর সিদ্ধত তুমি আছো।" অল্প কথাতে এমন করে বিদ্যাসাগরের প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরেন নি কেউ। "সিদ্ধ" কথাটি বিদ্যাসাগর মহাশয় ধরতে পারলেন না. জিজ্ঞাসা করছেন—মহাশয় কেমন করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) আলু পটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া। উপমা শুনে বিদ্যাসাগর একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, কথাটা কি ঠিক হলো ? সব সিদ্ধ বস্তু কি নরম হয় ? কলাই-ডাল বাটা সিদ্ধ তো শক্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়ার পাত্র নয় বুঝিয়ে দিলেন, আমার কথা তুমি জেনে শুনেও অন্য অর্থ করতে চাইছ। আমি বলতে চাইছি, শুধু পণ্ডিতগুলো দড়কচা পড়া, তা তুমি নও। "দড়কচা" অর্থাৎ উপরে নরম দেখতে হলেও ভেতরে শক্ত অর্থাং কেবল বই পড়া পণ্ডিত ; উপরেই পণ্ডিত কিন্তু ভেতরে কোন সার নেই। তুমি তেমন পণ্ডিত নও। বই পড়া পণ্ডিত যাদের কোন আদর্শ নেই, বিবেক বৈরাগ্য নেই তারা শকুনির মত। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে, যারা শুধুই পণ্ডিত, তারা শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি। কিন্তু তোমার

কত গুণ, দয়া ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর কেবল যে মহা পণ্ডিত ছিলেন তা নয়। তিনি নিজেকে প্রকৃত হিন্দু মনে করতেন. দেশের ও জাতির প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল। হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদির কর্ম সমস্ত করতেন। গলায় পৈতে ব্যবহার করতেন। চিঠিপত্র যা লিখতেন তাতে 'শ্রীশ্রীহরি শরণম্' শিরণামাতে লিখতেন। হিন্দু সংস্কারে ও কর্মে অবিশ্বাস ছিল না। হিন্দুদের দেবদেবীকে পুতুল বলতেন না, বরং শ্রদ্ধাই করতেন, কিন্তু এত করেও আশ্চর্য বোধহয় ভাবতে, তিনি হিন্দু দর্শনকে তেমন বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, আমার বোধহয়—ওরা (দার্শনিকরা) যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।' ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "তাঁকে জানবার যো নাই।" অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মানবতাবোধ, হৃদয়বত্তা, ষড়দর্শন পাঠ করেছেন, হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্র পড়েছেন কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়। বস্তু জগৎ সর্বস্ব নয়, তার পিছনে ব্রহ্মসত্ত্বা আছেন. এইটি বৈদিক সত্য, উপনিষদিক সত্য, পৌরাণিক সত্য। এর বাইরে হিন্দু আর কিছু বলেন নি। ঋষিরা যুগ যুগ ধরে এই সত্যকেই উপলব্ধি করেছেন, সাধনা করে প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই ধর্ম, আর সব-ই বাহ্য। এটি আর্য সত্য। মানুষ জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই, যাকে জানবার যো নেই তখন ঈশ্বর ঈশ্বর না করে, আমার মতে মানুষের কর্ত্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিৎ যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিৎ যাতে জগতের মঙ্গল হয়!" শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে থেকেই কথা বলছেন—সংসারে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে। বিদ্যা-অবিদ্যা ব্রহ্মের। কিন্তু বিদ্যা অবিদ্যার পর ব্রহ্ম। জগতে জ্ঞান ভক্তি আছে আবার কামিনিকাঞ্চনও আছে, সৎও আছে অসৎও আছে। ভাল আছে মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে তাঁর ওতে কিছু হয় না। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। কিন্তু সাপের কিছু হয় না। যদি বল

দুঃখ-পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি ? ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ব্রহ্মকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করে না।

আবার বলছেন, ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, বেদ-পুরাণ তন্ত্র ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। আজ পর্যন্ত্য কেহ মুখে বলতে পারে নাই ব্রহ্ম কি ? শাস্ত্র বলেছেন ব্রহ্ম-অনির্বচনীয় ; অব্যপদেশ্যম। The unknown and unknowable. বিদ্যাসাগর —(বন্ধুদের প্রতি) বাঃ ! এটি তো বেশ কথা ! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন, তুমি যে জানার কথা বলছো, মানুষ মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি, যে যত-ই বড় হোক না কেন, তাঁকে কি জানবে ?

তবে বেদে পুরাণে, ঋষিরা কি মিথ্যে কথা বলেছেন ? না। সে কিরকম জান ? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে—‘ও ! কি দেখলুম ? কি হিল্লোল কল্লোল ? ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে তিনি আনন্দ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ।

সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় : ব্রহ্মদর্শন হয়, সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না। একটি অপূর্ব উপমা দিয়ে বক্তব্য বোঝালেন, “লুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপ্‌তে গিছলো। (সকলের হাস্য) যাই নামা অমনি গলে যাওয়া, কে খপর দিবেক ?” একজন প্রশ্ন করলেন—সমাধিস্থ ব্যক্তি যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তিনি কি আর কথা কন না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মশায়কে বলছেন,—শংকরাচার্য লোক শিক্ষার জন্য বিদ্যার ‘আমি’ রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘি-র কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে তখন আবার কলকলানি। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোক শিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসেন, আবার কথা কন।

ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল, সেই উপলব্ধির কথা-ই তাঁরা শাস্ত্রে বলেছেন। এমনিতে কি হয়? দেখা, শুনা, ছোঁয়া এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখতো। ঋষিরা তবে-ই ব্রহ্মকে বোধে বোধ করেছিল। জ্ঞানী যারা কেবলই বিচার করে, "নেতি নেতি" করে, বিষয় বুদ্ধি সব ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্ম জানতে পারে। কিন্তু আর একজন আছে, বিজ্ঞানী যিনি বিশেষ রূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন ছাদ যে জিনিষে তৈয়ারী সেই ইঁট চূণ সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারী। "নেতি" "নেতি" করে যাকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে, তিনি-ই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেই চলেছেন, "দেখ্ না, এই জগৎ কি চমৎকার কত রকম জিনিষ চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড় ছোট, ভালমন্দ, কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।" বিদ্যাসাগর মশায় আর চুপ থাকতে পারলেন না, মনে হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ বোধহয় জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘন করছেন। কার সামনে কথা বলছেন ঠিক স্হির করে উঠতে পারেন নি। সহজ বুদ্ধিতে যেটি বোঝা যায় সেটাও নিজের বক্তব্যের ঝোঁকে হারিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন। ফেলাই স্বাভাবিক। এর পূর্বে কি কখনো এমন ব্যক্তির সম্মুখীন হয়েছেন? যাদের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ এতদিন কথা বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন তারা তো গলবস্ত্র দলের লোক। তাঁর অনুগত ভক্ত চেলা। বা তাঁর কৃপাকটাক্ষের ভিখারী। ভাললোক ঈশ্বর ভক্ত, কিন্তু জ্ঞানের এলাকায় তাদের কতটুকুই বা অধিকার! বিদ্যাসাগর পূর্বে-ই শুনে নিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ রাসমণির পুরুত, এখন ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল।

বিদ্যাসাগরের মনে হলো ঈশ্বর তো সমদর্শী, সকল শাস্ত্রে ই বলেছেন। এ যে নতুন শুনছেন ঈশ্বর কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। ঈশ্বরেরও তবে বৈষম্য দোষ আছে? ঈশ্বর তবে তো মানুষের মতই দোষে গুণে মেশান। মানুষ থেকে ঊর্দ্ধে নন। ঈশ্বর তো জানতুম, "অশেষ কল্যাণ গুণ সম্পন্ন নিখিল হেয় গুণ বর্জিত। তবে যে ইনি বলছেন শক্তি বিশেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশ জনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। বিদ্যাসাগর মশায় ভাবছেন, এ কি কথা। কথাটা ঠিক মনমত হলো না, কেমন যেন ঠিক উত্তর হ'লো না। উত্তর দিতে হয় দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি মধুর আসর উপযোগী কথা পাড়লেন, বিদ্যাসাগরের বিদ্যাবুদ্ধির সাগর ছেঁচা কথা— বলতো, তা-না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন তীক্ষ্ন বাক্যবাণ। "তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তুমি কি অদ্ভুদ কিছু যে তোমাকে আমরা দেখতে এসেছি। আমরা দেখতে এসেছি কারণ, তোমার দয়া, বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ কথা মানো কি না?" বিদ্যাসাগর কথা শুনে হাসছেন। এ হাসির একটা-ই অর্থ আমি সত্যই মুগ্ধ। এমন করে মুখের মত জবাব আজ পর্যন্ত কেউ বিদ্যাসাগরকে দিতে পেরেছে কি না জানা নেই। বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। কতগুলি বই পড়লে কি হবে? বুদ্ধি ক্ষেত্রে কিছু উন্নত হতে পারে কিন্তু মানুষ জীবনের একটা মূল লক্ষ্য আছে, প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক জীবনের ঊর্দ্ধে, পারমার্থিক জীবন। তুমি তো অবশ্য-ই গীতা পড়েছো! গীতার অর্থ কি বুঝেছো—কেবল কবিত্ব নয়, সাহিত্য নয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের দয়িত সঙ্গীত। গীতায় মানুষের জন্য একটা অমূল্য বানী আছে, সেইটি জানতে হবে। কেবল শব্দার্থ নয়, মর্মার্থ। গীতার শিক্ষা—"হে জীব সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা কর।" সাধুই হোক. সংসারীই হোক, মন থেকে সব আশক্তি ত্যাগ করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি কাজের প্রতি পদক্ষেপের বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং সেটা এক কথাতেই বলা চলে—ঈশ্বরকে জানতে হবে। আর সেই কথাই তিনি নানা জনে নানাভাবে বলছেন। মনে হচ্ছে এঁরা—যেন সবাই সেই অমূল্য কথাটি ভুলে গেছেন—স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই নিজে যেচে এসেছেন বিদ্যাসাগরকে দেখতে। মানুষ 'আমি অহংকারে' ফুলে আছে, আমি বিদ্বান পণ্ডিত, ধনী, মানী

জ্ঞানী অমুকের ছেলে উপাধিগুলি 'আমি' অহংকারকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে, প্রকৃত 'আমি' কি 'আত্মসত্তা' কি, মূলত জীবনের অর্থ কি কেউ খোঁজে না। বিদ্যাসাগর উপযুক্ত ব্যক্তি, একটু নেড়ে চেড়ে দিলে-ই হয়তো আপন সত্তা ফিরে পেতে পারেন, কারণ তাঁর আছে রজগুণের সত্ত্ব। কত ভাল ভাল কর্ম করেছেন। বিদ্যা কত গুণ। 'আমি' ও 'আমার' এই দুটি অজ্ঞান। এটা ওটা না জানা অজ্ঞানতা নয়। 'আমার বাড়ি, আমার টাকা' আমার বিদ্যা আমার এসব ঐশ্বর্য, এই যে ভাব এটি অজ্ঞান থেকে হয়।

হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর এসব তোমার জিনিষ। বাড়ি, পরিবার ছেলেপুলে, লোকজন বন্ধুবান্ধব এসব তোমার জিনিষ এভাব জ্ঞান থেকে হয়। মরার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন—পাড়াগাঁয়ে বাড়ি। কলিকাতায় কর্ম করতে আসা। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে তেমন বিশ্বাস নেই, ধারণাও ভাসাভাসা কাজেই বিশ্বাস হবে কি করে? নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যতটুকু ভাবা যায় ততটুকুই জানা।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন—"আচ্ছা তোমার কি ভাব? আমি আমার ভাবের কথা বললাম। তুমি তো কত বড় পণ্ডিত, কত পড়েছ, শুনি, কিছু বল।" বিদ্যাসাগর মশায়, পরিবেশের ঊর্দ্ধে উঠতে পারলেন না। হয়তো ভাবছিলেন,—কি আর বলবো? এরা কি আমার কথা শোনার উপযুক্ত? লজ্জা তো হতে ই পারে। এমন সব কথা শ্রীরামকৃষ্ণ এক ঘর লোকের সামনে বলে-ই বা ফেল্লেন কেমন করে। একটুও ভাবলো না! আবার হয়ত ভাবছেন, গ্রামের লোক, সামান্য পূজারী শিক্ষা তো নেই, সৌজন্যবোধ পাবে কোথায়? অহংকারে অবশ্যই লাগতে পারে, বিদ্যাসাগরের মনের কথা জানতে চাইছে সামান্য পুরুত! যার এতটুকু সময়, কাল, পাত্র ভেদ জ্ঞান নেই তাকে বলে-ই বা লাভ কি? বরং এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কথাটা এড়িয়ে গেলেন—"আচ্ছা সে হবে অন্য একদিন—এখন বরং যা বলছেন বলুন; আমার কথা—সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলবো।"

বিদ্যাসাগর কথাটা কালের কোলে ঠেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বুঝলেন এই তো মানুষের অবস্থা। মনের কথা খুলে বলার মত মানসিকতারও অভাব।

বিদ্যাসাগর মশায় শাস্তির ভয়ে, পাপের ভয়ে ঈশ্বরের কথা, শাস্ত্র আলোচনা করতে নারাজ ছিলেন, বলতেন নিজে জানি না আবার অপরকে বলে তার জন্য পাপ কে কুড়বে—বাবা দরকার নেই বলে কয়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ মনের কথা বুঝে বলছেন—তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক। বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়। "যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তাহ'লে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক কিছুতেই ভয় নেই। আর ভাব ভক্তির মানে তাঁকে ভালবাসা। যিনি ব্রহ্ম তাঁকেই মা বলে ডাকি। তুমি যেসব কর্ম করছো, এসব সৎ কর্ম। যদি 'আমি কর্ত্তা' এই অহংকার ত্যাগ ক'রে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তা'হলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। নিষ্কাম কর্মে চিত্ত শুদ্ধি হয়।

বিদ্যাসাগরের হৃদ্যবত্তা, মানবতাবাদের কথা অনেক শুনেছেন ঠাকুর, কিন্তু কোথায় একটু ফেঁসোতে আটকে আছে। সূঁচের মধ্য দিয়ে সুতো যাচ্ছে না। যার জন্য এত কর্ম করা সেটির দিকে লক্ষ পড়ছে না। এতো দয়া, দান পরোপকার করেও কেন তবে ঈশ্বরের দিকে মন যাচ্ছে না? নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে—আর নিষ্কাম যদি না হয়, মান যশের যদি সামান্য এষণা থাকে, ঈশ্বর দূরে। এই সাবধানবানী শাস্ত্রের সকলের জন্য। বিশেষ করে কর্মযোগীদের জন্য। কর্ম উদ্দেশ্য নয়, কর্ম উপায়। কর্ম করতে জগতে আসা নয়, মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা। নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করছেন, যিনি চন্দ্র, সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু

ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজের-ই মঙ্গল করবে।

এ যা বল্লুম বলা বাহুল্য—"আপনি সব জানেন—তবে খপর নেই।' অপূর্ব ব্যঞ্জনা। বাহুল্য কারণ—আপনি অনেক বড় পণ্ডিত এসব কথা শোনেন নি তা নয়। কিন্তু শব্দার্থ জানলেও, মর্মার্থের জন্য কখন-ই সাধনা করেন নি। কারণ এতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। শাস্ত্র বাক্য সাধনা না করলে বোঝা যায় না। ঈশ্বর উপলব্ধির বস্তু—অতিন্দ্রীয় জ্ঞান। তাই বলছিলাম, মানুষের অন্তরে সোনা আছে—আপনার অন্তরে সোনা চাপা আছে খপর পাও নাই। একটু "মাটি চাপা আছে যদি একবার সন্ধান পাও অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থ্যের বৌয়ের ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে, ঐটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া। সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। তুমিও যদি একটি বার তাঁকে অন্তরে আছেন, বিশ্বাস কর দেখতে পাও—এত সব কাজ ভাল লাগবে না। তাই আরো বলি এগিয়ে যাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শেষ। এত সময় সকলে অবাক ও নিস্তব্ধ হয়ে এসব কথা শুনছিলেন। আশ্চর্য, এসব কথা কে বলে? বিদ্যাসাগর মশায় কটাই বা কথা বললেন। অবশ্যই বিস্ময়বোধ করেছেন, এমন দাগ কাটা কথা বলে কে? তবে কি বাগ্‌বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে বসে বিদ্যাসাগর মশায়কে উপলক্ষ্য করে জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলছেন? এবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন, বিদ্যাসাগর মশায়কে নিমন্ত্রণ করছেন, একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান, ভারী চমৎকার জায়গা। বিদ্যাসাগর মশায় বললেন -যাবো বই কি, আপনি এলেন আর আমি যাবো না? শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি! ছি! অদ্ভুদ কথার ভঙ্গিমা ও গভীরতা। কেন এমন কথা বললেন আমায় বুঝিয়ে দিন, বিদ্যাসাগর বললেন। মনস্তত্বের দিক থেকে কপিল মুনিকেই এতকাল শ্রেষ্ঠ বলে এসেছে সকলে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকেও যেন ডিঙিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগরের মনের অতলে যে ভাবটি আনাগোনা করছিল তাকে সোজা গিয়ে ধাক্কা দিল,—আমি কে, আমি কি আপনার উপযুক্ত ব্যক্তি বা তেমন

কেউ, যে আপনি আগ্রহ করে যাবেন! আমরা অতি ক্ষুদ্র জেলেদের ছোট ডিঙি, খাল, বিল আবার কখনো কখনো বড় নদীতে যেতে পারি কিন্তু আপনি যে জাহাজ, অত জল কি আমাদের ঘাটে আছে—ভয় হয় যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। আটকে যায়। ঐ চড়া আর কিছু না, মানুষের অহংকার। এগিয়ে যাবার বাধা। পথের বিরাট বাধা, খুব কম ব্যক্তিই অহংকারের হাত থেকে রেহাই পায়। ঈশ্বরকে জীবনের লক্ষ্য বস্তু না করলে, জগতের নাম, কামগুলি, আমি একটা কেউকেটা এ ভাব এলে সর্বনাশ। তবে একথাও বললেন, যদি এই নবানুরাগের সময়, গরম গরম যানতো যেতে পারেন কিন্তু দু দিন বাদেই অনুরাগ শুকিয়ে যাবে তখন অহংকার কচুরীপানার মত জল ঢেকে ফেলবে। মনকে আচ্ছন্ন করবে, তখন, মান অপমান নানা কচুরীপানা এসে জুটবে। সত্যিই বিদ্যাসাগর মশায় আর যেতে পারেন নি। জাহাজ-বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণ ঘাটে যেতে পারেননি। যাহোক একটা কিছুতে আটকে গিয়েছিলেন। পরবর্ত্তী সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্র মাষ্টারকে দুঃখ করে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর কথা রাখেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ মন মুখ এক করেই কথা বলতেন, বলতেন সত্য কথাই তো ব্রাহ্মণের ধর্ম, পৈতে প্রভৃতি তো বাইরের।

দেখতে হবে এই দুটি বিরাট ব্যক্তিত্বের মূল পার্থক্য কোথায়? দুজনের মধ্যেই জীবন জিজ্ঞাসা, সমাজ চিন্তা ছিল, মানবতা হৃদয়বত্তা ছিল কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে দেখেছিলেন, সমাজকে দেখেছিলেন তাঁর মূল কথা ছিল—ঈশ্বর বিধৃত মানবতা, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যে মানবতা তা অহংকার আনে। নিষ্কাম কর্ম করতে দেয় না, সেখানে হৃদয়ের স্পর্শ থাকলেও হৃদয়ের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগর মশায়ের মানবতাবাদ সমাজকেন্দ্রিক ছিল। ভারতীয় দর্শনের চেয়ে তাঁর পাশ্চাত্য দর্শন ও যুক্তি বিচারের উপর ছিল বেশী আস্থা। কিন্তু বিধবা বিবাহের মত সামাজিক আন্দোলনে সুবিধা মত হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তির সহায় গ্রহণ করেছেন, শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম গ্রহণ না করে। অপরদিকে শ্রীরাম-

কৃষ্ণ কোন সামাজিক আন্দোলন করেন নি। সভা-সমিতি বক্তৃতা তো দূরের কথা। তিনি যা করেছিলেন তা হলো ধর্ম সাধনাকে, ভারতীয় উচ্চ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লৌকিক জীবনের সাথে, দৈনন্দিন সংস্কার বিশ্বাস ধ্যান ধারণার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

সনাতন ধর্ম সাধনার মধ্য দিয়ে লোক চেতনার গভীর ভাব উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই কারণেই সামাজিক কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁকে কোন আন্দোলনে নামতে হয়নি। জীবন সাধনার ও আচরণের মধ্যেই ছিল সমস্যার সমাধান। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ছিল বিদ্রোহী চেতনা—সমাজের কোন অকল্যাণকর আচার আচরণকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি, বরং রুখে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু সে দাঁড়ানো ছিল কোন আন্দোলন না, জীবন সাধনা।

শিশু বয়সে পৈতের সময় পারিবারিক ও সামাজিক সকল রকম প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নীচুজাত ধনী কামারণীর হাত থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন আজ তা ভাবাও যায় না। যখন কোন ব্রাহ্মণই কৈবর্ত্তের অন্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, হাঁড়ি হাঁড়ি প্রসাদ জলে ফেলে দিতে হতো, তখন তাঁর দাদা ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কৈবর্ত্তের অন্ন গ্রহণ করেছেন। মাথার চুল দিয়ে ঝাড়ুদারের পায়খানা পরিস্কার করেছেন। মুসলমানকে গুরু করেছেন, নামাজ পড়েছেন, চার্চে গেছেন কিন্তু রাসমণির কালী বাড়ীতে বাস করেছেন, কালী ঘরে গিয়ে মা ভবতারিণীকে অন্নভোগ দিয়েছেন। আইন করে আন্দোলন করে সমাজ সংস্কার কঠিন কিন্তু জীবন চর্চার মধ্যে আদর্শকে পালন শ্রেষ্ঠ সংস্কার। ভারতীয় ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে সেই সুউচ্চ মহান আদর্শের উপর। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। আচার নয়, অনুশাসন নয়, সংস্কার নয়, জীবন। জীবন সত্ত্বার বিকাশই শ্রেষ্ঠ সংস্কার। তাই ধর্ম সাধনাই শ্রেষ্ঠ আন্দোলন। এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কথা। মানুষের মুক্তি সংস্কার দ্বারা সম্ভব নয়। নবজাগরণের প্রবক্তাগণ ঐ পথেই খুঁজেছিলেন মানব মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে ফিরিয়ে দিলেন মোড়, মানুষের আত্মসত্ত্বা জাগরণের পথই প্রকৃত মুক্তির পথ।

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত শশধর ॥

ইং ১৮৮৪, ২৫শে জুন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠনঠনিয়াতে প্রায় বেলা ৪টার সময় এসে উপস্থিত। শ্রীযুক্ত ভূধর চ্যাটার্জীর বাড়ী, পণ্ডিত শশধর এখানে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কথা অনেক শুনেছেন দক্ষিণেশ্বরে বসে। পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। খুব নাম, বক্তৃতা শোনার জন্য খুব ভীড় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন শুনে গৃহস্বামী তার আত্মীয়গণ ও পণ্ডিত শশধর নিজেও তাঁকে অভ্যর্থনা করতে দুয়ারে এসেছেন। বর্ণ উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ বললে-ই হয়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বয়স প্রৌঢ়। পণ্ডিত অতি বিনীত ভাবে ভক্তি ভরে ঠাকুরকে প্রণাম করে ঘরে নিয়ে বসালেন। অন্যান্য ভক্তরাও সকলে বসলেন। সকলেই কান খাড়া করে আছেন কথামৃত পান করবেন। ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্র রাখাল, রামদত্ত, মাস্টার ও অনেকে আছেন—"ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হ'লেন। কিছুক্ষণ পর সেই অবস্থায় হাসতে হাসতে বলছেন, "বেশ! বেশ! "আচ্ছা তুমি কিরকম লেকচার দাও? বলো।" শশধর—"আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।" ঠাকুর ভাবে বলছেন, "মা। সেদিন বিদ্যাসাগরকে দেখালি তারপর আমি আবার বলেছিলাম, মা, আমি আর একজন পণ্ডিত দেখবো, তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাচন চলে না। আজকাল ফিবার মিকশ্চার। কর্ম করতে যদি বল তো নেজা মুড়া বাদ দিয়ে বলবে।

আবার বলছেন, হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকেদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেয়ালের কিছু হবে না। তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি

ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।"

পণ্ডিত শশধরকে বলছেন, "বাবা আর একটু বল বাড়াও, আর কিছুদিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠতে-ই এক কাঁদি! তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এসব করছ।" [এই বলে-ই ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতেছেন] বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। ফুরায় না। মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তাহ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে। তাই জিজ্ঞাসা করছি, কোন আদেশ পেয়েছ কিনা? পণ্ডিত—"না, তেমন কিছু পাই নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ—তাই বলছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলে প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গান ধরলেন, "ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্ন ধন।"

এ সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নেই। এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বরের প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি—সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্ন হও। তখন আদেশও পাবে, লোক শিক্ষাও হবে। দেখ অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে এ সাগরে পড়তে পারলে-ই হ'ল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে। অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী, ঠাকুর তাঁকে বোঝাচ্ছেন, "যাহারই নিত্য তাঁরই লীলা—যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি-ই লীলার জন্য নানারূপ ধরেছেন। অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে, তপস্যা না করলে—ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রে যা আছে সেইসব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। চিঠির কতটুকু দরকার? চিঠিতে কি লেখা আছে জেনে নেওয়া পর্যন্ত, পড়ার চেয়ে শুনা ভাল—শুনার চেয়ে দেখা ভাল, গুরু মুখে বা সাধু মুখে শুনলে—আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। শাস্ত্রে অনেক কথা তো আছে; ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-

কার না হ'লে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে চিত্ত শুদ্ধি না হলে সবই বৃথা।

শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কতদিন? যতদিন ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হয়। ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। যেমন প্রহ্লাদ নারদ ও শুকদেব। এবারে জ্ঞানী কে, বিজ্ঞানী কে বলছেন—জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম। জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে। কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা।

ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুণ আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেবলে রাঁধা খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায় কাম ক্রোধাদির আকার থাকে মাত্র। বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে—তাইত এরূপ এলানো ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। পণ্ডিত এতক্ষণে বললেন—এটি বুঝলাম না। শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ—নেতি নেতি বিচার করে সেই নিত্য, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছয়। তাঁরা এই বিচার করে—তিনি জীব জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পৌঁছে আবার দেখে তিনি এইসব হয়েছেন—জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

জ্ঞানযোগ এ যুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ—তাতে আয়ু কম। আবার দেহ বুদ্ধি কোনমতে যায় না। এদিকে দেহ বুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারী কঠিন। জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, জ্ঞান-ও পাবে। জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার ধোঁকার টাটি। আর এক জন জবাব দিয়েছিল—এ সংসার মজার কুঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি। এটি বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষ রূপে সম্ভোগ করেছে। বিজ্ঞানী আর কে?

ঠাকুর নিজের কথায়ই বলছেন—এই দেখ কেমন মজায় আছি—আমি কিছু জানি না আমার মা সব জানেন—আমি খাই দাই আর মজা লুটি।

জ্ঞানীর কিছুতে-ই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ করেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে—আলাপ করেছে। ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে। তাঁকে চিন্তা করে, অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, আবার মন লয় না হলে-ও লীলায় মন রেখেও আনন্দ। শুধু জ্ঞানী এক-ঘেয়ে কেবল বিচার কচ্ছে, এ নয়, এনয়, এসব স্বপ্নবৎ। আমি দুই হাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই। ঠাকুর আবার বলছেন, জ্ঞানীর লোকমান্য হবার কামনা, জ্ঞানীর মুক্তি কামনা এসব থাকে বলে দু-হাত তুলে নাচতে পারে না। নিত্য লীলা দুই নিতে পারে না। আর জ্ঞানীর ভয় পাছে বদ্ধ হই। বিজ্ঞানীর ভয় নেই।

আমি কাঁদতাম আর ব'লতাম, মা, বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হ'ক।

পন্ডিত—তবে আপনারও বিচার বুদ্ধি ছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ একবার ছিল।

পণ্ডিত—তবে বলে দিন কেমন করে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে চাইতে হয়। তখন যে যা চায়, তাই পায়। আগে তাকে লাভ করতে হয়, তারপর তিনি বলে দেবেন।

কি জান—শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নেই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসব এসে পড়ে। উপায়- বিবেক, বৈরাগ্য আর ঈশ্বরে অনুরাগ। কিরূপ অনুরাগ ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল যেমন ব্যাকুল হয়ে—বৎসের পিছে গাভী ধায়।

পন্ডিত—বেদে ঠিক অমনি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদো আর বিবেক বৈরাগ্য এলে যদি কেউ সর্বত্যাগ করতে পারে- তা হলে সাক্ষাৎকার হবে। ভাব-অভাব সব-ই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।

পন্ডিত—কিরূপ ভক্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিন রকম। ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

ভক্তির সত্ত্ব—ঈশ্বর-ই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপনে ভালবাসে—হয়ত মশারীর ভিতর ধ্যান করে কেউ টের পায় না। সত্ত্বের সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব হ'লে ঈশ্বর দর্শন আর দেরী নাই।

ভক্তির রজঃ, যাদের হয় তাদের একটু ইচ্ছা হয়, লোকে দেখুক

আমি ভক্ত। সে আড়ম্বর করে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তা ইত্যাদি। ভক্তির তমঃ—যেন ডাকাত পড়া ভক্তি—মুখে মারো লোটো, উন্মাদের ন্যায় বলে, হর হর, ব্যোম ব্যোম, জয় কালী। মনে খুব জোর জলন্ত বিশ্বাস।

বলতে বলতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গান গাইছেন—আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

"আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী।"

গান শুনে পন্ডিত শশধর কাঁদছেন। পন্ডিত গলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—একদিনে-ই dilute হয়ে গেছে। শশধর পণ্ডিতমশায় জ্ঞান পথের পথিক, শুষ্ক বিচার করেছেন এতদিন। শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ তর্কের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের পুরাতনপন্থী। বলতেন, হিন্দুধর্মের মধ্যে যেসব অনুষ্ঠান হোম, যাগযজ্ঞ, মূর্ত্তি পূজা, আছে সব ঠিক। সাধকের জন্য প্রয়োজন। পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য তিনি challenge হিসাবে ধর্মকে, শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে এসে মাত্র তিন দিন সাক্ষাৎএর পর তিনি বুঝতে পারলেন, ধর্মকে বাইরের ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। প্রথম চাই যিনি ধর্ম বা শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা হবেন তাঁর ধর্ম উপলব্ধি। শাস্ত্র তো প্রথম এই কথাই বলেছেন। আগে সত্যকে জানো। যুগে যুগে ঋষিরা তাই করেছেন—বেদ বলছেন, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" যাকে জানলে সব জানা যায়, তাকে আগে জানো তখন তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা হয় দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই তো ব'লছেন, একটু বল বাড়াও, তারপর যত ইচ্ছা বক্তৃতা করো। ঠিক কথা। পণ্ডিত প্রাণ খুলে দিয়েছেন। আজ বুঝতে পারছেন ঠাকুরকে দেখে আনন্দময় পুরুষ যাকে দেখলেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হচ্ছে। সামান্য উদ্দীপনায় যিনি সমাধিতে চলে যাচ্ছেন—এ দুর্লভ অবস্থা-ই তো কাম্য। বলছেন, কি হলে এ আনন্দ লাভ হবে বলুন, আমি জ্ঞানচর্চা করে শুষ্ক কাঠ হয়ে গেছি, আমাকে কৃপা করুন। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতের বিনয়, তার বিবে

বৈরাগ্য দেখে খুশী হয়েছেন। তাকে আশীর্ব্বাদ করছেন—বলছেন, "আন্তরিক হলে হয়ে যাবে।" পণ্ডিত শশধর মুগ্ধ। শাস্ত্র জীবন্ত দেখলেন আর নিয়ে গেলেন অনন্ত জীবনের সাধনার ফল, মূর্ত্তিমান ধর্মজ্ঞান। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এক পণ্ডিতকে দেখেছিলেন, শশধরের মধ্যে দেখলেন বিবেক বৈরাগ্যবান পন্ডিত, কেবল শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত নয়। বিদ্যাসাগর মশায়ের ধর্মের প্রতি ছিল স্বজাতি প্রীতি, সামাজিক মানবতাবোধ আর তার সঙ্গে ছিল বিদেশী জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতার আকর্ষণ। শশধর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ছিলেন, যে ধর্ম সংস্কারে ব্রতী হয়ে ছিলেন তা ছিল একান্ত আন্তরিক। মানুষের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ ছিল উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর জিজ্ঞাসা ছিল না, কিন্তু মানুষের কল্যাণ, মানুষের দুঃখে সমবেদনায় তার হৃদয় ছিল উদ্বেলিত। বিদ্যাসাগর মশায়—সমাজ সংস্কার কাজের মধ্যে, পরোপকারের মধ্যে আত্মভাব বিকাশের অনুসন্ধান করছিলেন, ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী ছিলেন না। এই ছিল দুই পণ্ডিতের পার্থক্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এই কারণে মাকে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরকে দেখালি আর একজন পণ্ডিত দেখতে ইচ্ছা ক'রছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছিলেন,উপলব্ধিহীন শাস্ত্র, শাস্ত্র নয়। যুক্তি নয়, প্রত্যক্ষই ছিল তাঁর কথা।

শশধর পণ্ডিতমশায় এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে স্পষ্ট চাক্ষুষ সাক্ষাৎ করে গেলেন, ঈশ্বর দেখা যায়, তিনি কথা বলেন, তিনি সাক্ষাৎ হয়ে আদেশ দেন, তখনই লেকচার, ব্যাখ্যা ঠিক ঠিক হয়, তা না হলে কিছুই হয় না। আর তাঁকে দেখার উপায় হিসাবে বললেন,—"বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি।" বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ—এই উপায়। বিবেক না হলে কথা কখনও ঠিক হয় না।

পণ্ডিত শশধর মশায় যেমন করে নিজেকে খুলে ধরতে পেরেছিলেন, বলতে পেরেছিলেন, শাস্ত্র বলেছেন, ঈশ্বর "রসবৈস্বঃ কিন্তু আমি তো জ্ঞানচর্চা করে কাঠ হয়ে গেছি। সেই আনন্দ কেমন করে পাবো? আমি যে পুড়ে গেছি। ঠাকুর, বলছেন, নাগো না, ভাল ভাজা হয়েছে, এখন দু-চার দিন ভক্তি রসে

রেখে দিলেই রস বসবে ভাল। ঈশ্বরের আনন্দরস আস্বাদন করতে পারবে।

বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু নিজেকে খুলতে পারেননি, মনের ভাব মনেই আটকে রাখলেন। ঠাকুর শশধর পণ্ডিত মশায়কে বলে-ছিলেন, "মা কৌশল্যা মনের ভাব খুলে বল", তবে তো রোগের চিকিৎসা হবে। বিদ্যাসাগর মশায়কেও তেমনি বলেছিলেন—"তোমার মনের ভাবটি বল। ভিতরে সোনা চাপা আছে তোমার খপর নাই।" বিদ্যাসাগর মশায় বললেন—সে আর একদিন একলা একলা বলবো। আজ থাক। আর বলা হয়নি, এমনি-ই হয়। ক্ষণের গুণ তো আছেই। কথায় বলে, যা হয় না ধনে জনে, তা হয় ক্ষণের গুণে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে যেচে গিয়ে ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর দয়ানন্দ ও শশধর পণ্ডিত প্রমুখ মনীষীদের কাছে। তিনি ছিলেন জগদম্বার হাতের যন্ত্র। জগদম্বা যেমন ভাবে যখন যে সাধনার প্রয়োজন মনে করেছেন, প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করে সকল মতের সকল পথের সাধনা করিয়েছেন। এখন তিনি আবার তাঁর নিজ ইচ্ছায় নূতন এক প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণের মনের মধ্যে জাগিয়ে, বিশ্বধর্ম স্থাপনের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ধর্ম নায়ক সমাজ নায়ক, বিদ্বান বিশিষ্ট মানব দরদী পণ্ডিত, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পণ্ডিত পাশ্চাত্য শিক্ষায়, দর্শন ও বিজ্ঞানে পারদর্শী বিদগ্ধজনের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন।

চিন্তা নায়কেরা দেখবেন, একটি সম্পূর্ণ গ্রাম্য মানুষ কোটি কোটি জন-সাধারণের মতই যিনি অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রামীণ ঐতিহ্য সংস্কৃতি ত্যাগ না করে উচ্চশিক্ষিত উচ্চ সংস্কৃতির সামিল হতে পারেন। তারা দেখবেন, ভারতের বেদ উপনিষদের পৌরাণিক ধর্ম কেমন করে এমন দেব-মানব সৃষ্টি করতে পারে।

তারা দেখবেন সাধারণ পূজা, হোম-যাগ-যজ্ঞ, নৈবেদ্য ঘণ্টা নাড়া ভুল না, ধর্মের সহায়। তারা দেখবেন প্রত্যয়হীন শাস্ত্র বিশ্বাস ধর্ম নয়। ধর্ম তর্ক বিচার বক্তৃতা নয়, ধর্ম প্রত্যক্ষ বস্তু। ধর্ম উপলব্ধি, বাস্তবতার রূপ না নিলে ধর্ম পূর্ণতা পায় না। তাঁরা দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উৎস কোথায়? দেখবেন কেমন করে লেখা-পড়া না শিখে সকল শাস্ত্রের সকল দর্শনের, সকল ধর্মের এমন কি ইসলাম, খৃষ্টধর্মেরও মর্ম কথা আহরণ করেছেন। সরল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করে ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব কেবল শিক্ষিতকে নয়, অশিক্ষিত, ছেলে বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ যে যেমন ভাবে এসেছেন সকলকে-ই তার মত করে বিতরণ করেছেন, আর তারা মুগ্ধ তৃপ্ত হয়ে বলে যাচ্ছেন আপনি আমাদের লোক। গণ্ডী ভাঙ্গা মানুষ। সকলে-ই অবাক হচ্ছেন। কি যাদু মন্ত্রে, তিনি এত নির্ভীক নির্দ্বন্দ্ব। বিনা দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে কথা বলছেন, শ্রেষ্ঠ বক্তা ব্রাহ্মনেতা কেশব চন্দ্রের সাথে, কথা বলছেন, আর্য সমাজের দয়ানন্দ সরস্বতীর সাথে, দেবেন্দ্রনাথের সাথে, বিদ্যাসাগর শশধর পণ্ডিতের সাথে। কে এ ব্যক্তি? এ কথা অবশ্য-ই বাংলার নবজাগরণের নায়কদের মনে হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই যেমন বলতেন আমি মুর্খোত্তম। শম্ভু মল্লিক বলতো "তুমি তো ঢাল নেই, তরোয়াল নেই শান্তি-রাম সিং"। কিন্তু এসব কথা বলে কে? এ প্রশ্নের উত্তর ঠাকুর যেমন দিয়েছেন আমরা আমাদের বর্ত্তমান বক্তব্যের উপসংহারে বলবো। উপস্থিত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার আলোচনা করবো।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্রের সাথে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার দৈব নির্দ্দেশে-ই হয়েছিল। ইং ১৮৮৪ ৬ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত অধর সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তার সোভাবাজার বেনেটোলার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ঠাকুরকে। অধর পাড়া প্রতিবেশী ও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রন করেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধরের বন্ধু। মনে হয় ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ও আর আর বন্ধুরা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথা অধরের মুখে শুনে থাকবেন। তাদের কৌতূহল পরমহংস দর্শন করবেন। যাচাই করে দেখবেন খাঁটি কি মেকী। বলতে গেলে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র এদের মধ্যমণি, সুসাহিত্যিক রাজ-

কর্মচারী ডেপুটি, সমাজে তখন তাঁর যথেষ্ট নাম। অধরও আজ সুযোগ পেয়েছেন, যাঁর কথা এতকাল বন্ধুদের কাছে বলেছেন, তাঁকে তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে দুর্লভ মানুষটিকে দেখিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করবেন। এতকাল মানুষ কেবল শাস্ত্রে ঈশ্বরের কথা পড়েছেন আজ তাঁকে চাক্ষুষ দেখে জীবন সার্থক করবেন। জীবন্ত শাস্ত্র বিগ্রহ মাটির পৃথিবীতে দেখবেন। ঠাকুর অধরের কাছে যত বড়, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ততোধিক প্রতিষ্ঠালব্ধ সমাজে।

ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার Renascant Indiaতে সেই দিনের বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন, তিনি কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর বিচক্ষণ পণ্ডিত-ই ছিলেন না—"The other extreme of this Neo—Hinduism is represented by Bamkim Chandra Chatterjee, perhaps the greatest intellectual giant of this period. He openly attempted a re-examination, a reinterpretation and a re-adjustment, of our old theology and ethics in the light of the most advanced modern thought and in accordance with the new rules of literary critisism and Scriptural—interpretation that had been so powerfully influencing current religious life and thought of christendom itself." (Dr. Ramesh chandra Majumder, Renacent India. Page 136)

হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের তখন পুরো ভাগে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অনেক বই লিখেছেন। সকলে-ই উদ্‌গ্রীব শুনিবেন ঠাকুরের সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা। বঙ্কিমচন্দ্রেরও বহুদিনের ইচ্ছা তিনি নিজে ঠাকুরকে পরীক্ষা করে দেখবেন। অধর যে সব কথা বলে, কতটা সত্য। যথার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ কিনা? অধর বঙ্কিমবাবু-র সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন,—মহাশয় ইনি ভারী পণ্ডিত, অনেক বইটই লিখেছেন, আপনাকে দেখতে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে)—বঙ্কিম? তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো?

শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ কেবল অপূর্ব ই নয়, গভীর অর্থবহ।

ঝক্‌ঝকে কথা। কেশববাবু-কে প্রথম বলেছিলেন, তোমার-ই ল্যাজ খসেছে। বিদ্যাসাগর মশায়কে বলেছিলেন এতকাল হুন্দ খাল বিল, নদীতে গেছি এবার সাগরে এলাম। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র খুব গভীরে যেতে পারলেন না। নেহাৎ-ই হালকা ভাবে উত্তর দিলেন। চটুল কথাতে—হাসতে হাসতে আর মশায়, জুতোর চোটে, সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু মানুষ মেপে-ই কথা বলেছিলেন, সুসাহিত্যিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিচক্ষণ পণ্ডিতকে। আশা করেছিলেন উপযুক্ত একটি উত্তরের। তা যখন এলো না—নিজেই বললেন—না আমি সে কথা বলিনি; তুমি তো 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখেছো। অনেক শাস্ত্র পড়েছো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন, শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। প্রেমে মানুষ গলে যায়, নরম হয়। জুতোর ঘা তুমি খেতে যাবে কেন? তুমি কি তাই? তুমি কত মানী-জ্ঞানী। বিদ্যাসাগরকে দেখে-ই বলেছিলেন, তুমি সিদ্ধ আছো-ই। আলু পটল যেমন সিদ্ধ হলে নরম হয়, তুমি মানুষের প্রতি দয়ায় গলে আছ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গুণগ্রাহী, মানুষের ঈশ্বর সত্বার সাথে ছিল তাঁর সম্বন্ধ। মানুষের গুণ টেনে-ই কথা বলতেন। মানুষের মধ্যে-ই যে সোনা আছে, হয়তো কিছু মাটি চাপা আছে, সেই সন্ধান তিনি জানতেন বলেই, সকলের মধ্যে সেই সোনা আছে এ খবর দেবার জন্যই তিনি জনে জনের কাছে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর যখন-ই কথা বলেছেন, তাঁর সন্ধানী চোখে তাই দেখতেন এবং স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলতেন না। জীব আত্মা-পরমাত্মার-ই অংশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় অলঙ্কার মাধুর্য দুই আছে। বঙ্কিমবাবু সুসাহিত্যিক হলে কি হবে, তেমন কথা কিন্তু তার মুখ থেকে বার হলো না। কথায় না আছে চটক্‌ না আছে মাধুর্য্য। মামুলি কথা। হয়তো ভেবে নিয়েছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত—শিক্ষা বা কাল-চার কোথায় পাবে? তার সাথে জ্ঞানের কথা কি আর বলবেন। কিন্তু ইনিই— শ্রীরামকৃষ্ণ যথার্থ মহাপুরুষ কিনা মাপতে এসেছেন। কোন্‌ মাপ কাঠিতে মাপবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন, এর মধ্যে অধর বঙ্কিমাদি বন্ধুগণ

পরস্পর ইংরাজীতে আস্তে আস্তে কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য এড়ায়নি। সহাস্যে বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করছেন কি গো? আপনারা ইংরাজীতে কি কথাবার্তা করছো?

অধর উত্তর দিলেন—কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা-ই হচ্ছিল। শ্রোতা প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষিত, কালচার্ড সুরুচি সম্পন্ন তাই শ্রীরামকৃষ্ণ, ছোট একটি গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; যখন কেউ কথা বলে, তার কথা শুনতে হয়, যদি কথা বলতে হয়, তিনি যে ভাষা বোঝেন সেই ভাষাতে-ই কথা বলতে হয়, তা না হলে দৃষ্টি-কটু হয়। সুরুচির পরিচয় দেওয়া হয় না। একটা গল্প বলি শোন—একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। কামাতে কামাতে বাবু-র একটু লেগে ছিল। বাবু ড্যাম (Damn) বলে উঠলেন। নাপিত ড্যামের মানে জানে না। রেগে হাত গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি এখন বল। মানে আর কি, এমন কিছু নয়, সাবধানে কামাও। নাপিত ছাড়বার পাত্র না; সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তা হলে আমি ড্যাম আমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম, আর ড্যাম মানে—যদি খারাপ হয়, তা হলে তুমি ড্যাম্ তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম।

সকলেই হেসে উঠলেন বটে কিন্তু মনের কোণে একটু আঘাত না লেগে কি পারে? এমন সূক্ষ্ম সুরুচি যা উচ্চশিক্ষিত মানুষ জানলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আনতে পারে না কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মত গ্রাম্য সংস্কৃতির মানুষ বুঝতে ভুল করেন না। আধ্যাত্মিকতা-ই বলো শিক্ষা-ই বলো বা কালচার-ই হোক তাতো ব্যবহারেই সার্থকতা, নচেৎ তার মূল্য কি? আমি জানি অনেক কিন্তু ব্যবহার নেই। তার মূল্য নেই।

এবারে বঙ্কিমবাবু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন, মশায়, আপনি প্রচার করেন না কেন? একই কথা কেশববাবু বলেছিলেন। বলেছিলেন বরিশালের অশ্বিনী দত্ত মশায়। যুগের হাওয়াই ছিল, কেবল লোককে বুঝিয়ে দাও, লেকচার দাও। কেবল শাঁক ফোঁকো, মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা হোক বা না হোক। ঠাকুর যেমন বলতেন নিজে প্রস্তুত না হয়ে অপরকে শিক্ষা দিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। ঢোরা সাপ কোলা ব্যাঙ ধরেছিল—গিলতে পারে

-না ওগরাতে পারে না। উভয়ের-ই বিপদ। কেবল প্রচার! যে বস্তু প্রচার করবো তার সাথে দেখা নেই। তাতেই দ্বন্দ্ব বিবাদ, হানাহানি। "আমি," "আমার" গণ্ডী সৃষ্টি। আমারটা ভাল তোমার-টা মন্দ তারপর বিবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—প্রচার? ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনি-ই (ঈশ্বর) করবেন। যিনি চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা? তিনি সাক্ষাৎ হ'য়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তা না হলে তুমি বকে যাচ্ছ দু-দিন লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি। সাধন করে শক্তি বাড়াতে হয়, তা-নাহলে প্রচার হয় না। আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে।

মুস্কিল হল এই মহাপুরুষ মাপতে এসে প্রকৃত মাপবার মত প্রশ্ন অর্থাৎ মৌলিক কোন জিজ্ঞাসা এখন পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু করে উঠতে পারেন নি।

কথা যা হচ্ছে তার সিংহ ভাগ শ্রীরামকৃষ্ণ-ই বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করে-ই কথা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন, আচ্ছা আপনি-ত খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছ, আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

কথা শুনে মনে হলো বঙ্কিমবাবু আকাশ থেকে পড়লেন, যেন পরকাল কথাটা আজ-ই নতুন শুনলেন। সত্যিই কি তাই? না, তাঁর হিন্দু ধর্মে, হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকলেও সে বিশ্বাসে আস্থা কম। হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্মবাদ আছে, কর্মফল আছে, কাজে-ই পরকাল আছে। মানুষ আজ যা হয়েছে তা তার নিজের কর্মফল, কাল যা হবে তাও তার কর্মফল। হিন্দু ধর্ম এটা বিশ্বাস করে। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো বিশ্বাস করেন না। কেশবচন্দ্রও পরকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু অবাক বোধ করেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ মনের বিশেষজ্ঞ। মানুষের মনের সামান্যতম চিন্তাকেও তিনি বুঝতে পারেন. প্রশ্ন যত-ই চটুল হোক না কেন, উত্তর কিন্তু গম্ভীর ভাবে-ই দিলেন; বলছেন তুমি যত-ই বিস্ময় প্রকাশ করোনা কেন—পরকাল আছে-ই মানুষ জীবনের

উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা। কিন্তু যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সিধোনা ধান ক্ষেতে পুঁতুলে কি হবে? ফল হয় না। এতো অপূর্ব কথা হচ্ছে কিন্তু বঙ্কিমবাবু, মনে হচ্ছে ঠিক কথার পর্দায় উঠতে পারছেন না, কিছুটা তাচ্ছিল্যে কিছুটা বিদ্যার অহংকারে। ভাবছেন এসব গূঢ় তত্ত্ব তাকে শেষপর্যন্ত্য পুরুতের কাছে শিখতে হবে। তার কি দর্শন পড়া কিছু কম আছে? দেখিনা কতদূর পর্যন্ত দৌড় অধরের অশিক্ষিত গ্রাম্য গুরুর। মনস্তত্ত্ব কিন্তু অন্য কথা বলে। যে গম্ভীর সুরে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন, কথা দিয়ে যত হাল্‌কা করতে চেষ্টা করুন না বঙ্কিমবাবু কথার তীক্ষ্ণতা অন্তরে প্রবেশ করে অবশ্য-ই নতুন মানসিকতার সূচনা করছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এমন সব অবস্হায় কথা দিয়ে মুখ রক্ষা করা যায় কিন্তু নিজেকে বেশীক্ষণ ভুল বোঝানো যায় না। নিজের অসারতা নিজের কাছে বড় করে ধরা পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু একটুও অবস্হাকে ঝুলতে দিচ্ছেন না। বঙ্কিমবাবু প্রথম থেকে-ই হাল্‌কা হাসি ঠাট্টার আসরে পরিণত করতে চাইছেন। এতকাল অনেক আসরে তিনি মানুষকে তার পাণ্ডিত্যে, সাহিত্যে জ্ঞানে মুগ্ধ করেছেন, আজ কিন্তু পান্ডিত্যের আলো চাঁদের সামনে জোনাকির মত মনে হচ্ছে। সিদ্ধ ধানে গাছ হয় না শুনে কথাটার অর্থহীনতা প্রমাণ করতে চেষ্টা পেলেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, মশায়, তা আগাছাতেও কোন গাছের— কাজ হয় না। ভাবলেন শ্রীরামকৃষ্ণ হয়তো আটকে-ই গেলেন এবারে। বেশ মন খুলে একটু হাসা যাবে। বোঝান যাবে, কথা বললে-ই হলো না, অনেক কথা বলা যায় কিন্তু ভেবে চিন্তে না বললে, ভেতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। ভাবছেন হয়তো, ইচ্ছে করে-ই সুতো ছেড়ে দিচ্ছিলেন খেলিয়ে তুলবো বলে। আরে ভিতরে কিছু যাদের নেই তারাই বক্‌ বক্‌ করে, দেখছিলাম কতটা যেতে পারে?

হায়রে মানুষ,—সে জানবে কি করে—কথার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীকণ্ঠ রামকৃষ্ণ কথা বলছেন সামনে বসে। বাগ্‌দেবী-বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে—লক্ষ লক্ষ মানুষকে লক্ষ্য করে জ্ঞানের ভাণ্ডার

বিলিয়ে দিচ্ছেন ; তিনি জানবেন কি করে? উত্তর দিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, উত্তরটা কড়া—তুমি তো পণ্ডিত, এত পড়েছো, বই লিখেছ এমন কথা বললে—ন্যায়শাস্ত্র পড়নি—অবশ্য-ই পড়েছ। তাতে কি এমন যুক্তি আছে ? বাঘের মত ভয়ানক বললে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাঁড়ি মুখ থাকবে ; তা নয়। জ্ঞানীর সাথে কি আগাছার তুলনা করা যায় ? ঈশ্বর যে দর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে লাউ কুমড়ো ফল নয়। তার পুনর্জন্ম হয় না।

কোন দিক দিয়ে-ই বঙ্কিমবাবু এগোতে পারছেন না। কোন কথা-ই যেন ধোঁপে টিঁকছে না। কেমন যেন তুবড়ির মত-ই ভুস্ করে জ্বলে নিভে যাচ্ছে—কথার আলো নেই কেবল-ই কতগুলি নিরর্থক শব্দ। তা যেমন-ই হোক্। শ্রীরামকৃষ্ণ বেরিয়ে পড়েছেন আপন সত্ত্বায়—বঙ্কিমচন্দ্র ও উপস্থিত শ্রোতাদের মহাভাগ্য শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে বিতরণ করছেন দুর্লভ মণি-মুক্তা, যে যত পারে কোঁচড় ভরে আহরণ করছেন। বঙ্কিমবাবু—অবশ্যাই একটু একটু করে বুঝতে পারছেন, বড় শক্ত ঠাঁই। শ্রীরামকৃষ্ণ অনপেক্ষ—দিতে এসেছেন, দিয়ে যাচ্ছেন।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঘবন্দী খেলার মত-ই যেন, তার নিজের খাঁচায় বন্দী করেছেন—কোনঠাসা করে ফেলেছেন। একটি তীক্ষ্ন প্রশ্ন মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন আর যেন বঙ্কিমচন্দ্র অবান্তর কথা উত্থাপন করতে না পারেন। প্রশ্ন করছেন—"আচ্ছা, আপনি কি বল মানুষের কর্তব্য কি ? এইটি মূল কথা—একথা বলতেই তিনি জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। মানুষ ছোট, বড়, পণ্ডিত মূর্খ সকলে-ই জীবন চায় কিন্তু ক'জনে জানে এ জীবন নিয়ে কি করবে ? এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন। সাধনা করে এর উত্তর তিনি লাভ করেছেন ইচ্ছা, সকলে এটা জানুক, জেনে মানুষ জীবন সার্থক করুক। এই কথা-ই জিজ্ঞাসা করেছেন, কেশবচন্দ্রকে, বিদ্যাসাগরকে। তাঁরা কি জীবন উদ্দেশ্য সত্যি-ই জানতেন না ? তা না, জগত-জীবন, ভোগ-জীবন চরম কাম্য নয়। এর উর্ধ্বে একটি জীবন আছে সেইটি লাভ করা-ই মানুষ জন্মের উদ্দেশ্য, একথা আক্ষরিক জানা থাকলেও, দৃঢ় প্রত্যয় নেই। আর সেই জীবন লাভ করার জন্য কোন চেষ্টা নেই।

সকলে-ই নাম, যশ আর দেহ সুখের জন্য লালায়িত। বঙ্কিমবাবুকেও ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর। কেশববাবুর উত্তর আমরা তার শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাতের পরবর্তী নয় বৎসর কাল জীবন সাধনার মধ্যে দেখতে পাই। তিনি পথ খুঁজে-ছিলেন, পথ ঠিক ধরে ছিলেন কিন্তু ধর্মের উন্মাদনা থাকলেও গভীরতা ছিল না। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য সৌন্দর্য্য নিয়ে বাহ্যিক আড়ম্বরের মধ্যে পর্যবসিত ছিল ধর্ম কর্ম। আধ্যাত্মিক—উপলব্ধি ছিল গৌণ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিলন কেশববাবুকে সেই ঈশ্বর উপলব্ধির প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের রসাস্বাদন করেছিলেন শেষ জীবনে। বিদ্যাসাগর মশায় এ জীবন-জিজ্ঞাসার কোন মূল্য দিলেন না।

বঙ্কিমবাবু চাইলেন কতগুলি অসাড় অকিঞ্চিৎকর কথা দিয়ে একটি মহতী জিজ্ঞাসার ছেদ টানতে। এমন একটি গুরুগম্ভীর ধর্মীয় সান্ধ্য আসরকে হাল্কা হাসিঠাট্টার আসরে পরিণত করতে চেষ্টা করলেন। এত বড় কথার উত্তর দিলেন "আজ্ঞা তা যদি বলেন, তা হলে আহার নিদ্রা ও মৈথুন।" কথাগুলি সুসাহিত্যিক, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ নিঃসৃত কথা। আচ্ছা ভাবা যায় কি, বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন না, শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাগুলি শোনার জন্য বঙ্কিমবাবুকে জীবনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করেছেন? ভাবা যায় কি? বঙ্কিমবাবু জানতেন না, শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের ধর্ম জীবনের গুরু, মহাপুরুষ, সাধক, তিনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল? এত জেনেও কেমন করে এ জাতীয় অশালীন কথা এমন আসরে বলতে পারলেন, বোঝা কঠিন। অবশ্যাই মনে হয় বঙ্কিমবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়ণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভুল বুঝেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত' সাম্যবাদের প্রবক্তা বঙ্কিম-ই কি এ জাতীয় কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ও আরও বিদগ্ধ ভক্ত সম্মিলনী সভায় বলেছিলেন? ভাবতে কষ্ট হয়। এ কোন বঙ্কিম তবে?

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরে হয়তো কিছু জবাব মিলতে পারে। "তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। তুমি যা রাত দিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোক যা খায় তার ঢেঁকুর উঠে। কামিনী

কাঞ্চনের মধ্যে রাত দিন রয়েছো, আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয় চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর চিন্তা করলে সরল হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হ'লে ওকথা কেউ বলবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে বলছেন, "শুধু পাণ্ডিত্য হ'লে কি হবে, ঈশ্বর চিন্তা যদি না থাকে? যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? জানো তো, "চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর। পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শ্লোক ঝাড়তে পারে, কি বই লিখেছে, কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা, মান সার বস্তু মনে করেছে, সে আবার পণ্ডিত কি?"

তুমি পণ্ডিত, সাধারণের চেয়ে অনেক জ্ঞানী গুণী, লোকে কত মানে, তার মুখে কি একথা মানায়? তবে শিক্ষিত মার্জিত রুচি সম্পন্ন মানুষ কাকে বলবো? শিক্ষা মানুষের আত্মভাব বিকাশের সাহায্য করে কিন্তু তা না করলে শিক্ষার মূল্য কোথায়? মনের পশু ভাব না গেলে ঈশ্বর জীবনের আনন্দ আস্বাদন করা যায় না। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। তিনি অন্তর্যামী। যদি প্রার্থনা আন্তরিক হয় তিনি শুনবেন-ই শুনবেন।

কথাটা হচ্ছে সংসারে থেকে অর্থাৎ কামিনী ও কাঞ্চন থেকে মন তুলে ঈশ্বরের দিকে দিতে হয়। নিজের কথা বলছেন, আমিও তাই করেছি। আমি রাসমণির কালী বাড়ীতে পঞ্চবটী তলায় গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা,' বলে জলে ফেলে দিয়েছিলুম।

কথা শুনে বঙ্কিমবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন, বলেন সে কি টাকা যদি মাটি তা হলে চলবে কি করে? পেট চলা, দয়া, পরোপকার ইত্যাদি হবে কি করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পরপোকার, দয়া? তোমার সাধ্য কি যে তুমি করো! সংসারীর টাকা দরকার কিন্তু সৎ পথে রোজগার চাই, যতটা দরকার। সীমিত। যে কোন উপায়ে নয়। পরিবার ভরণ পোষণের জন্য যতটা দরকার। সংসারী লোক শুদ্ধ ভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে, আর ভগবানের কাছে রাত দিন ভক্তি

প্রার্থনা করে। নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এর-ই নাম কর্মযোগ। পরের উপকার, পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র সূর্য বাপ মা ফল-ফুল শস্য জীবের জন্য করেছেন। বাপ মার ভেতর যা স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্য-ই দিয়েছেন। দয়ালু-র ভিতর দয়া সে তাঁরই দয়া। তুমি দয়া করো আর নাই করো তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।

তাই জীবের কর্তব্য—তুমি যা বলছিলে তা না। ভোগ, দেহ সুখ, জীবনের উদ্দেশ্য বা মানুষের কর্তব্য নয়। ও তো পশু জীবন। মানুষের তো 'হুঁশ' নিয়ে কথা। অর্থাৎ 'চৈতন্য'। আমি জীবাত্মা, পরমাত্মা থেকে অভিন্ন: এইটি জানতে হবে। কেমন করে হবে?—তাঁর শরণাগত হও, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, তিনি-ই জানিয়ে দিবেন।

আমি শম্ভু মল্লিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তা হলে তুমি তাঁকে চাইবে না কতগুলি ডিস্‌পেনসারী বা হাসপাতাল চাইবে? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। যারা ওতে আনন্দ পায় তারা-ও ভাল লোক কিন্তু থাক্ আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না। তা-না হলে যে মন ঈশ্বরকে দেবে, সেই মনের বাজে খরচ হয়ে যাবে।

তবে কথা হচ্ছে আগে তোমাকে স্থির করতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য ঠিক না থাকলে দিক্ ভ্রম হবে। ঘুরে মরবে। যদি ঈশ্বর লাভ, শাস্ত্রে সাধুরা যেমন বলেছেন, ঋষি যেমন বলেছেন ঠিক করে থাকো তবে আগে ঈশ্বর লাভ পরে জগতের বিষয়। তুমি-ই বলো না, আগে পড়া, সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিমবাবু তার মত-ই বললেন, আগে পাঁচটা জানতে হয় জগতের বিষয়, একটু এ দিক্‌কার জ্ঞান না হ'লে ঈশ্বর জানবো কেমন করে? তাই আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর বড়-ই সহজ ও পরিস্কার—ঐ তোমাদের এক কথা, না-গো না, আগে ঈশ্বর তারপর তাঁর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে সব-ই জানতে পারবে। বেদ উপনিষদ দর্শন তোমার

তো জানা আছে—কি বলছেন "কস্মিন্নু বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" বাল্মীকিকে "রাম" মন্ত্র জপ করতে দেওয়া হলো; কিন্তু বলা হলো "মরা" "মরা" জপ করো। 'ম' মানে ঈশ্বর, আর 'রা' মানে জগৎ। এক এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়। এক পুঁছে ফেললে কিছু থাকে না। এককে নিয়েই কথা। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ।

মনে পড়ে, সর্বত্যাগী খৃষ্টের কথা, তিনিও তো নিরক্ষর ছিলেন। চাল চুলো কিছু-ই ছিল না—বললেন ঃ আগে-ঈশ্বর; "Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you···" ঋষিরা এই কথা বলেছেন। যীশু এই কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বলছেন। আশ্চর্য মিল এদের উপলব্ধির ; তবু আমরা বলবো—না, আমরা যা বুঝেছি সেটা-ই ঠিক। আগে আমাদের জগতের জ্ঞান চাই তারপর দেখা যাবে ঈশ্বর। জগৎ যদি আমাদের প্রয়োজন মেটায় কেন অপরের দুয়ারে যাবো? ঈশ্বর থাকে থাকুন এ হচ্ছে আমাদের মনের ভাব। তাই আমরা ঈশ্বর নিয়ে তর্ক করি, বাদবিচারে মত্ত হই ; কিন্তু ঈশ্বরকে খুঁজি না।

"আবার বলছেন—বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও। কত পাতা, কত ডাল জেনে কি হবে? অমৃত ফল খাও, আনন্দ কর।"

বঙ্কিম—আম পাই কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, তাঁকে প্রার্থনা কর। বিশ্বাস কর। নির্ভর কর। তিনি বলে দেবেন। হয়তো এমন কোনো সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন যাতে সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয়তো বলে দেয়, এমনি এমনি কর তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।

বঙ্কিম—কার কথা বলছেন, গুরু? তিনি আপনি ভাল ফল খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন গো—তা কেন, যার পেটে যা সয়। বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পোলয়া কালিয়া দেন না। যার পেটের অসুখ তাকে কেবল মাছের ঝোল দেন। তাবলে কি মা সেই ছেলেকে কম ভালবাসেন?

তুমি এত শাস্ত্র পড়েছ, কত লিখেছ, এটা তোমার জানা আছে—গুরু বাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর, গুরুবাদ,

পুনর্জন্ম বাদ এ তিনটে তো মূল কথা। গুরু-ই সচ্চিদানন্দ, তাঁর কথা বিশ্বাস করতে হয়। বালকের বিশ্বাস চাই। স্যেয়ানা বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কপট থেকে তিনি অনেক দূরে।
যে পথে-ই যাও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। ব্যাকুলতা থাকলে সাধু সঙ্গ জুটে যায়। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়লেও, তিনি আবার ভাল পথে তুলে লন। পট পরিবর্তন।

অনেক কথা হ'লো—এবারে কীর্ত্তন শুরু হলো—অধর সেন কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেছেন। "ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্য গান করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর দণ্ডায়মান ও ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূণ্য। একেবারে অন্তর্মুখ সমাধিস্থ।" সকলে তাঁকে ঘিরে আছেন। বঙ্কিমবাবু সমাধি কখনো দেখেন নাই—ভিড় ঠেলে ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখছেন। "বঙ্কিমাদি এ দৃশ্য দেখে অবাক, কি আশ্চর্য! এই কি প্রেমানন্দ? ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষ এত মাতোয়ারা হয়?" শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনেছেন—এই কি সেই অবস্থা? এর ভিতর তো ঢং হতে পারে না। কেবল ঈশ্বরকে ভালবাসলে-ই কি এ আনন্দময় অবস্থা লাভ হয়? উপায়তো তিনি বললেন—"ব্যাকুলতা।" ভালবাসা উপায়, ভালবাসা উদ্দেশ্য। ঠিক ভালবাসা এলে-ই ঈশ্বর দর্শন হয়। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কচ্ছেন। ভাগবত ভক্ত, ভগবান, জ্ঞানী, যোগী ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।

ঈশ্বরের শক্তির কাছে মানুষের শক্তি কিছু-ই না। গঙ্গার কাছে গেলে যেমন দেহ মন শান্ত স্নিগ্ধ হয়, এও তাই, বঙ্কিমবাবু যেমন মন নিয়ে-ই আসুন না কেন, এসেছেন তো শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। পরীক্ষা করতেই আসুন, দেখতে-ই আসুন, এসেছেন। ফল তার আছে-ই। এতসব হবার পর কিন্তু শেষে জিজ্ঞাসা করছেন, মহাশয় ভক্তি কেমন করে হয়?

এতোক্ষণে অবশ্য-ই বুঝেছেন, এ ব্যক্তি ভক্তির সন্ধান দিতে পারেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছেন-ই দিতে, লাউ কুমড়ো নয়, ঈশ্বরে ভক্তি। এই প্রশ্নের জন্য-ইতো এতোক্ষণ কথা বলছেন।

এই তো আম খাওয়ার কথা, আম বাগানে আম খেতে এসে পাতা গুণে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর সরল "ব্যাকুলতা"। ছেলে যেমন মাকে দেখতে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

ভক্তি মানে ঈশ্বরকে ভালবাসা। তাঁকে ভক্তি করা ভালবাসা এক, তারপর তা থেকে আসে তাঁকে লাভ করা।

ভালবাসা, ভক্তি এ সকল শব্দের অর্থ বঙ্কিমবাবু জানেন না তা নয়, তা হলে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? শাব্দিক অর্থ জানেন কিন্তু ভালবাসার বস্তু, ভক্তি যাকে করতে হয় তাঁর সাথে কেমন করে যুক্ত হতে হয় জানেন না। শাস্ত্রে সব আছে কিন্তু শাস্ত্রে কতটা সাধনা করতে হয় তা বলা নেই। যদি কেউ সমুদ্রের তল থেকে রত্ন আহরণ করতে চায়, আর ডুব না দেয় তাহলে পারে কি ? তেমনি ভালবেসে ডুবতে হবে, মগ্ন হতে হবে ঈশ্বরে, তখন ভক্তি কি ঠিক বোঝা যাবে। বললেন—"তোমায় বলি উপরে ফাঁকা ফাঁকা কথা বললে কি হবে, গুচ্ছের লিখলে কি হবে—একটু তাঁতে ডুব দাও। এই ডুব দেবার কথা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার শেষ কথা। এইটি তাঁর শিক্ষা। যদি রত্ন চাও সাগরে ডুব দাও।" একটা গান শোনালেন—গানের জন্য নয় ভাবে অবগাহণের জন্য—

"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্ন ধন॥" বুঝলে কেউ ডুবতে চায় না। বলে ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব ? এটি বোঝে না যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্য, তাঁকে চিন্তা করে কি অচৈতন্য হয় ? বোঝে না সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর। বঙ্কিমবাবুর বাঁকাভাব এতক্ষণে সিধে হয়েছে। বলছেন, আহম্মকের মতো কতগুলি কথা বলেছি বলে ভাববেন না, আমি তাই। এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। বাচালতা এ স্থানে শোভনীয় হয়নি মনে হচ্ছে। এতো সময় বাজে চলে গেল। কেবল বেচলেন, কেনার সময় হাতে রইল কম। প্রণাম করে, প্রার্থনা করছেন, নিমন্ত্রণ করছেন তার বাড়ীতে যাবার জন্য।

ভগবান কোনো কথা ভোলেন না, আন্তরিক হ'লে তো নয়ই।

কিছুদিন পরে মাষ্টার মশায় ও গিরীশচন্দ্রকে ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে—স্মরণ করিয়ে দিতে পাঠিয়েছিলেন—কৈ বঙ্কিম তো ডাকে না? বঙ্কিমবাবু নিজেই আসবেন বলে ছিলেন, কিন্তু কার্য-গতিকে আর আসা হয়নি। ঠাকুরও যান নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে জীবন মিলিয়ে মানুষকে, ধর্মকে দেখতেন। তিনি উপলব্ধি বিহীন শাস্ত্র বিশ্বাসকে মেনে নিতেন না; বলতেন পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। বইতে কত কথাই তো লেখা থাকে তাতে কি হবে? মুখে বিশ্বাস বিশ্বাস করি বললে কি হবে? আনন্দ হবে কি? বঙ্কিমবাবু আশ্রয় করেছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিকে। তিনি ধর্মকে বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে দেখতেন। ধর্মের সংশয় যুক্তি দিয়ে বিচারের মাধ্যমে-ই দূর করা সম্ভব বলতেন। ধর্মের প্রীতি যথেষ্ট-ই ছিল কিন্তু মনে হয় সে প্রীতি মূলতঃ ঈশ্বরকে জানার জন্য নয়। তাঁর ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার আকর্ষণ। কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন, আগে পাঁচটা পড়া দরকার, বিজ্ঞান বিষয় জানা দরকার তার পর তো ঈশ্বরকে জানা যাবে। কিছু না পড়ে বা জেনে কেমন করে ঈশ্বর তত্ত্ব জানা যাবে? এটা ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে মানতেন কিন্তু নিজেই লিখলেন ধর্মের গূঢ় অর্থ খুব কম লোকেই বোঝে। বেশীর ভাগ লোক মহাপুরুষদের অনুকরণ করে মাত্র। কিন্তু কথাটা আর একভাবে বলা চলে, ধর্ম বা শাস্ত্র অনুশাসন মানতেই হবে—আর শাস্ত্র তো সাধুদেরই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। মহাপুরুষ তাঁরাই যারা ধর্মের গূঢ় অর্থ জীবনে উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের জীবন অনুসরণ ও অনুশীলন করা ছাড়া পথ নেই। "মহাজন যেন গত তেন পন্থাঃ।" সেই তো পথ। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে একটু একদেশীয় ভাব ছিল। তিনি সাম্যবাদের কথা বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক কিন্তু হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কথা ই যেন ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষের কথাই ভেবেছেন, সকল বর্ণ জাত পাতের উর্দ্ধে উঠে। কারণ মানুষ বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের চিরন্তন স্বরূপকে বুঝতেন। সকলকে নারায়ণ দেখতেন।

কেবল মানুষ কেন সর্বভূতে-ই সেই ঈশ্বরকে প্রকাশিত দেখতেন এইটি প্রকৃত সাম্যবাদ। ভাবতে বিস্ময় লাগে শ্রীরামকৃষ্ণ কি সামাজিক পটভূমি থেকে, কি পরিবেশ, কি শিক্ষা-জগৎ থেকে এসেছিলেন আর সনাতন ঋষিদের শাস্ত্র অনুসরণ করে, সাধনা করে কোন্ স্তরে উঠেছিলেন। ঊনিশ শতকের মনীষীরাই বা এসেছেন কোন্ সামাজিক পটভূমি থেকে? প্রকৃতপক্ষে তুলনাই করা যায় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব প্রমাণ করে আগে ঈশ্বর পরে তাঁর জগৎ। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম বাবু, কেশবচন্দ্র—সকলেই সমাজের মুক্তির কথা বেশী ভেবেছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জোর দিতেন ব্যক্তি জীবনকে। ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ।

নবজাগরণের চিন্তাবিদদের কথা ভাবতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই খট্‌কা লাগে, দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিলেন, ইংরাজীতে আত্মীয়দের লেখা চিঠি না পড়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেশববাবুকে খ্রীষ্ট প্রীতি থেকে সাবধান করেছেন। উপনিষদ ছিল তাঁর প্রাণ, জীবন ভিত্তি কিন্তু তিনিই আবার প্রতিমা পূজার বিরোধী। সন্ন্যাস ধর্মের বিরোধী ছিলেন। কেশবচন্দ্রের খৃষ্ট ধর্মের প্রতি ছিল মাত্রাহীন প্রীতি। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও ধর্ম প্রচারের পদ্ধতি, বক্তৃতা ইত্যাদি ছিল তার পছন্দ কিন্তু তিনি বেদকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তিনিও প্রতিমা পূজাকে পুতুল পূজা বলে অবজ্ঞা করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কাম কর্ম মানতেন, দেবী চৌধুরানীতে দেখতে পাই। শ্রীকৃষ্ণকে মানতেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিই সন্ন্যাস ধর্মকে অসম্পূর্ণ বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে নিজের ভাব মত বাদ-ছাদ দিয়ে পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পূর্ণ বাঙালী থেকেও, চিঠিপত্রে "হরিনাম শরণ" করেও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান মেনেও বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে, ষড়দর্শনকে ভুল বলতে ছাড়েন নি। বলছেন; "ঋষিরা যা বোঝাতে চেয়েছেন বোঝাতে পারে নি।" সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে লালিত পালিত হয়েও হিন্দুধর্মকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে

পারেন নি। ভ্রান্ত বলেছেন ধর্মের মর্ম জানার জন্য কোন সাধনা না করেই। সমস্তটাই বৌদ্ধিক দিক থেকে দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন এদের পরিপূরক। তাই মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ—সমকালীন সমাজে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। নবজাগরণের যুগের প্রতিনিধি হলেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে যুগের সাধারণ মানুষের সাথে ছিল একটা বিরাট ব্যবধান কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ছিল একটি যোগসূত্র। ব্যবধান তো ছিলই না লোক ও লৌকিক জীবনের সাথে। মানুষ মনের সমস্ত ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অবাধ গতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে সেই নবজাগরণের যুগে অশিক্ষিত গ্রামীন মানুষের হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন শিক্ষিত ভারতের প্রতিনিধি—দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জননায়কদের। আর এই সাক্ষাৎ-এ আমরা বুঝতে পারি প্রকৃত ভারত সত্ত্বাকে। অখণ্ড এক সত্ত্বাকে। দয়ানন্দ সরস্বতী পাশ্চাত্য বিদ্যাকে আমল না দিলেও আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে অখণ্ড ভারতাত্মার কথা সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন—ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিতে অনার্য—দ্রাবিড় সভ্যতা—সংস্কৃতিরও অশেষ দান আছে। তারাও ভারতের আত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পণ্ডিত শশধরও হিন্দু পুর্ণজাগরনের জন্য সনাতন হিন্দুধর্মকে বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অহিন্দুরাও ভারতেরই অঙ্গ স্বীকার করেন নি।

এসব লক্ষ্য করেই মনে হয় বিদেশী মনীষী রোমা রোঁলা লিখেছেন—তিরিশ, কোটি ভারতীয়ের গত পাঁচ হাজার বছরের সাধনার ঘনীভূত রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র বিগত পাঁচ হাজার বছরের ধর্মীয় ইতিহাসকে নিজ জীবনে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ সমাজ চেতনা তিনি কোথায় পেলেন এ প্রশ্ন মনে আসবেই। একটাই উত্তর। অতৃপ্ত গভীর জীবন জিজ্ঞাসা থেকে। আর একটি কথা না বললে শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ী কথা বলা হবে না। আমরা বলেছিলাম উপসংহারে বলবো—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যেমন বলেছেন, "আমার মনে হয় তিনি মতলব করে কোন সমন্বয় করেন নি, ভাবের, মতের বা পথের। এটি ছিল তাঁর স্বাভাবিক। তিনি

ছিলেন জগদম্বার বালক। বালক কি নিজে কিছু করে? তিনি ছিলেন জগদম্বার হাতের যন্ত্র! তাঁর ইচ্ছাতেই যা হবার হয়েছে। তিনি বলতেন এসব বলে কে? আমি তো মুখ্যু! মা-ই সব বলেন করেন—এই ছিল তাঁর মূল কথা।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর চরম বৈশিষ্ট্য, সে নতুন করে অনেক কিছুরই নবমূল্য ধার্য্য করেছে। আবার অনেকের ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হ'লো ইউরোপের ইতিহাস। কিন্তু একবিংশ শতব্দীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে একথা আর বলা চলে না। মানুষের নতুন ইতিহাস লেখা যখন হবে তখন অনেক বড় বড় ঘটনা বড় অক্ষরে লেখা নামকে মুছে ফেলতে হবে। একদিন পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবীরা আত্মম্ভরিতায় যে কথা স্বীকার করতে পারে নি, আজ অতি পুরানো পূর্বের কাছে বিশেষ করে বাংলার নগণ্য গ্রাম কামার পুকুরের গদাধর ওরফে শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব জীবন সাধনার পাদপীঠে বহু ব্যর্থ জটিল প্রশ্নের শেষ উত্তর মিলছে! ঐতিহাসিক Arnold Tonby স্পষ্ট ভাষায় পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় লিখেছেন—পৃথিবীকে যদি বৈজ্ঞানিক আত্ম-হত্যার হাত থেকে বাঁচতে হয়, তবে আর সময়ক্ষেপ না করে দক্ষিণেশ্বরের পাগলাঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দর্শনকে গ্রহণ করতেই হবে—অন্য পন্হা নাই।

ঊনিশ শতকের ছোটবড় সকল মানুষের, মনীষীদের অনেকের মনে হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, একজন উন্মাদের ব্যক্তিগত প্রলাপ কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তি লগ্নে আর কিছুতেই শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তা ধারাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সকলেই বুঝতে পারছেন এ ধারা বিশ্বচিন্তা ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একটা যুগের সকল অসম্পূর্ণতাকে সামান্য একটি অশিক্ষিত পুরুত, জীবন সাধনার দ্বারা, আত্ম উপলব্ধির দ্বারা পূর্ণতা দিয়ে গেলেন। সকল অনির্দিষ্টতাকে নির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে গেলেন। যুগের মহা অন্ধকারের মধ্যে মানুষের মুক্তির মন্ত্র, "শিবজ্ঞানে জীবে সেবা" দিয়ে গেলেন।

কেবলই কি তাই—ইউরোপ যখন নারীকে ভোটাধিকার দেবে কি দেবে না নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, পুরুত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের

সকল সাধনার শ্রেষ্ঠফল, এমন কি নিজের জপের মালা, নিজ হাতে অঞ্জলী করে এক নারীর চরণে অর্পণ করে নারীকে দিলেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। কেবল মুক্তি নয়, মুক্তি পথের দিশারী বলে আখ্যা দিয়ে, পূজার আসনে বসিয়ে প্রার্থনা মন্ত্রে বললেন, মা, কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে জাগরিতা হয়ে মানুষের কল্যাণ কর। সেই নারী অপর কেউ নয়, তিনি তাঁর বিবাহিতা পত্নী। তিনি আজ অসংখ্য মানুষের "মা"। নারীত্বের এত বড় স্বীকৃতি পূর্ব বা পশ্চিমে কোথাও কেউ দেয়নি। মানুষ মুক্তির সকল পথে পরিক্রমা করে জগতের সামনে রেখে গেছেন ধর্মের 'রাজপথ' আলোর পথ, আশার পথ, বাঁচার পথ।

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ॥

বলরাম মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই। মণি, (শ্রীম) যীশুর কথা বলিতেছিলেন, দুই বোনের কথা—মার্থা ও মেরীর—যীশুখৃষ্ট তাঁদের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে গিয়েছিলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। আর একটি বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ করছিল। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ করলে, "প্রভু দেখুন দেখি দিদির কি অন্যায়। উনি এখানে একলা চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এইসব উদ্যোগ করছি।" "তখন যীশু বললেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা—প্রেম) তা ওঁর হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি বোধ হয় ?

মণি ঃ—আমার বোধ হয়, তিনজনই এক বস্তু। যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি এক ব্যক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"এক এক। এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর)—দেখছ না,—যেন এর উপর এমন করে রয়েছে।"

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট উক্তি প্রকাশ করার অধিকারী পুরুষ অপর কে আর হতে পারে ? আমরা কথামৃতে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ বড় একটা 'আমি' কথা ব্যবহার করতেন না। নিজের

ভাব, মহাভাব, ঈশ্বরীয় অনুভূতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তে ব্যক্ত করেছেন। এক অবতার অন্য অবতারের কথা বলতে পারেন। সাধারণের বা কোন সাধু মহাপুরুষের উপমা বা দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন ভাবেই ঈশ্বরের বা অবতারের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব না। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমৎ মহাপ্রভুর কালের মধ্যে তিন সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবধান তবু, এই ব্যবধান ভাবের কোন তারতম্য ঘটাতে পারে নি, ব্যবধান যা দেখি তা কেবল-ই বাহ্যিক, ঐতিহাসিক পটভূমির বা পরিবেশগত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে মহাপ্রভুর বিশেষ উল্লেখের আর একটা কারণ, কথামৃতকার নিজে। হিন্দু সংস্কার জন্মান্তরে বিশ্বাসী। যতদিন না আত্মা পরমাত্মায় মিশে যায় ততদিন এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে চলে পরিক্রমা, অর্জিত সংস্কারের পথ ধরে। কথামৃতকারের চৈতণ্য সংস্কার জন্ম জন্মান্তরের, গলা পর্যন্ত্য, ঘুরে ফিরে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকারকে বলছেন, "এই চক্ষে ভাবে নয়—দেখলাম, চৈতণ্যদেবের সংকীর্ত্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমাকে দেখলাম।" (ক মৃ ৪।৩১।২)

খোলা চোখে শ্রীমান মহাপ্রভুর নগর কীর্ত্তন দেখলেন পঞ্চবটীর দিক থেকে বিরাট সংকীর্ত্তনের দল বকুলতলার দিকে অর্থাৎ নিজের দিকে এসে কালীবাড়ীর বড় ফটকের দিকে যাচ্ছে, ভীড়ের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে দেখলেন। উল্লাসের আধিক্যে কেহ কেহ উদ্দাম নৃত্য করছেন। মনে হচেছ জনসমুদ্র। ঐ দলের মধ্যে দু-জনের মুখ শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে বিশেষ করে ধরা পড়ে যখন সেই দু জন তাঁর কাছে আসেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জন্মান্তরে তাঁরা শ্রীচৈতণ্যের পার্ষদ ছিলেন। এদের মধ্যে একজন কথামৃতকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল পথে মতে ভাবে সাধনা করেছিলেন। সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সাধনা জগতে প্রকট করেছেন সে সাধনা মধুর ভাবের। ভাবাশ্রিত সাধনার মধ্যে মধুর ভাবের সাধনা উচ্চতম ও কঠিন। এ সাধনা সাধারণ

মানুষ, সাধকের সম্ভব নয়। মধুর ভাবের সাধনার অধিকারী ঈশ্বর কোটী পুরুষ মাত্র। অবতার পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর ভাবের কথা হলেই শ্রীমতী রাধিকা বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলতেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কখনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আসতো। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেত।"

"যখন লীলায় মন নেমে আসত, কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতা রামরূপ সর্ব্বদা দর্শন হ'তো।··· কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐরূপ সর্ব্বদা দর্শন হ'তো। আবার কখনো গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম। দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্ব্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হ'তো।" কঃ মৃ ৩।১৪।১

গৌরাঙ্গ, অন্তর কৃষ্ণ বাহিরে রাধা। রাধা অঙ্গে কৃষ্ণ, মধুর ভাবের সাধনাকালে শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ছাড়াও অন্যান্য ব্রজ-গোপীদের দর্শন পেয়েছিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে বলেছিলেন "গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আব্দার করা এসব হয়েছে। কঃ মৃ ৩।১৭।৩

মধুর ভাব সাধনাকালে ঠাকুর মেয়েদের সাজ পোষাক পরতেন। পুরুষবোধ ছিলই না। তাঁর তন্ত্র সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী একদিন ঠাকুরকে ফুল তোলার সময় দেখে বিস্মিত, এ যে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী। কখনও বা ব্রজের কাত্যায়ণী জ্ঞানে মা ভবতারিণীকে মালা পরিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী হিসাবে আকুল আবেগে কাঁদতেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা, নিরুপমা, সকল মহিমা ও মাধুরী মণ্ডিতা নাগকেশর পুষ্পের কেশর সকলের ন্যায় গৌরবর্ণা সেই শ্রীমতি রাধারাণীর মূর্ত্তি তাঁকে দেখা দিয়া তাঁর নিজ দেহে মিলে গেলেন। তারপর থেকে নিজেকে শ্রীমতী জ্ঞান করতেন। এখন থেকে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় প্রায়ই মহাভাবের লক্ষণ দেখা দিত। এইভাব কিছুদিন চলতে থাকে। পরের একদিন সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ শ্যামসুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান। দেখলেন, "নীলবর্ণ ঘাসফুলের

ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট'' কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখা দিয়ে শ্রীমতীর ন্যায় দেহে মিলিয়ে গেলেন। এই মিলনের পর ঠাকুর নিজ অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে অনুভব করতেন। "মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ।'' এ যেন নবদ্বীপ চাঁদ গৌরাঙ্গ সুন্দর নিজেই, একই বৃন্তে দুটি ফুল, রাধা আর কৃষ্ণ।

"অখিল রসামৃত মূর্ত্তি'' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমে চিরকালের জন্য আবদ্ধ। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, এই প্রেম আস্বাদন করার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—সেই একই আস্বাদনে আধুনিক কালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ ধারণ করে ব্রজগোপী ভাবে শ্রীমতীর স্মরণ মনন ও ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন। কথামৃতে দুটি অপূর্ব দৃশ্য চিত্রিত আছে।

এক॥ গোপীযন্ত্র নিয়ে গান গাইছেন জনৈক বৈরাগী—

কার ভাবে নদে এসে কাঙ্গাল বেশে,
হরি হয়ে বলচ হরি।
কার ভাবে ধরেচ ভাব, এমন স্বভাব,
তাও তো কিছু বুঝতে নারি॥

ভক্ত ঠাকুর নিজ ঘরে বসে গান শুনছিলেন। ভক্ত কেদার এসেছেন, তাকে দেখেই অন্তরের গোপীভাব উথ্‌লে উঠেছে—দাঁড়িয়ে গান ধরলেন, সখি। সে বন কতদূর? যথা আমার শ্যামসুন্দর। আর চলিতে নারি। শ্রীমতীর ভাবে গান, আর গাইতে পারছেন না, সমাধিস্থ হয়ে "চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। চোখের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে।''

(কঃ মৃ ৪খ ১৮৮৩, ১লা জানুয়ারী)

কীর্ত্তনীয়া মনোহর সাঁই ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের পূর্ব্বরাগ কীর্ত্তন শুনাচ্ছেন—"করতলে হাত, চিন্তিত গোরা আজ কেন চিন্তিত? বুঝি রাধার ভাবে হয়েছে ভাবিত।'' ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। গান চলছেঃ

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়।
কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়।
(রাই এমন কেন বা হ'লো গো?)

শুনতে শুনতে মহাভাব হলো। গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলে

দিলেন। গান—"শীতল তছু অঙ্গ। তনু পরশে অমনি অবশ অঙ্গ।" ভক্ত কেদারকে দেখে বলতে লাগলেন কীর্ত্তনের সুরে—"প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ, তোরা কৃষ্ণ এনে দে ; সুহৃদের তো কাজ বটে। হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল তোদের চিরদাসী হব।" (কঃ মৃ ৫।৫।৪)

আবার দেখি ঠাকুর বলছেন, "জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, তুমি শরীর ধারণ করেচ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এই ভাব লয়ে থাকো।" (কঃ মৃ ৪খঃ ১৫ই জুলাই ১৮৮৫)

কথামৃতকার দিনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে নানা ভাবে দর্শন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে পড়তো শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে। একটি ছোট্ট দৃশ্যের উত্থাপন করছি—বলরাম মন্দির, ভোর হইয়াছে। "ঠাকুর মুখ ধুইয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে গোপালের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তঃপুরের দ্বারের অন্তরালে ২।১টি স্ত্রীলোক ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। অথবা নবদ্বীপের মহিলারা প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন।"

ঠাকুরের প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখে, মনে পড়ে গেছে নবদ্বীপের একটি একান্তে দেখা দৃশ্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ রাম নাম করিয়া কৃষ্ণ নাম করিতেছেন, কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! গোপীকৃষ্ণ ! গোপী ! গোপী ! রাখাল জীবন কৃষ্ণ। নন্দনন্দন কৃষ্ণ। গোবিন্দ গোবিন্দ আবার গৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ।"

মধুর রস আস্বাদনের জন্য একদিন মহাপ্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের মতই পুরীতে জগন্নাথ প্রভুকে সাক্ষাতে কোলে করতে ছুটে ছিলেন—

চৈতন্য ভাগবতে (৩।২) আছে ; পুরীতে মন্দিরে ঢুকেই—

"দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুংকার।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবার॥

লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস ॥''

*　　　　*　　　　*

আর একটি মনো-মুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করে শ্রীম নিজেই আত্মবিস্মৃত—পূর্ব সংস্কার জেগেছে মনে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটির চিড়ামহোৎসবে এসেছেন—রাজপথে সংকীর্ত্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করছেন। ''ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, কেহ কেহ ভাবিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন?'' (কঃ মৃঃ ৪র্থ ১৮৮৩.১৮ই জুন)

কেহ কেহ মধ্যে মাষ্টার মশায় অন্যতম। তিনি ভালবাসিতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীগৌরাঙ্গভাবে দেখিতে ভাবিতে।

''এটি রাঘব পণ্ডিতের পেনেটির চিড়া মহোৎসব। শুরু হয়েছিল ১৫১৭ খৃঃ অব্দে। শুক্লাপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে। দাস রঘুনাথ প্রথমে এই মহোৎসব করেন। রাঘব-পণ্ডিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়াছিলেন'' দাস রঘুনাথকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন ''ওরে চোরা তুই বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস আর চুরি করে প্রেম আস্বাদ করিস আমরা কেউ জানতে পারি না। আজ তোকে দণ্ড দিব, তুই চিঁড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর।''

ঠাকুর অর্ধবাহ্য দশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্যদশায় গান ধরিলেন।

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা তারা দু-ভাই
এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দু ভাই
এসেছে রে।
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)

''ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, গৌর নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন।

আবার—"নদে টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোল রে।" (১৮৮৩ ১৮ই জুন কঃ মৃঃ ৪ খণ্ড)

কথামৃতকার কেবল দৃশ্য বর্ণনা করেই তৃপ্ত হতে পারেনি লিখছেন, "পেনেটীর মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারী ভাবিতেছেন, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই এক জন ভাবিতেছে ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই গৌরাঙ্গ। শ্রীম ঠাকুরকে শ্রীরাম কৃষ্ণ দেহে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভাবতে অধিক ভালবাসতেন। এই সংস্কার! দুই এক জনের উল্লেখ করে নিজের কথাই বার বার নানাভাবে বলছেন।

পেনেটির মহোৎসবে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে শ্রীযুক্ত মণি সেনের বৈঠক-খানায় বসে আছেন। অপরাহ্ন। মণি সেনের গুরুদেব নবদ্বীপ গোস্বামী আছেন। তাঁর সাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নানা ভাবের আলোচনা করছেন। ভক্তি তত্ত্বের সার। "শ্রীরামকৃষ্ণ—(নবদ্বীপের প্রতি—ভক্তি পাকলে ভাব,—তারপর মহাভাব—তারপর প্রেম—তারপর বস্তুলাভ (ঈশ্বরলাভ) গৌরাঙ্গের-মহাভাব, প্রেম।' "এ প্রেম হলে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমুদ্র দেখে, যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হ'ত। কেমন?"

নবদ্বীপ—আজ্ঞা হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্য দশায় কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নাম সংকীর্ত্তন করতেন। (কঃ মৃঃ ৪র্থ ১৮৮৩, ১৮ই জুন)

শ্রীরামকৃষ্ণ সারাদিনে রাতে ঠিক এই তিন অবস্থার মধ্যেই কাটাতেন। এখানে একটা কথা আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যে প্রেম প্রেম করি প্রকৃত পক্ষে তা কোন মতেই ঈশ্বরের প্রেমের সাথে তুলনা করা যায় না। আমরা যে প্রেম জানি তা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। তাই ঠাকুর ঠাট্টা করে বলেছিলেন তোমরা যে প্যাম প্যাম কর—তা অন্য।

অবতার পুরুষ-জীবনের ভিত্তি—ত্যাগ। এ ত্যাগ স্বাভাবিক ত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তকুলের জননী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর ছোট্ট

একটি কথার মধ্য দিয়ে মহৎ এক জীবনের শ্রেষ্ঠ স্পন্দনটিকে ব্যক্ত করেছেন। "এবার ত্যাগই তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) বৈশিষ্ট্য।"— এমন স্বাভাবিক ত্যাগ ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখে নাই। ত্যাগ আর সন্ন্যাসে পার্থক্য নেই বললেই চলে। সন্ন্যাস আনুষ্ঠানিক —ত্যাগ স্বাভাবিক। সন্ন্যাসকে বুঝিতে গেলে ত্যাগের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারা যায়। সন্ন্যাস ঈশ্বরের জন্য সকল কামনা বাসনা ত্যাগ। সকল এষণার সম্যক ত্যাগ। ত্যাগ ও সন্ন্যাস যদি একই হয় তবে সন্ন্যাস নেওয়া কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বা মহাপ্রভু নিলেন কেন? সাধু সন্ন্যাসী বা সাধক সকলের পক্ষেই মনের সন্ন্যাস অপরিহার্য্য। একে আন্তর-সন্ন্যাস বলে। বাহ্য বা আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস বিশেষ প্রয়োজন। সাধকের নিজের জন্য যতটা না. অনেক বেশী প্রয়োজন আদর্শের জন্য, সমষ্টি সমাজের আদর্শের জন্য। বাহ্য ত্যাগ না দেখলে মানুষ ত্যাগের মর্ম বুঝতেই পারে না। অবতার পারুষরা সেই জন্যই সাধারণ জীবের থেকে আদর্শের জন্য অনেক বেশী ত্যাগের জীবন যাপন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন—"এখানকার সব নজীরের জন্য।"—যা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশী করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগের বাদশা। গায়ে ধাতুদ্রব্য লাগলে অঙ্গ কুঁকড়ে যেত। স্ত্রীলোকের হাওয়া অসহ্য ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বন্দনা করেছেন—'বঞ্চন-কাম-কাঞ্চন অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"শ্রীচৈতন্যদেব কত বড় কামজয়ী।" একটা ঘটনাও তিনি বর্ণনা করেছেন। পুরীতে সন্ন্যাসী সার্বভৌমের শ্রীগৌরাঙ্গের সংসার বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটু সংশয় ছিল মনে। পরীক্ষা করার জন্য মহাপ্রভুর জিহ্বায় চিনি ঢেলে দেন, সেই চিনি বাতাসে ফরফর করে উড়ে গেল, ভিজল না, বাসনার রস বিন্দু মাত্র ছিল না। জিহ্বাতে দিলেন কেন? আর জিহ্বাতে জল না এলেই কি জিতেন্দ্রিয় ভাবতে হবে! শাস্ত্রকারদের মত তাই। শাস্ত্র বলেন জিহ্বা ও উপস্থ ইন্দ্রিয় ভোগের প্রধান দ্বার। দুটির একটিও যদি অসংযত থাকে তাহ'লে ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না। জিহ্বা জয় জিতেন্দ্রিয়ের একটি প্রধান লক্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, শ্রীচৈতন্য ভক্তির অবতার। চৈতন্য-

দেবের জ্ঞান ভক্তি দুই ছিল। তাঁর ভিতরে জ্ঞান ও বাইরে ভক্তি। হাতীর যেমন ভিতরের দাঁত ও বাইরের দাঁত থাকে সেই রকম। একাধারে জ্ঞান ভক্তি বর কারো হয় না, অবতারদেরই সম্ভব।

সাধারণতঃ মহাপ্রভুকে কেবল ভক্তি প্রেমের অবতার বলেই ধারণা করা হয়। কীর্ত্তন গাওয়াই যেন ছিল তাঁর একমাত্র সাধন অঙ্গ। তা ঠিক নয়, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে শুনলাম।

তিনি যে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তা থেকেও বোঝা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ। কেবল লোকশিক্ষার জন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন একথা আংশিক সত্য, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণাই ছিল মুখ্য। তাই দেখি মহাপ্রভু জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ কেশব-ভারতীর নিকট আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মুরারী গুপ্ত মহাপ্রভুর প্রথম সংস্কৃতে জীবনীকার লিখেছেন—

ততঃ কিয়দ্দিনে প্রাহ ভগবান কার্যমানুষঃ।
স্বপ্নে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগত্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
সন্ন্যাস মন্ত্রং মৎ কর্ণে কথয়ামাস সুস্মিতঃ।

(মু ২।১৭)

মুরারী গুপ্তের কড়চা থেকে জানা গেল স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণোত্তম হাসি মুখে মহাপ্রভুর কর্ণে জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক সন্ন্যাসমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। এবং এরপর মহাপ্রভু নবদ্বীপ থেকে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যদের সাথে নিয়ে কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট যান। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গুরুদত্ত নাম।

এখানে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিলাম। মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না....শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। সুতরাং ভারতী ছিলেন বটে কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীই প্রথম তাঁহার ধর্ম প্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন। বোধহয় যেন পুরী সম্প্রদায় বঙ্গদেশের আধ্যাত্তিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। [হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা প্রবন্ধ]

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস গ্রহণও অদ্ভুদ। মধুর ভাবের সাধনা শেষ করে ঈশ্বরের নির্গুণ তুরীয় স্বরূপ উপলব্ধির জন্য—ভূমানন্দের জন্য ব্যাকুল হন। দৈব নির্দেশে আসেন দশনামী নাগা সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরীজী। ঠাকুরকে দেখেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উচ্চ অধিকারী বলে বুঝতে পারেন। ঠাকুর তো প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং গুরুমুখে আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ শুনে, একদিনেই নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে যান। তিন দিন এই অবস্থায় ছিলেন। গুরু বিমূঢ় ও শিষ্য প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তিন দিনের জায়গায় ১৬ মাস দক্ষিনেশ্বরে অবস্হান করেন।

আমরা চিরকাল শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ও কলহ শুনে আসছি। কিন্তু ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হয়, যার থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সৃষ্টি, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শক্তিপূজা করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথাও এ জাতীয় তত্ত্বের উল্লেখ নাই। আর হয়তো চিরদিনের জন্যই অজানা থেকে যেত যদি ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণ নিজে তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এ তত্ত্বটির স্বরূপ উদ্ঘাটন না করতেন। শ্রীম কথামৃতে একটি অপূর্ব দৃশ্য সংযোজন করে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বহু বিতর্কিত দ্বন্দ্ব অবসানের একটি অমূল্য সূত্র জগতের সামনে রেখে গেছেন। দৃশ্যটি কথামৃতের ৩খ, ১৮৮৫ ৭ই মার্চ তারিখে লিপিবদ্ধ আছে—

"হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহ্য কথা বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এখানে অপর লোক কেউ নাই সেদিন—হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি—দেহটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল। এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতণ্যও করেছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শণটি এইখানেই শেষ করতে পারতেন কিন্তু মানুষের চৈতণ্য উদয়ের জন্য, কথামৃতকারকে সম্বোধন করে আর একটি অমূল্য তত্ত্ব চিরকালের অধ্যাত্ম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুখের

কথায় লিখে দিলেন—"দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য।"

আমাদের কথা হচ্ছে, পাঠক ভেবে দেখুন—কে কথা বলছেন? এতো গুহ্যকথা কে বলছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'শক্তিরই অবতার'। ব্রহ্ম নিস্ক্রিয়। শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ কিন্তু শক্তি লীলাময়ী। জগৎ লীলায় সকলেই শক্তির অধীন। অবতার এর বাইরে নয়।

স্বামী সারদানন্দজীর লেখা ভারতে শক্তিপূজা (তৃতীয় প্রস্তাব) স্পষ্টই উল্লেখ আছে শ্রীচৈতন্যদেব অন্নপূর্ণাদেবীকে আপন ইষ্ট রূপে আরাধনা করেছিলেন। আর একটি সংবাদ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিন্নস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু আবাল্য শক্তিসাধক ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর 'অবধূত' বিশেষণটি তান্ত্রিক সন্ন্যাস নির্দেশ করে।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সর্বদাই সঙ্গে থাকত, ঝুলিতে 'নীলকণ্ঠ' শিবলিঙ্গ, বক্ষে চতুর্দ্দশ চক্রযুক্ত 'অনন্ত' নামে শালগ্রাম, জটায় 'ত্রিপুরাসুন্দরী' যন্ত্র। ত্রিপুরাসুন্দরী—ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা। এসব আজ পর্যন্ত্য খড়দহে শ্যামসুন্দরের সিংহাসনে বিরাজ করছেন, পূজা পাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এসব চিহ্নগুলি দর্শন করে শ্রীমকে বলেছিলেন, "যোগ্য সাধক এসকল যন্ত্র নিয়ে সাধনা করলে সহজেই সিদ্ধি লাভ করতে পারে।"

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভুষণ স্পষ্টই লিখেছেন—(নিত্যানন্দ প্রভু)···"তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতম পরিচালক পুরুষ হইয়াও নিজগৃহে খড়দহে শক্তি প্রতিমার উপাসনা করিতে অনুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেন না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পর থেকে সকল ধর্মমতের মধ্যেই একটা নতুন প্রাণের সঞ্চার দেখতে পাই। এই হয়তো অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে নবজাগরণ। ভারতের নবজাগরণের সূচনা করেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব। স্বামীবিবেকানন্দ ঐদিকে দৃষ্টি রেখেই বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন থেকেই সত্যযুগের শুরু। জগতে সর্ব ক্ষেত্রেই শান্তি, শৃঙ্খলা, সমন্বয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হতে চলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর জীবন আলোকে এক নতুন ভাবের সূচনা চোখে পড়ে। শাক্ত ও বৈষ্ণবরা পরস্পরকে এখন সহিষ্ণুতার দৃষ্টিতে দেখার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছেন। উভয়কে জানবার বাধাগুলি অনেক দূর হয়েছে। একেবারে দূর হয়েছে বলা না গেলেও সন্দেহের, বিদ্বেষের মেঘ কাটতে শুরু করেছে অবশ্যই দেখতে পাই।

দুটি লোকত্তোর জীবনের নিরীক্ষে তাদের শিক্ষা ও জীবন্ত উপদেশে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে, অদূর ভবিষ্যতে এক নতুন উদার মানব সমাজ সৃষ্টির সকল চিহ্নই দেখা যাচ্ছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অন্তর্জগতে সাম্প্রদায়িক বিষের নির্মূল হয়েছে—বাইরের জগতে হয়তো স্পষ্টতর হ'তে সময় লাগতে পারে; এইটুকুই যা। এই কারণেই মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার নানা অবস্থার অবতারণা করে শ্রীচৈতণ্য মহাপ্রভুর উল্লেখ করেছেন। জগতের কল্যাণ অবতারের উদ্দেশ্য। "লোকচিকীর্ষুঃ"। মোটামুটিভাবে বহু লোক বা সাধক এই দুই অবতারের পথ অবলম্বন করে সাধন রাজ্যে অগ্রসর হ'তে প্রয়াস পাচেছন ও নিজেদেরকে কৃতার্থ বোধ করছেন। 'যত মত তত পথ' যুগের অমোঘ বাণী। ঈশ্বর পথ না, মত না, ঈশ্বর জীবনের উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অবতারত্ব সম্বন্ধে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) কি ধারণা জিজ্ঞাসা করছেন।

মাষ্টার মশায় বলছেন—শ্রীচৈতণ্য আর আপনি একজন। একটু চুপ থেকে বলছেন কিন্তু 'ষড়ভুজ'-এর কি হলো! অর্থাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করছেন। অবতার কিন্তু ঐশ্বর্য্য কৈ ?

মহাপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়ভুজ দেখিয়ে ছিলেন।

"ঊর্দ্ধে দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হস্ত বক্ষে মুরলী অধর ॥
অর্ধ হস্তদ্বয়ে শোভে কমণ্ডলু দণ্ড।

*　　　*　　　*

রাম—কৃষ্ণ—গৌরাঙ্গ মাধুরী মনোহর।
কিশোর—শেখর রসময় কলেবর ॥

পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌম এই ষড়ভুজ দর্শন করেছিলেন। এর উত্তর মাষ্টার মশায় কি দিবেন? ঠাকুর নিজেই ব'লছেন, আমি যুগে যুগে অবতার—সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য। আমিই অদ্বৈত—চৈতণ্য—নিত্যানন্দ—একাধারে তিন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট

বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ইং ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই। গনুব মার বাড়ী থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। রাত পৌনে এগারটা।

ঠাকুর একটু সুজি খেলেন। অন্যান্য ভক্তরা বিদায় নিলে, মণি ওরফে কথামৃতকার মাষ্টারমশায়কে পায়ে হাত বুলাতে বলেন। চোখে ঘুম নেই, কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আহা, এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ।" কথাটা এমনই ভাবে বললেন, যেন কিছু জানতে চান।

মণি—কি আশ্চর্য, যীশুখৃষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারাও দুটি মেয়েমানুষ, ভক্ত, দুই ভগ্নী। মার্থা ও মেরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (উৎসুক হইয়া)—তাদের গল্প কি বলত?

মণি—যীশুখৃষ্ট তাঁদের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে ঠিক এই রকম করে গিয়েছিলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন।

*　　*　　*　　*

আর একটি বোন একলা খাবার-দাবার উদ্যোগ করছিল। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ করলে, "প্রভু দেখুন দেখি দিদির কি অন্যায়, উনি এখানে একলা চুপ করে বসে আছেন আর আমি একলা এইসব উদ্যোগ করছি।"

"তখন যীশু বললেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা—প্রেম) তা ওঁর ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি বোধ হয়?

মণি—আমার বোধ হয়,—তিনজন-ই এক বস্তু। যীশু,

শ্রীচৈতন্যদেব ও আপনি—এক ব্যক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"এক-এক। এক বইকি তিনি (ঈশ্বর)—দেখছ না—যেন এর উপর এমন করে রয়েছে।" এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—যেন বলছেন ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।"

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তারে কেউ চিনলি নারে। ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙ্গালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।"

গীতাতে অর্জুন বলেছিলেন—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষি নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষিমে॥"

ঋষিরা—নারদ, ব্যাস, অসিতো দেবলো, বলেছেন তুমি ভগবান, আবার তুমি নিজেও বলছো,—আর কি বলার থাকতে পারে? এমনি করেই ভগবান মানুষের বিশ্বাসের জন্য বলেন। যীশুখৃষ্ট ভক্তদের বিশ্বাসের জন্য কত বিভূতি-ই না দেখিয়েছেন। তাঁর কি দরকার? দরকার তোমাকে আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্য। আমি বলতে এসেছি, তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য বিদ্যমান—তোমরা জান না। সাপের মাথায় মণি তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ এক কথা বলছেন, তাঁকে চিনলে না কেউ, সে দুয়ারে দুয়ারে কাঙ্গালের বেশে, পাগলের বেশে ঘুরছে। এ কি উদ্দেশ্যহীন ঘোরা, না। এক উদ্দেশ্য। ঐ যে যীশুখৃষ্ট, চৈতণ্যদেব তাঁরা যেমন জীব উদ্ধারের জন্য নরলীলা করেছিলেন এও তাই।

মণির (মাষ্টার মশায়ের) মনে পড়ে এমনি একটা আত্মপ্রকাশের ঘটনা। হ্যাঁ—"আপনি বলেছিলেন—যীশুর কথা।"

শ্রীরামকৃষ্ণঃ—বলো তবে কী কী? উদগ্রীব শোনার জন্য। সত্যিই কি তবে এরা বুঝেছে আমি কে? বুঝেছে কি "আমি জগতের আদর্শ, আমাকে জানলেই হবে। আর যদি সাধনা প্রয়োজন থাকে তা আমিই করাইয়া লইব।"

মণি—উৎসাহিত হয়ে বলছেন—যদু মল্লিকের বাগানে যীশুর

ছবি দেখে ভাব সমাধি হয়েছিল। আপনি দেখেছিলেন যে যীশুর মূর্ত্তি ছবি থেকে এসে আপনার ভিতর মিশে গেল।

*　　　　*　　　　*

শ্রীরামকৃষ্ণ খুসী হলেন—আত্মস্থ হলেন, আশ্বস্ত হলেন, কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—"তা হলেই হ'ল। আর আমাকে দেখছো।"

ভগবান এমনি কত ছোটখাটো কথার মধ্যে বিরাটের ছোঁয়া মানুষকে কত ভাবেই না দিয়ে যান, কে তা মনে করে রাখে। বেহিসাবী জীবনের দিনগুলির মধ্যে এও হারিয়ে যায়। আমর এত কথা শুনেও বলে বসি—"শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে,। আমার ভিতর ঈশ্বর নবরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন।" এ কি বিশ্বাস, না সংশয়? বোধহয় এটাই জীবত্ব। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সহজে হয় না। বিশ্বাস করে আবার বলে, বটে, যদি, কিন্তু। শ্রীরামকৃষ্ণ তো কত ভাবেই বলছেন তিনি অবতীর্ণ—ভগবান। মাষ্টারমশায় এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করলেন, "সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝিয়ে ছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি?

মণি—যেন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে। ধু ধু করছে। সমুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না; সেই পাঁচিলে কেবল একটা গোল ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি সে ফাঁকটি কি?

মণি—সে ফাঁকটি আপনি। আপনার ভেতর দিয়ে সব দেখা যায়—সেই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ। বেশ হয়েছে।

এইটি নরলীলা। ঈশ্বরের যত লীলা আছে নরলীলা শ্রেষ্ঠ। বড়ই মধুর। ঈশ্বর মানুষ হয়ে না এলে ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম, কে আপন জনের মত করে শেখাবে।

Sir Humphrey Davy তার বইতে লিখেছেন, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ বুঝতে পারে না। Divine truth must be made human truth to be

appreciated by us. তাই অবতার প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গোল ফাঁকটি দিয়ে দেখে একজন খৃষ্টান ভক্ত, নাম মিশ্র। শ্যামপুকুরে সমবেত রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীদের বলছেন, "ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আর এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর।....আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি। এখন সাক্ষাৎ দেখছি।

মিশ্র খৃষ্টান। সাহেব পোষাক, ভিতরে গেরুয়া। এখন সংসার ত্যাগ করেছেন। ইনি কোয়েকার সম্প্রদায় ভুক্ত।

মিশ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন ঈশ্বর বলছেন তেমনি বলছেন মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর। আর সেই ঈশ্বরকে তিনি দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপধারী মানুষটির মধ্যে।

মিশ্র দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলতে বলতে সমাধিস্থ হলেন, ফিরে এসে মিশ্রের সাথে—শেক্ হ্যাণ্ড (হস্ত ধারণ) করে হাসছেন। বলছেন—"তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।"

মিশ্র ভাবছেন—এই তো তাঁর ইষ্ট যীশু সামনে দেহ ধারণ করে দাঁড়িয়ে—"করজোড়ে বলছেন, আমি আমার মন প্রাণ শরীর সব আপনাকে দিয়েছি।" (১৮৮৫,৩১ অক্টোবর কঃ মৃ ৩ খণ্ড)

"নরলীলায় বিশ্বাস করতে হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, অবতারে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। যীশু অবতার যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে, আমার অনেক জন্ম হয়েছে, তোমারও হয়েছে। আমি কিছুই ভুলি না, তুমি জন্মজন্মান্তরের কথা ভুলে গেছ। যে যোগের কথা বলছি গীতায় এসব পুরানো। অনেক যুগে অনেক বার বলেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি-কৃষ্ণের (ক্রাইণ্ট) দলে ছিল। যখন যীশু অবতার হয়ে পৃথিবীতে নরলীলা করে গেছেন এরা দুজনে তাঁর পার্ষদ ছিল। যে যার সে তার যুগে যুগে অবতার।' এরা কলমির দল। এক জায়গায় টান পড়লেই, সবটা আসে। লীলা আর নিত্য অভিন্ন স্রোত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বামী সারদানন্দের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ, যিনি (তাঁর শরৎ) রোমে st. peter গির্জা দেখে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মনে পড়ে গিয়েছিল পুরানো দিনের স্মৃতি, আপন সত্তা।

এটি শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুর এক অভিনব মানব লীলার সাক্ষ্য বহন করছে।

এর থেকে আমরা একটি চরম সত্য পেলাম। জীবন ও জগত সম্বন্ধে চিরন্তন সত্য এক ও অভিন্ন—অবতার পুরুষরা এক সত্যেরই বিভিন্ন বিকাশ। অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রের ছোট বড় ঢেউ কিন্তু একই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশু উভয়েই এক কথা বলেছেন, পবিত্র আত্মারাই ধন্য, কারণ তারাই ঈশ্বর দর্শন করবে।

স্বামী বিবেকানন্দের কথার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করছি—"পবিত্র আত্মারাই ধন্য'—এই উপদেশটির মধ্যেই সমস্ত ধর্মের সারবস্তু নিহিত রয়েছে। সকল ধর্মশাস্ত্রের বিলুপ্তি ঘটলেও একটি উপদেশ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখবে।" শুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্ত—আত্মাস্বরূপ—এ তত্ত্বের উপলব্ধি ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আর কোন কাজ ছিল না; তেমনি ছিল না যীশুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মা ছিলেন অভেদ, তেমনি বলতেন যীশু আমি আর আমার পিতা অভেদ।

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ॥

বুদ্ধদেবকে অনেকেই rebel child of Hindu Religion বলেছেন। আবার অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম একটা আলাদা ধর্ম। হিন্দুধর্মের শাখা ধর্ম নয়। কারণ খুব একটা দূরের নয়। হিন্দুধর্ম ঈশ্বর বিশ্বাস করে, প্রতিমা পূজা করে, সর্বোপরি বেদাশ্রিত ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম অপর পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, প্রতিমাপূজার বিরোধী, আর বড় কথা বেদকে মানে না। শাস্ত্র, আত্মা, ঈশ্বর এসব ওদের নেই। তবে কি আছে? গোতম বুদ্ধ বলতেন, একটা তীর এসে একজনের শরীরে বিদ্ধ হলো, ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছে, তখন তুমি কি বিচার করতে বসে যাবে, কোন দিক থেকে তীর এলো কতটা ক্ষত হলো, কে এমন করলো, না তাকে আরাম দেবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করবে? তাই শাস্ত্র বিচার, ঈশ্বরের তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জরা-ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে কি করলে রেহাই পাওয়া যায় তাই

করতে হবে। মানুষের ত্রিতাপ জ্বালার কারণ হিসাবে বুদ্ধ বললেন, মানুষের বাসনা। বাসনাতেই আগুন দিতে হবে। নির্মূল করতে হবে। তবে-ই নির্বাণ লাভ। নির্বাণ বলতে তিনি বলেছেন বাসনার বীজ-নাশ। বাসনা সকল দুঃখের কারণ। বাসনা নাশ হলে—যা রইল তাই নির্বাণের জ্যোতি, বা আনন্দ। এইটি বুদ্ধের বাণী।

এই আনন্দের সন্ধান সকল ধর্মের মূল কথা। বেদ উপনিষদ এই কথা-ই নানাভাবে বলেছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ ঘনরূপ—তিনি সাকার নিরাকার সব-ই হতে পারেন। যে যেমন উপলব্ধি করেছেন—তেমনি ব্যক্ত করেছেন। অভিব্যক্তির বাণী বা বর্ণনাই শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষকে শান্তির অধিকারী করা। শাস্ত্রে পন্ডিত করা নয়। বেদান্ত বলেছেন, জ্ঞানের উদয় হলে-ই অজ্ঞানতা দূর হয়। অজ্ঞানতাই সকল দুঃখের কারণ। আলো এলে অন্ধকার থাকে না, তা যত-ই গাঢ় হোক। চাই আলো। বুদ্ধের নির্বাণ আর বেদান্তে জ্ঞানের আলো পার্থক্য ভাষায়—নির্বাণ বাসনা পুড়িয়ে নির্মূল করে, দুঃখ দূর করে শান্তি আনে। বেদান্তের, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জগৎ ভ্রান্তির মায়া, সত্যের আলোতে মায়া, যা অসত্য, অনিত্য তা দূর হয়ে যায়। ফলে প্রাণে নেমে আসে শান্তি, আনন্দ। দুঃখের কারণ অপসারিত হলে, সে স্থান শূন্য থাকে না, দুঃখের উল্টোটা শান্তি সে স্থান পূর্ণ করে। মানুষ স্বভাবত পূর্ণ। দুঃখ আরোপিত। যেমন জগৎ ব্রহ্মে প্রতিভাসিত—তার নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। জগৎ. গম্ ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করে হয়। যা কেবলই চলে, সরে সরে যাচ্ছে, স্থায়িত্ব নেই, তাকেই মায়া বলা হয়েছে শাস্ত্রে। বুদ্ধের নির্বাণেও এই উপলব্ধি, বেদান্তের অনুভূতিও একই কথা বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দর্পণে যখন গোতম বুদ্ধকে দেখি তখন মনে হয় বুদ্ধদেবের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হয়েছে। কেন তাঁকে বিদ্রোহী বলা হয়েছে তার কোন প্রকৃত যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অবতার বলেছেন। "তাঁর মুখেই শুনি ;

"বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর

একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্ম জ্ঞান হয়, তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।" (কঃ মৃঃ ৫খ ১৮৮৪, ২৪শে মে)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুদ্ধদেবকে অবতার বলেছেন। কিন্তু হলে কি হবে। আমরা শুনে আসছি, কতকাল ধরে বুদ্ধদেব নাস্তিক। অবতার বলব আবার বলব নাস্তিক।

কাশীপুর উদ্যানবাটী। মহাজীবন নাটকের শেষ অঙ্ক। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার পালা এবার। শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ। ৯ এপ্রিল ১৮৮৬।

কথামৃতকার, মাষ্টারমশায়, নরেন্দ্রনাথ আরও অনেক যুবক ভক্ত উপস্থিত। কথা হচ্ছে, বুদ্ধদেবের। নরেন্দ্রনাথ সবে বুদ্ধগয়া থেকে ফিরেছেন। যে বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেব তপস্যা করে নির্বাণ লাভ করেছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নতুন বৃক্ষ হয়েছে দেখে এসেছেন।

মাষ্টারমশায় নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করছেন—বুদ্ধদেবের মত কি ?

নরেন্দ্রনাথ—তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নাই। তাই সকলে বলে, নাস্তিক। কথাটা শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে-ই হচ্ছিল—তিনি কথা বলতে পারছেন না, কষ্ট হচ্ছে তবু ইঙ্গিত করে বলছেন—"নাস্তিক কেন ? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান ? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে—তাই হওয়া—বোধ-স্বরূপ হয়া না।

এ তাঁর-ই খেলা—নতুন একটা লীলা। নাস্তিক কেন হ'তে যাবে ? যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, যে যাকে চিন্তা করে সে তাঁর সত্ত্বা পায়। কুমুরে পোকা আরশুলা চিন্তা ক'রে ক'রে আরশুলা হয়ে যায়। ঈশ্বরের চিন্তা করলে ঈশ্বর হয়ে যেতে হয়। তা না হলে জপ, স্মরণ, মনন, ধ্যান এসব কেন ? মনকে যেমন ভাবে রাখা যাবে মন তাই হয়ে যাবে। সৎ সঙ্গে সৎ, অসৎ সঙ্গে অসৎ। মন

ধোপা ঘরের কাপড়ের মত। যে রঙে ছোপাতে চাইবে হ্য়ে পড়ে। বোধ-স্বরূপকে চিন্তা করে বুদ্ধ হয়েছেন। কে কথা বলবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন ব্রহ্ম-ই একমাত্র বস্তু যা উচ্ছিষ্ট হয়নি। অর্থাৎ কেউ মুখে তাঁকে বর্ণনা করতে পারে নি। শাস্ত্রে যতটুকু আছে, আভাস মাত্র। নুনের পুতুল সাগর মাপতে গিয়ে সাগরের জলে মিলে গেল—এক সত্ত্বা। আর ফিরে এলো না। বলবে কে? কথা বলবে কে? না বলার অর্থ না জানা নয় বা তাঁকে অশ্রদ্ধা নয়। যা তাই হয়ে যাওয়া। মন যেখানে বুদ্ধিতে লয় হয়ে গেছে সেখানে এক বই দুই নাই। কথা বলবে কে?

শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের আলোতে নরেন্দ্রনাথ ভাবী কালের বিবেকানন্দ বলছেন—যারা সংসারী ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে, তারা বলছে, সব অস্তি, আবার মায়াবাদীরা বলছে—নাস্তি; বুদ্ধের অবস্থা এই অস্তি-নাস্তির পারে।

অস্তি নাস্তির তাৎপর্য ও তর্ক বিশেষ করে বুদ্ধদেব সম্পর্কে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হলো—

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির প্রতিফলনে,—"এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ; যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি-নাস্তি ছাড়া।" (১৮৮৬ ৯ই এপ্রিল—কঃ মৃঃ ৫খ)

ওঁ তৎসৎ

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে কী পেলাম ॥

লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ে গেল, গানের এক কলি, "কি পাইনি, তার হিসাব মেলাতে, মন মোর নহে রাজি"।

খুব বড় কথা। তা হোক, সেই বড় কথাকে-ই ছোট ক'রে বলি। স্বামীবিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন, "ধর্ম পশুকে মানুষ করে, মানুষকে দেবতা করে।" এতো বললাম ধর্মের কথা। কিন্তু ধর্মের সাথে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সম্বন্ধ কি?

এইটি খুঁজে পেলে-ই কথামৃত থেকে কি পেলাম বুঝতে অসুবিধা থাকবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বস্তুত কোন ব্যক্তি বিশেষের কথা না বা সামান্য সাধক সন্তেরও না। কথামৃতে যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে তা সাক্ষাৎ নর-রূপধারী শ্রীভগবানের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই কথামৃতের অমৃত কথা। এখন প্রশ্ন আসে এমন অনেকের কথা-ই তো পুস্তকারে আছে সেগুলি এ মর্যাদা পাবে না কেন? তার একটি-ই কারণ যখন বক্তব্য মানুষের সত্ত্বাকে আলোড়িত করে, মানুষকে তাঁর আত্মসন্ধানে উন্মুখ করে, মানুষ জীবনের মহৎ আদর্শকে সর্বজনীন ক'রে তুলে ধরে, অনিত্য জীবনের অন্ধকার থেকে মানুষকে অমৃতের আস্বাদ দেয় সেই কথাগুলি চিরন্তনী সত্ত্বা লাভ করে। মানুষ অমৃতের সন্ধান পায় বলে তাকে বলে অমৃত কথা। ঋষিরা বলেছেন—
"অসতো মা সৎগময়ো, তমসো মা জ্যোতির্গময়ো, মৃত্যোর মা অমৃতো গময়ো।"

কেবল কথাই নেই কথামৃতে, রামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে—রামকৃষ্ণ সত্ত্বা। রামকৃষ্ণ কথা শুনলেই, পড়লেই কথার উপরে ভেসে উঠে এক জীবন্ত মানুষ। সেই মানুষটি প্রতিটি কথার সাথে হাঁসে-কাঁদে, সুখ-দুঃখ বোধ করে পাঠকের সাথে, শ্রোতার সাথে। ভুলে যেতে হয়, আমি বই পড়ছি, ভুলে যেতে হয় কানে কথা শুনছি। বইয়ের পাতার কথা শব্দ হারিয়ে বাস্তব রূপ নিয়ে আমার-ই সাথে চলাফেরা করে। তাঁর কথা না বুঝলে বার বার বুঝিয়ে বলে। ভুল করলে শুধরে দেয়। দোষ করলে ক্ষমা করে, শাসন করে; কিন্তু আঘাত করে না। আমি যদি বার বার অন্যায় করি, তবু আমাকে ত্যাগ করে না, আমাকে নির্মল করে, উজ্জ্বল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে, সকল কালিমা ঘুচায়ে। আমি কোন কথা-ই যদি না শুনি তবু, নিজেই অপরাধীর মত দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন আমি তাঁকে চাইব, তাঁর কাছে যাব।

কথামৃত আর শ্রীরামকৃষ্ণকে আলাদা করা যায় না। কথামৃত মানে-ই রামকৃষ্ণ নিজে। বার বার ভুল করছো, ভয় কি একবার বলো—মা, আর করবো না। হয়ে গেল। এসো আমার কাছে।

কথামৃতের ডাক বা ধ্বনি অমৃতের ধ্বনি—যার কানে যাবে তাকে ফিরে দাঁড়াতেই হবে। পা আর বেচালে পড়বে না। মানুষ যখন নিজে কোন কিছুকে ধরে এগোতে চেষ্টা করে স্বাভাবিক নিয়মে নানা আপদ বিপদ বিঘ্ন আসে, আঘাত আসে। জীবন তো কারোরই একটানা সুখের হয় না। কুসুমাকীর্ণ জীবনের পথ নয়। কিন্তু কথামৃত বলছেন, আমাকে ধরো, পড়বে না। বাবা যদি ছেলের হাত ধরে ছেলে অন্যমনস্ক হলেও পড়ে না। তোমরাও পড়বে না।

রামকৃষ্ণকথামৃতে যে কথাটা খুব স্পষ্ট করে আছে সেটা যিনি পড়েন বা শুনেন তিনি জানেন,—"মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।" আগে ঈশ্বর লাভ তারপর অন্য সব। একথাটা আমরা তো শুনি, বার বার শুনি, কিন্তু ঐ শোনা না শোনার মত-ই। কারণ শুনেই ভুলে যাই। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে আর সব কিছুকেই জীবনের সার বা উদ্দেশ্য মনে করি। খাওয়া, পরা, ছাড়া জীবন ধারণের যে একটা মূল উদ্দেশ্য আছে সে কথাটা মোটেই আমল দিই না।

আমাদের জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে এটাই আমরা দৃঢ় করে নি না। উদ্দেশ্যহীন হয়ে চলছি। এদিকে নিজেরাই বলি জাহাজ যদি উদ্দেশ্যহীন হয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়, তা হ'লে দিক্ হারা হয়ে মরে। কূল আর পায় না। মানুষেরও তাই। আমরাও দেখি বয়স বেড়ে যায়, কর্মক্ষমতা কমে যায়, দেহ মনে জরা, ব্যাধি আসে তখন হায় হুতাশ করি, বলি—জীবনটা বিফলে গেল কিছুই হলো না। কিন্তু যদি নিজেরাই জিজ্ঞাসা করি কি হলো না, কি পেলাম না, তখন কিন্তু সহজ উত্তর দিতে পারি না, আমরা কি চেয়েছিলাম আর কি পেলাম না। মন কিন্তু জীবন যখন চলছিল বেশ, শক্তি সামর্থ ছিল, তখন এ হিসাব মেলাতে রাজি হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের কোন Blueprint নেই। plan নেই, তাই কি গড়তে চাইছি জানি না। মালমশলা কিছু কিছু সংগ্রহ করি জগৎ থেকে কিন্তু কেবলই ভাঙ্গি আর গড়ি, আদতে এগোয় না, বাড়ী আর উঠে না। জীবন বৃথা ব্যয় হয়ে যায়;

কিন্তু আশার শেষ নেই, বাসনা-কামনার অন্ত নেই। বাসনা কামনাকে কিভাবে চালাতে হবে, কিভাবে চালালে আমার প্রকৃত উপকার হবে, জীবন সুন্দর হবে তা জানি না। জেনে নিই না। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে প্রতিটি মানুষের জীবনের Blue print ছোট থেকে বড়, যে যেমন মাপের মানুষ প্রত্যেকের জন্য আছে একটা Plan of eife. Sanctioned plan, কারণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক মানুষের জন্য নিজে খেটে খুঁটে ছোট বড় সকল রকম জীবনের নক্‌সা, তাঁর কথায় বলি "গড়ন (mould) করে রেখেছি, অর্থাৎ ছাঁচ করে রেখেছি, তোরা তাতে ফেলে সুন্দর জীবন গড়ে নে।" "আমি রেঁধে বেড়ে থালায় খাবার সাজিয়ে রেখেছি, তোরা বসে যা! খেয়ে আনন্দ কর।"

নক্‌সা তো পেলাম কিন্তু আমার তো তেমন কোন ক্ষমতা নেই, আমি দুর্বল, বলতে গেলে কিছু-ই নেই, আমার হবে কি করে?

কথামৃত বার বার ঐ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, কথামৃতে যা কথা আছে তার সিংহ ভাগ দুর্বলের জন্য, সর্বহারার জন্য। সবলের জন্য আছে কম।

নিজের কথা তুলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—দেখ-নাগো, আমার-ই বা কি ছিল। আমি জন্মেছি গরীবের ঘরে, লেখাপড়া শিখিনি, সহায় সম্পদ তো কিছু-ই নেই। রাসমণির পূজারী, ৭ টাকা মাইনে। আমার থেকে তোমাদের সকলের-ই বেশী আছে। এই মূলধন নিয়ে আমি জীবন শুরু করেছি। কিন্তু আমার কি ছিল, আমি জানতে চেয়ে ছিলাম এ মানুষ জীবনের অর্থ কি? কেবলই খাওয়া, ভোগ, বিলাস তারপর মৃত্যু, না এর কিছু বিশেষ অর্থ আছে? আমি জানতে চেয়েছিলাম এ বিরাট বিশ্বে যা ঘটছে সব কিছুর একটা কারণ আছে, তেমনি জগতেরও একটা মূল কারণ আছে, সৃষ্টিকর্তা আছেন।

আমি শুনেছিলাম ঈশ্বর আছেন,—দেখেছি মন্দির, মসজিদ, গীর্জাতে মানুষ যায়, সেখানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—কিন্তু কৈ কেউ তো বলে না তাঁকে দেখেছি—দেখা যায়—দু একজন মাত্র—রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের মত পাগল বলেছেন—জগতের মা আছেন। কিন্তু যদি মা থেকে থাকেন আর যদি তাঁকে

জানলে-ই তাঁর কাছ থেকে সব চাওয়া পাওয়া যায় তখন তাঁকে-ই তো চাওয়া ও পাওয়া প্রথম দরকার। আর যদি না থাকেন তবে পূজা, মন্দির, উৎসব এসব মিথ্যা। মিথ্যার জন্য মানুষ কেন শুধু-ই বলে ঈশ্বর, তার কাছে প্রার্থনা করে কাঁদে। আমার মনে হয়েছে মুনিঋষিরা, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত, গীতা সব কি মানুষকে ঠকাবার জন্য? সাধু সন্ন্যাসীদের জীবন কি তবে মিথ্যাকে কেন্দ্র করে? মানুষ কি যুগ যুগ থেকে মিথ্যার পিছনে ছুটছে? বিশ্বাস হলো না। মনে হলো সাধারণ মানুষ বলেছে ভগবান আছেন, দেখা যায় না, অসাধারণ মানুষ, সাধুসন্তরা. শাস্ত্র বলছেন, ঈশ্বর আছেন তাঁকে ডাকলেই দেখা যায়। তখন মনে হলো জীবন তো কোটি কোটি মানুষের-ই আছে কিন্তু একটা জীবন না হয় মহতের কথায়, পন্হায় ব্যয় করে-ই দেখি। মৃত্যু সে আছে-ই কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারে না। আমার তো কোন সম্বল নেই। তারপর ভাবলাম তাই বা বলছি কেন? ডাকলেই যদি তাঁকে পাওয় যায় তবে সে ডাক কেমন ডাক হতে হবে? যারা মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় গিয়ে ডাকে তাদের মত হলে নিশ্চয়ই হবে না, কারণ তারা কেউ তো ঈশ্বরকে পায়নি। মনে হলো হয়তো মা হারা শিশুর মত ডাকতে হবে, কাঁদতে হবে, পাগল হতে হবে। তাতে যদি দেহ যায় যাক। ওতো যাবে-ই। জগতের মা-কে বললাম, তুই যদি থেকে থাকিস দেখা দে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বলেছে তুই আছিস। তবে আমাকে দেখা দিবি না কেন? আমি তো তোর ছেলে। দেখা দিতেই হবে। এই কাঁদা যখন সত্য-ই জগতের সকল ধ্বনিকে ভেদ ক'রে অনাহত ধ্বনির সাথে মিলেমিশে এক হ'য়ে গেল, নিজ সত্ত্বাকে তুচ্ছ ক'রে মাতৃসত্ত্বায় বিলীন করে দিতে গেলাম দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের হাতের খাঁড়া দিয়ে, মা এলেন, দেখা দিলেন, কোলে তুলে নিলেন। এই তো আমি। সব সত্য হলো, আমি সত্য, জগৎ সত্য, জগতের মা সত্য, মায়ের জন্য ছেলের কান্না সত্য, আমার সকল চাওয়া, পাওয়া সত্য হলো।

আমি অগ্নি পরীক্ষা থেকে ফিরে এলাম—সকল মানুষের সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত করে। ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঋষিরা মিথ্যা

বলেন নি, "আমরা সেই প্রাচীন মহান পুরুষ ঈশ্বর-কে দেখেছি।" তোমরাও তারই সন্তান। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আজ আর সন্দেহ করার উপায় নেই, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে বসে। কথামৃতে এই দৃঢ় নিশ্চয় যারা বুক ভরা আশার কথা আছে।

ঈশ্বরকে চাওয়ার সাথে জগতের পাঁচটা জিনিষ চাওয়ার কোন পার্থক্য নেই। আমরা যেটা ব্যাকুল হয়ে চাই সেটা পাই। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে চাইলে পাওয়া যায়। কথামৃত এই উপায়টি বার বার আমাদের বলেছেন।

কথামৃতে পেলাম আত্মপ্রত্যয়, অভয় আর এগিয়েচলার প্রেরণা,। থেমে থাকা নয়। চলা দৃঢ় পদে সামনে দৃষ্টি স্থির রেখে। জীবন সমস্যার সমাধান জগতের বস্তুতে নেই আছে ঈশ্বর লাভের মধ্যে। বিষয়বস্তু ক্ষণিক আনন্দ দেয় দুঃখ দেয় বেশী এইটি শাস্ত্র, সাধুরা বার বার সাবধান করেছেন। জীবনধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আর তার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় ভোগ নয়। ঈশ্বর আনন্দ লাভ। ভূমানন্দ, ভূমির আনন্দ না। কথামৃত নিত্য সঙ্গী, আপদে বিপদের বন্ধু। পাশে পাশে থেকে, কানে কানে সৎ পরামর্শ দেয়—বলে এটা কর, ওটা করো না। কথামৃত মানুষের বিবেকবাণী। সেই বাণীর উৎস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। ভুল হবার জো নেই।

কথামৃত বলছেন, আমি গতিহীনে গতি দি। তুমি আমার কথায় ভরসা রেখে পা বাড়াও—তুমি এক পা এসো আমি দশ পা আসবো।

ধর্ম তো ধরে থাকা, ধরে চলা, ধরে বাঁচা। কথামৃত বাঁচার ধর্ম, চলার ধর্ম, দেবতা হবার ধর্ম।

ভাগবত ধর্ম আশ্রয় ক'রলে, এমন কি চোখ বুজে রাস্তা চল্লেও পড়ার ভয় নেই; তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সব অমৃত। একটু মুখে গেলে-ই মানুষ অমর হয়।

তবে আমরা কি অমর হয়েছি? এ প্রশ্ন থাকবে। থাক। অমর যে হবে, সে কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য ব্যস্ত হবে না। সে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

তাই শুরুতে বলেছিলাম—"কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মনমোর নহে রাজি।"

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কে তিনি!

"অন্ধকারের উৎস হ'তে
উৎসারিত আলো
সেইতো তোমার আলো।

* * *

'নিরখি তব কৃপায়

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বের জীবন্ত বিগ্রহ।

(২) মানবতার প্রতিনিধি।

(৩) সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও চিন্তার প্রতীক।

(৪) তিনি সর্বদাই স্বমুখে থাকতেন, তাঁর মুখোস ছিল না।

(৫) তাঁর দোর খোলা, গল্প হাসি নৃত্য গীত অভিনয় কিন্তু কম্পাসের কাঁটার মত ভগবানের দিকে স্থির।

(৬) নিত্য নবীন—জীবন প্রেরণার নিত্য উৎস।

(৭) তিনি পাঠকের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলছেন।

(৮) উচ্চারিত শব্দের মধ্যে তিনি নতুন জীবন চেতনা দান করতেন যা শ্রোতাদের আত্মাকে স্পর্শ করতো।

(৯) শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী।

(১০) সাধক চূড়ামণি।

(১১) কামিনী কাঞ্চন বিজয়ী।

(১২) এ শতাব্দীর লোক রক্ষার সেতু।

(১৩) ভাব-সমন্বয়ের সাগর।

(১৪) প্রকৃতির শিশু তিনি।

(১৫) শ্রীরামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক।

(১৬) শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বমানব।

(১৭) আগন্তুক ভাব বিরোধগুলি ব্রহ্ম বিজ্ঞানে মিলিত করে লোকরক্ষার উপায় করে গেছেন।

(১৮) শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি ব্যক্তিরূপ-গবাক্ষ যার মধ্য দিয়ে জগত ও ঈশ্বর দুই স্পষ্ট দেখা যায়।

(১৯) তিনি একটি অমূর্ত, অনাম, অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সত্য।

(২) জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—যাকে দেখলে বা জানলে-ই শ্রেষ্ঠ লাভ হতে পারে—অন্য কিছু সাধনার প্রয়োজন নেই ; থাকলে তিনি-ই করিয়ে নেবেন।

(২১) যিনি ভূমিকে আর ভুমা-কে এক করে গেছেন।

(২২) যার কথায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয়। ভব ব্যাধি তো অচৈতন্য থেকে। তাই তাঁর একটি আশীর্ব্বাদ "তোমাদের চৈতন্য হোক" অভিনব জাগরণের আশীর্বাদ।

(২৩) শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সভ্যতার সংজ্ঞা বদলে দিতে—তাইতো স্বামীজী বললেন আধ্যাত্মিকতার বিকাশ-ই সভ্যতা।

(২৪) তিনি কেবল হিন্দু ধর্মের শাখা-প্রশাখায় নয়, বিশ্ব ধর্মের বিচিত্র ধারায় অবগাহন করেছিলেন।

(২৫) মানুষের অপূর্ণতা তার ইন্দ্রিয় চর্চার আসক্তিতে, তাঁর ছিল অদৃষ্টপূর্ব ত্যাগ বৈরাগ্য—এমন "বঞ্চন কাম-কাঞ্চন"—এমন "অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ" আর কোথাও দেখা যায় না।

(২৬) তাঁর জীবন একটি মহান পরিপূর্ণ জীবন। শরীর মন ও আত্মার এমন সঙ্গতি দেখা যায় না। এই মানুষটির মধ্যে মানব সত্ত্বা ও ঈশ্বর সত্ত্বা এক হয়ে গিয়েছিল। ব্যবহারিক জগতকে পারমার্থিকের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন! তাঁতে ঈশ্বর প্রেম ও মানব প্রেম একাকার হয়ে গেছে। তিনি তাঁর আশ্চর্য চোখ দিয়ে যা কিছু দেখেছিলেন, আর আশ্চর্য কান দিয়ে যা কিছু শুনেছেন সব একত্র করে মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি নিজে-ই নিজেকে শিক্ষিত করেছেন।

(২৭) তাঁর জীবন সর্ব শাস্ত্রের সার। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলে গেছেন, "ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে হলে ঠাকুরকে বোঝ।"

(২৮) "আমি ও আমার"—এই বোধ অজ্ঞান। ঠাকুরের "আমি" ছিল না।

(২৯) সত্যযুগ ছিল জ্ঞান প্রধান। ত্রেতা কর্ম প্রধান। কর্ম ব'লতে যাগযজ্ঞাদি কর্ম। দ্বাপরে জ্ঞান ও কর্মের মিশ্রণ। আর কলি ভক্তি প্রধান। দ্বাপরে ভক্তির অঙ্কুর, যেখানে একটু বেড়েছে, কলিযুগে সেটি পল্লবায়িত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলেছেন—"আমি ভাত রান্না করে গেলুম, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা। আগুন জ্বালিয়ে গেলুম তোরা এসে আঁচ পুইয়ে নে।" "ছাঁচ তৈরী করে গেলুম তোরা এই ছাঁচে নিজেদের ঢেলে নে।"—তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের গন্তব্য, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন আমাদের পথ। তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে জানতে পারি মানুষের লক্ষ্য কি—প্রেরণা পাই সেই লক্ষে এগোতে, "Only the blind can not see, or the perverted will not see or—স্বামীজী বলেছেন। অন্ধ হয়ে বসে ভাববো, অন্ধকার, অন্ধকার —দুঃখ করবো কী যুগে জন্মেছি। তা-নয় চোখ খুললে-ই দেখব আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। ভয়ঙ্কর নয়,—মনের দরজা জানলা খুলে দেখতে হবে আলো দুয়ারে এসেছে—জাগো বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন হাত বাড়িয়ে ডাকছে—একটু চেষ্টা করলে-ই দেখতে পারি, হাত বাড়ালে-ই ধরতে পারি। একটু চাঙ্গা হতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে—গানে আছে, "রামকৃষ্ণের কৃপায়, বিবেকানন্দ বিলায়, ভক্তি মুক্তি বিনামুল্যে কে নিবিরে আয়।"

জীবনে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, বরণ করতে হবে অন্তরে, তিনি আশা করেন আমরা যেন তাঁকে চাই, তাঁকে নিমন্ত্রণ করি ঘরে আসন পেতে। ঘরে ঘরে পুজো হবে তো বলে-ই গেছেন। সেই অর্ঘ্য সাজাতে হবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে অন্তরে। সব দিতেই তাঁর আসা। বলছেন—মা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করিস নি, আমি ভক্তদের সাথে কথা কব। দরকার আমাদের চোখের জলে হৃদয় পরিষ্কার করে তাঁর আসন করে দেয়া। তার জন্য অপেক্ষা করা, কখন তিনি আসবেন।

(৩০) তাঁর ছিল দুর্বার আকর্ষণ। কারণ একটাই তিনি অবতীর্ণ ভগবান। বিশেষ কোন গুণের জন্য তাঁর আকর্ষণ নয়, কারণ তিনি সর্বাত্মা। আত্মাস্বতঃ প্রিয়। এ হল অবতারের বৈশিষ্ট্য।

(৩১) আর একটি বৈশিষ্ট্য, না দেখে, না জেনে কেবল কানে শুনে তাঁকে ভালবাসতে হচ্ছে। আমরা সাধারণত মানুষকে কখন ভালবাসি—তাকে জানার পর। "না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল।" কেবল নাম শুনে দিন যত যাচ্ছে তত-ই এই লক্ষণ বাড়ছে। মানুষ বাদুলে পোকার মত আলো দেখে ছুটে

আসছে। কারণ নামের মধ্যে-ই নামী আছেন। তাঁর প্রেমময় সত্ত্বা মিশে আছে।

(৩২) তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র হৃদয়ের সব ভাব-ই রূপে পরিণত করতে পারতেন। বলেছেন নন্দলাল বসু, শিল্প দীপঙ্কর।

(৩৩) বর্ত্তমানের একটি প্রবণতা হলো, ভারতে ও পাশ্চাত্যে উভয় দেশে-ই ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্ক বর্জিত সৎপথে জীবন যাপন।

এদের মতে সমাজের হিত সাধন, সমাজ সংস্কার বিধান করা-ই যথেষ্ট; ঈশ্বর আত্মা ও পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে বৃথা চিন্তা অবান্তর, কারণ এ সকল দুর্জ্ঞেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে এ আদর্শ ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। তাঁর জীবনের শিক্ষায়, প্রথমে ঈশ্বর তারপর জগত। যেমন যীশু বলেছিলেন 'প্রথমে স্বর্গ রাজ্যের সন্ধান কর বাকি সব পরে আপনি-ই আসবে।' মানুষের অন্তরে ঈশ্বর-রত্ন আছেন, জীবনে সর্বাগ্রে তাঁকে-ই জানতে হবে।

একমাত্র সামাজিক কর্ত্তব্য বা মানব প্রীতি সাধন করলে ই আমাদের অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না—মানুষের খাওয়া পরার উর্দ্ধে এক অতিন্দ্রিয় জীবন সত্ত্বা আছে, তাকে সে লাভ করতে চায়। মানুষ অমৃত সন্ধানী॥

(৩৪) সংসার ত্যাগ না ক'রেও সাংসারিক কর্ত্তব্য ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে মন রেখে করা যায়।—অন্তরে বৈরাগ্য ও প্রশান্তি বজায় রাখা অসম্ভব না। যে ঐশী শক্তি আমাদের জীবন, কর্মক্ষমতা ও সত্ত্বা নিয়ন্ত্রণ করছে তার উপর নির্ভরতা অভ্যাস করতে শিক্ষা করা।

(৩৫) ঈশ্বর সাধনা ও নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবা উভয়কেই সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর জীবনের শিক্ষা নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ।

(৩৬) তাঁর সমগ্র জীবনটি ছিল মানুষের হিতের জন্য একটি যজ্ঞস্বরূপ। বলতেন, ওরে আমি মহানন্দে শতবার জন্মাবো এবং এইরূপ সাবু খেয়ে দিন কাটাবো—যদি একজনকেও সংসার যন্ত্রনা হতে রক্ষা করতে পারি। দেহের কথা কখনো ভাবেন নি।

(৩৭) দীনতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। আগেই তাঁর নমস্কার না পেয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পেরেছেন একথা কেউ গর্ব করে বলতে পারবেন না। ধর্ম জীবনের বাহ্যানুষ্ঠান তিনি স্বীকার করলেও বড় মেনে চলতেন না। মনে করতেন যতক্ষণ না ভিতরে ব্রহ্ম জ্ঞানাগ্নি জ্বলে উঠছে ততক্ষণ প্রবর্ত্তকের পক্ষে এগুলি কিছু সহায়ক। তাঁর ভিতরে শক্তির কি আশ্চর্য প্রকাশ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পন্থায়। সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবন গতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবন একটি নির্ভরযোগ্য পথ বিবরণী।

(৩৮) তিনি প্রথম ধর্মের সহাবস্থানের অধিকার স্বীকার করেছেন। পারমার্থিক বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্টের স্বাধীনতা রয়েছে। 'যত মত তত পথ'। বিশ্ব-ব্রহ্মবাদ, ঈশ্বর সব-কিছু তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। এইটি বিশ্বধর্ম।

(৩৯) শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নূতন ধর্ম প্রবর্ত্তন করেন নাই, তিনি সনাতন হিন্দুধর্মকে সাধনা দ্বারা জীবন্ত করে তাকে আরো জোরালো করেছেন আমাদের শ্রবণগম্য করার জন্য। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বেশ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর জীবন, "অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন দর্শণ" 'Life in the perspective of the Eternal.'

(৪০) মানব জাতির ভবিষ্যৎ আশা শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের মহত্ত্ব ও মানুষ ও ঈশ্বরের একত্ব ছিল তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি। মানুষে-মানুষে একটি নূতন সম্পর্ক গড়ে তোলবার উপাদান হলো তাঁর জীবন। মানুষ শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীব নয়—তাঁর সত্ত্বায় নিহীত গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারলে, দ্বেষ হিংসা হানাহানি দূর হয়ে যাবে। একই সত্ত্বার বিচিত্র বিকাশ দেখতে পাবে। এই সব মানুষ ঈশ্বর, সব মানুষের মধ্যে-ই ঈশ্বর আছেন এই সোণার সূত্র বুঝতে পারলে—দুই তো থাকবে না, থাকবে না বিদ্বেষ ব্যথা বিষ উদ্গীরণ। এইটি-ই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন। তখন দেখতে পাবো স্বামীজী যে বলেছেন, ভারতের আদর্শ ত্যাগ ও সেবা সেটা কথার কথা নয় সেটা স্বাভাবিক।

One world, one community. A new order of humanity. তখন সম্ভব হবে।

(৪১) তিনি হচ্ছেন পূর্ণপাত্র—ভগবানের পরিপূর্ণ বিগ্রহ। তাঁর জন্ম "লোকান চিকীর্ষা"—লোক অনুগ্রহ করবার ইচ্ছা।

(৪২) তিনি ছিলেন ধর্ম সম্বন্ধীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার গবেষণাগার। একটি জীবন্ত বিশ্বকোষ।

(৪৩) শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন তাঁর লীলা এবং তাঁর অস্তিত্ব ছিল ঐশ্বরিক।

(৪৪) সর্ব বিরোধের মধ্যে ওতপ্রোত মিলন সূত্র-কে খুঁজে বার করার জন্য তিনি এসেছিলেন। তাঁর জীবন প্রকৃতপক্ষে দলে দলে পরিপূর্ণ একখানি বিকশিত মিলন সহস্রদল পদ্ম।

(৪৫) জগতের সকল অনির্দিষ্টতাকে তিনি তাঁর বিচিত্র সাধনা দিয়ে সুনির্দিষ্ট করে গেছেন। ব্রাত্যজনের বন্ধু পরমাত্মীয়।

॥ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানুষী শ্রীবিগ্রহ ॥

ওঁ তৎসৎ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানুষী বিগ্রহখানার কথা বলছিলাম। বলেছি 'শ্রীবিগ্রহ'। শ্রী শব্দের অনেক অর্থ। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, লক্ষ্মীমন্ত। এক কথায় যা কিছু সুন্দর। আবার যা সুন্দর তা সৎ। 'সত্যং শিবম্ সুন্দরং'। 'Truth is beauty, beauty is truth.' ইংরেজ কবির কথা। তা হলেই, শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ খানা সর্বশ্রীমণ্ডিত। চিন্ময় বিগ্রহ।

কিন্তু, দেখতে সাধারণ মানুষের মত, কোন বিশেষত্ব নেই। মনে হয় বটে অতি সাধারণ, ভাল করে দেখলে বোঝা যাবে সাধারণ অসাধারণ কোন কথা দিয়ে এদেহের গঠন বোঝান যাবে না। এদেহের কাজকর্ম, ধর্ম, চলন বলন, দেখাশুনা সবই আলাদা। শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, বলুন, "স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা····কিং প্রভাসতে।"—স্থিত, প্রজ্ঞ যারা হন তাদের চালচলন, বলা কওয়া নিশ্চয়ই আলাদা রকমের!

শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল স্থিত প্রজ্ঞই নন, তিনি অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। মানুষের রূপে অরূপ সচ্চিদানন্দ স্বয়ং। ঐ বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। যার থেকে অবতারের সৃষ্টি, সৃষ্টি জগতের, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের।

এ কথা কে বলবে! আমরা শুনবো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তিনি নিজে কি বলেছেন।

১৮৮৫ ৯ই আগস্ট মহিমা চরণকে বলছেন ;

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আপনাকে অনেকদিন বলবার ইচ্ছা ছিল পারি নাই—আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে!"

"আমার যা অবস্থা আপনি বলেন, সাধন করলেই ওরকম হয়, তা নয়। এতে (আমাতে) কিছু বিশেষ আছে।"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কথা কয়েছে শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে।

বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—তারপর কত হাসি। খেলার ছলে আঙ্গুল মটকান হলো। তারপর কথা।—কথা কয়েছে।"

* * *

নিজেকে দেখাইয়া "এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে।" ......"তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন।

যখন প্রথম এ অবস্থা হোলো, তখন জ্যোতিতে দেহ জ্বল জ্বল করতো। বুক লাল হয়ে যেত! তখন বল্লুম মা বাইরে প্রকাশ হোয়ো না ঢুকে যাও, ঢুকে যাও! তাই এখন এই হীন দেহ।"

"তা না হলে লোকে জ্বালাতন করতো। লোকের ভীড় লেগে যেতো—সেরূপ জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে। এখন বাইরে প্রকাশ নেই। এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধ তারাই কেবল থাকবে! এই ব্যারাম হয়েছে কেন?—এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম দেখলে চলে যাবে।

সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, মা ভক্তের রাজা হব।

এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ! একি আমার কর্ম!"

"এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন। * * এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি।"

সমাধি আমরা কি জানি! সমাধিবান মানুষ বলতেই বা কি বুঝবো? আমরা দেখি একজন মানুষ যার দেহ আছে কথা বলছেন, গান গাইছেন, নাচছেন, আবার তারপর মুহূর্তেই দেহে ফুটে উঠছে মৃতের লক্ষণ, কোন হুঁশ নেই। ঠিক যেন মৃত ব্যক্তির দেহ। দেহটা পড়ে আছে আসল মানুষটি কোথায় চলে গেছে! এমন একবার দুবার নয়। দিনে এমন কতবার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলছে। এমন একজন লোক, যিনি দিনে কত বার মরছেন আবার কতবার জীবনে আসছেন। যে দেহের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন, সে দেহ চিন্ময় বটে।

শাস্ত্রে যাকে বলে "ঊর্দ্ধে সৌরতম" মানুষটি ছিলেন তাই। সামান্য উদ্দীপণায় তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় ঈশ্বেরীয় হয়ে যেত। টাকা বা ধাতু স্পর্শ করা মাত্র তেউড়ে যেতো। স্ত্রীলোকের সামান্য স্পর্শে শরীরে জ্বালা উপস্থিত হতো।

আলো আর তার আধার যদিও এক নয়, কিন্তু আলোর গুণে আঁধার উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত হয়ে থাকে। আলোর গুণ প্রাপ্ত হয় তেমনি ঈশ্বর যে শরীরে বাস করেন সে ঈশ্বরের সকল গুণ পেয়ে থাকে। রামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন, "জড় চৈতণ্যের সত্ত্বা পায়, চৈতন্য জড়ের সত্ত্বা পায়'—দেহ আর দেহীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—ঠাকুর বিগ্রহ দেখতে-ই মানুষ বিগ্রহ কিন্তু ঐটি আবার ঈশ্বর বিগ্রহ। ইতিপূর্বে এ কথা বিশ্বাস করা ছিল অসম্ভব, আজও কি বিশ্বাস করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষী বিগ্রহ খানা, পরিপূর্ণ ঈশ্বরের বিগ্রহ! ঈশ্বরের মানুষ দেহ ইতিপূর্বে কেউ শুনেছে কি? দেখা ত দূরের কথা। কিন্তু এই সেই অসম্ভব সত্য রূপ নিয়েছে এই যুগে। রক্ত মাংসের শরীরে। মানুষের

কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, মাটি, জল, আলো হাওয়ার মতই সত্য। যদি একথা কোন মানুষ বলতো বা কোন অতি মানবই বলতো তাতেও কি কথাটা সত্য সংজ্ঞা পেত ? না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ জন্ম নিয়ে ঈশ্বরে পরিণত হয়েছিলেন, অতিন্দ্রীয় অনুভূতির অধিকারী ছিলেন। সত্যস্বরূপ, শাশ্বত সনাতন পুরুষ ছিলেন তিনি।

গীতায় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—ঋষিরা বলেছেন, বলে-ই তোমাকে আমি ঈশ্বর মনে করছি না, করছি কারণ স্বয়ং "চৈব ব্রবীষিমে"—তুমি নিজে বলছো, তুমি ভগবান। এও তেমনি একদিনের কথা, ১৪ই মার্চ ১৮৮৬, কাশীপুর উদ্যান বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তিম শয্যায় শায়িত. শরীরে তীব্র যন্ত্রনা কষ্ট, কথা বন্ধ হয়ে গেছে. একটা দানাও গিলতে পারছেন না, ভক্তদের দিকে করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ-ই শ্রীগিরীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি। তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্ত্তি) দেখছি।" নিজে-ই নিজের সত্য পরিচয় দিলেন। কোন যুগে-ই যা ঘটেনি, এযুগে মানুষ ঈশ্বরের মুখের কথায় তাঁর পরিচয় ও বিগ্রহ উভয়কেই জানতে পারলো, কোন বুদ্ধি দিয়ে না, অনুমানে নয়, তপস্যায় নয়, একমাত্র ঈশ্বরের নিজের কৃপায়, নিজের কণ্ঠে।

১৫ই আগষ্ট ১৮৮৬তে স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্র নাথ) সংশয়ের মুহূর্ত্তে শেষবারের মত বললেন—"বিশ্বাস হচ্ছে না ? রাম আর কৃষ্ণ এবার এই দেহে রামকৃষ্ণ।" রাম জানিনা, কৃষ্ণ জানিনা কিন্তু যে চৈতন্য সত্ত্বা, যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন দুই যুগে দুটি মানুষী বিগ্রহ আশ্রয় করে নরলীলা করে গেছেন—তারা-ই এবার একাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা করে গেলেন। আকাশের চাঁদকে কোনদিন হাতে পাবে জানতো না মানুষ, তা-ও—এযুগে সম্ভব হলো ! পৃথিবীর ধূলায় লুটিয়ে পৃথিবীকে চিরধন্য ক'রে গেলেন, আর এ যুগের মানুষ জানলো, ঈশ্বর কেবল কথার কথা নয়, তাঁর সাথে ঘর করা যায়, তাঁকে সকল সম্বন্ধে পাওয়া যায়, আমাদের মতই সুখ দুঃখ হাসি কান্না দুর্বলতার সাথী সঙ্গী হন ঈশ্বর।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন এই দেহে আছেন মা। মায়ের দেহ, মায়ের বিগ্রহ, লীলা বিগ্রহ।

মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজী দ্বিতীয় অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের, কৌতুক করে বলেছিলেন এক ভক্তকে, কি দেখছো মন্দিরে? ও কে জানো? মা নিজে। এবার মা এক গাল দাড়ি নিয়ে লীলাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর আবার অসম্ভব কি? তিনি সব-ই হতে পারেন। তিনি তো "মায়া মনুষ্য হরি।" "দেহ বান ইব। জাত ইব" শঙ্করাচার্য যেমন বলেছেন।

মহানাটকের শেষাঙ্ক, কাশীপুর উদ্যান বাটী। ঠাকুর অসুস্থ। পালা করে ভক্তরা সেবা করছেন, একদিনের ঘটনা, অতুল ঘোষ, গিরিশ ঘোষের ছোট-ভাই অপরাহ্নে দেখতে এসেছেন। উপরে যেতে-ই শশী মহারাজ তার হাতে পাখাখানা দিয়ে নীচে গেলেন। অতুল ঘোষ হাওয়া করতে করতে দেখছেন ঠাকুর ঘুমচ্ছেন—কিন্তু তাঁর শরীরের দুটি অংশ একটি কৃষ্ণ অপরটি রাধা। অনেকক্ষণ একই ভাব দেখলেন। ঠাকুর হেসে বললেন, কি দেখছিস?

দেখেছেন মথুরমোহন বিশ্বাস—কেবল নামে নয় প্রকৃত-ই প্রভু বিশ্বাসী। কুঠী বাড়ীতে বসে দেখছেন, ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় পায়চারী করছেন—সামনে যখন যাচ্ছেন, তখন শিব, পেছনে যখন তখন দুর্গা, ঠাকুরের বিগ্রহখানা আশ্রয় করে বেড়াচেছন।

দেখলেন গৌরীমা, ঠাকুরের সন্ন্যাসিনী কন্যা গৌর দাসী নহবতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গেছেন, দেখেন মা কাজে ব্যস্ত এই অবসরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান বেলতলায়, একি! বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডির আসনে শিব বসে, মা সারদামণি তাঁর-ই অঙ্কে উপবিষ্টা। হরপার্বতী। ছুটে এলেন নহবতে, দেখেন ঠাকুরাণী তেমনি-ই কর্মে ব্যস্ত। গৌরদাসীর জন্ম সার্থক। নরদেহে শিব-শিবানী মূর্ত্তি দর্শন হলো, তাই বলতেন, মা তুমি স্বয়ং ভগবতী এমন কি তার গর্ভধারিণীকে দেখিয়ে ছিলেন, কারা তার মা-বাবা।

ত্রেতার লীলা বোঝা কঠিন, যুদ্ধবিগ্রহ রাজ রাজার ব্যাপার। দ্বাপরে মাধুর্য্য লীলা করেছেন ভগবান কিন্তু সেখানে-ও ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি ছিল—সাধারণ মানুষের ঠিক ঐস্তরে উঠে ঈশ্বরের লীলার সাথী হওয়া কল্পনা করা কঠিন কিন্তু কলিতে একেবারে

মাটির মানুষ, সাধারণের থেকেও সাধারণ। শ্রীকৃষ্ণ গয়লাদের সাথে মিশেছেন, গোরু চরিয়েছেন সত্য কিন্তু সেই যুগে ঐটি ছিল শ্রেষ্ঠ, যা তাদের কর্ম বা লীলা। গোধন ছিল রাজ-রাজার ধন সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণের এবার লীলা হা-ঘরেদের নিয়ে। সর্বহারার যুগ। তাই যুগের ঈশ্বর এলেন নির্ভেজাল, নিরাশ্রয় সব না-ই যাদের তাদের নিয়ে। দেখ তোমরা, আমার কিছু নাই—আমি দু-হাত তুলে নাচি, বগলে—চেপে কিছু-ই রাখিনি। এমন একটি বিগ্রহ নিলেন বাংলার গ্রামের অসংখ্য মানুষের মত-ই, বিশেষত্ব কিছুই নাই—অসংখ্য মানুষ অশিক্ষিত, শিক্ষা দেখে যদি পালায়, তাই হলেন নিরক্ষর। বিষয় সম্পদ, জায়গা, জমি গোরু-গোয়াল, ব্যবসা বাণিজ্য দেখে যদি কেউ সরে থাকে—কিছু গ্রহণ করলেন না,—"আমি মার খাই দাই আর বগল বাজাই।" এই সাধারণের মধ্যে অসাধারণ বিগ্রহ, নিজের মায়ায় নিজে গ্রহণ করলেন। বললেন, আমার মেয়েদের স্বভাব, একটু গল্প-হাসি ঠাট্টা নাচ গান ফষ্টি-নষ্টি ভালবাসি, নিমন্ত্রণ খেতে ভালবাসি—তোমরা আমাকে নিজের মত করে ডাক, ঘরে নাও—দে'খছ তো তুমি আমি এক। ঐ এক যার দুই নেই, সকলকেই সেই একের আস্বাদ দিতে চান। চান সবাই সেই এক আনন্দ ভোগ করুক। ভূমানন্দ ভূমির আনন্দ নয়। জগতের আনন্দ আঁটিও চামড়ার আনন্দ।

মুখখানা ভরা একটি দিব্য শিশুর পবিত্রতা সারল্য স্বর্গীয় শোভা, কেউ সেই দিব্য আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে পারে না। প্রকৃতির শিশু—সকল বয়সেই এক। প্রকৃতি কখনো বৃদ্ধ হয় না, তাই প্রকৃতির শিশু রামকৃষ্ণ ছিলেন চির শিশু। মায়ের কোলের শিশু—আমি কিছু জানি না। আমার মা সব জানেন। সব কথা, সব সমস্যা, সব চাওয়া পাওয়া, পরামর্শ ঐ মার সাথে। যুবক রামকৃষ্ণ জগতের মাকে লাভ করেছেন—তোতাপুরী গোস্বামী এসেছেন—অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনা করাতে চান, রামকৃষ্ণকে বলেন, করবে? উত্তর সরল। আমি জানি না আমার মা জানেন। তোতাপুরী ভাবেন কি বাবা! সাধনা করবে, তাও মা জানেন! এই শিশু রামকৃষ্ণ শেষ দিন পর্যন্ত্য ছিলেন মায়ের আঁচল ধরা খোকাটি।

বিশ্বাসে ভরা মুখখানা—দেখলেই বিশ্বাস নাকরে পারা যায় না। মন আপনি-ই টেনে নেয়। তিনি যা বলেন, তা করতেই হয়, কে যেন ভেতরের মানুষটিকে বাধ্য করে। শিশু যদি কিছু চায়, বায়না ধরে কে কবে তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে? এও তাই।

একটা ঘটনাই যথেষ্ট হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ছোট ভট্টাচার্য্য, মথুর মোহন বিশ্বাস তার রক্ষক, চালক, অছি—চৌদ্দ বৎসর এমনি ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছেন। সাধনার কাল তখনও উত্তীর্ণ হয়নি—সবাই বলছে ছোট ভট্টাচার্য্য উন্মাদ হয়েছে। মথুরও মানুষ, ভাবছেন হয়ত তো বা তাই হবে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে অনেক সময় মাথার গণ্ডগোল হতেও পারে। মানুষ-বুদ্ধি ও অপরের পরামর্শ নিয়ে যান মেছোবাজারে পতিতালয়ে, সেখানে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী স্ত্রী সঙ্গে তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) রেখে নিজে চলে আসেন। শিশু রামকৃষ্ণ, পবিত্রতা স্বরূপ রামকৃষ্ণ, মা হারা বালকের মত, কেঁদে উঠেন মা, মা, কোথায় নিয়ে এলি, আমার যে ভয় করছে। তারপর সমাধি। আর যারা আসেপাশে কামের জাল ছড়িয়ে উন্মাদের উন্মাদনা দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছিল—তাদের বুক ভরে এলো মাতৃস্নেহের বন্যা। কাম-কামনা রূপান্তরিত হলো বাৎসল্য প্রেমের নির্ঝরিণীতে। সব ভেসে গেল চীৎকার করে উঠল বারবণিতার দল। তাদের নেশা ছুটে গেছে, বাৎসল্য স্নেহের আস্বাদন তারা জানে না, কিন্তু স্বর্গীয় সুধার স্বাদ পেল মা ডাকে। কে এ শিশু? হবে-ই বা আমার প্রাণের পুতুল—এই তো বাবা আমরা। পতিতালয় হলো দেবালয়, কামিনী হলো জননী—এই শিশু বিগ্রহ রামকৃষ্ণ।

সরলতার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। গিরীশ ঘোষের সাথে সবে পরিচয় হয়েছে, এখনও তেমন মেলামেশা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ, মুখুজ্জে ভাইদের সাথে ঘোড়ার গাড়ী করে থিয়েটারে গেছেন। গিরীশচন্দ্র খবর পেয়েও অভ্যর্থনা ক'রতে এলেন না। দেবেন মজুমদার ও অন্যান্যরা খবর পেয়ে গিরীশকে বল্লেন, যান—ঠাকুর এসেছেন। গিরীশ তখনও বাগবাজারের মদোমাতাল, গিরীশের শ্রীরামকৃষ্ণ রং তখনও মনে ধরেনি। উত্তেজিত হয়ে বলেন, কেন? তিনি কি কচি খোকা, না কেউকেটা কেউ, আমাকে যেতে হবে

পথ দেখিয়ে, খাতির করে আনতে। এতটা আসতে পেরেছেন, টিকিট কেটে বসতেও পারবেন। কিন্তু এত বলেও থাকতে পারলেন না কথার মত শক্ত হয়ে। এলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন, মনে হয় প্রভুই তাকে দেখছিলেন। কথা হলো না, গিরীশের অপেক্ষা না রেখে ভেতরে ঢুকে গেলেন। কিন্তু বরফের পাথর গলে জোয়ার এলো গিরিশের মনে। কি করেছি আমি, ধিক্কার দেন নিজেকে নিজে। বলছেন—দেখলাম শ্রীমুখে, একটুও অভিমান নেই, সেই আঘাতের বেদনা, যেন একটি সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল। সজল দুটি আঁখি মেলে প্রকৃতির সমস্ত করুণায় তাঁকে স্নান করিয়ে দিল ঐটুকু সময়ে, একটু চোখের পলকে। হয়তো তার বুকের মাণিক শিশুপুত্রই হবে—তা না হলে অমন করে ভৎর্সনা খেয়েও কাঁচুমাচু হয়ে পিতৃ মুখে চেয়ে থাকে চোখ ভরা করুণা নিয়ে, আর কোন বাপ পারে তাকে অবহেলা করতে। কোন বাপ তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে না নিয়ে পারে? গিরীশ কেঁদে আকুল—আমি সেই পাষণ্ড। আমি পেরেছি অযাচিত করুণার আবেদন প্রত্যাখান করতে। এই শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ। যাঁর আবেদন শাশ্বত।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলছেন, আমার বাবা জানত এ দেহের (নিজের দেহ দেখিয়ে) মধ্যে কে আছেন। গয়াতে স্বপ্ন দেখালে—"বল্লে—আমি তোমার পুত্র হব।"

হৃদের মা পা পূজা করলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ কাশীপুরে—একদল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ নেই—কাশীপুরে এসে তাঁর সামনে মিষ্টি নৈবেদ্য করে দেন। শ্রীমা শুনে বলেন, এসব কেন? এখন শরীর অসুস্থ—এতে শরীর আরও খারাপ হবে। ঠাকুর, মায়ের মনের কথা বুঝতে পেরে বলেন, দে'খগো—পরে দেখবে একে সবাই মানবে—ঘরে ঘরে এর পূজা হবে। এই সেই বিগ্রহ, আজ যার পূজা ঘর ছাড়িয়ে, মাঠে ময়দানে, ক্ষেতে-খামারে কারখানায় সর্বত্র হচ্ছে।

২৮শে জুলাই ১৮৮৫ খ্রী। শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে বলছেন—"আচ্ছা, তোমার (আমার লীলা) দেখে কি বোধ হয়? তিনজনই এক এক বস্তু, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি এক ব্যক্তি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ "এক এক, এক বই কি! তিনি (ঈশ্বর) দেখছ না যেন এর উপর এমন করে রয়েছে।" এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন—যেন বলছেন ঈশ্বর তাঁর-ই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।

আবার বলছেন সেদিন অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি কি বলেছি বল দেখি।

মণি—"যেন দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে। ধু ধু করছে, সম্মুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না; সেই পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"বল দেখি সে ফাঁকটি কি?"

মণি—"সে ফাঁকটি আপনি। আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়—সেই দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ বেশ হয়েছে।" এক সময় বললেন—"মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন।"

মণি—"লীলার মধ্যে নরলীলা ভাল লাগে," শ্রীরামকৃষ্ণ তা হলে-ই হল"—"আর আমাকে দেখছ ঐ।"

একথাই মাষ্টার মশায় বলেছেন—"ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন তাহাকে দেখিলেই হইবে আর যদি কিছু দরকার হয় তিনি করাইয়া লইবেন।"

শ্রীশ্রীমা বলেছেন "পট আর তিনি কি আলাদা।" "ছায়া আর কায়া এক।" তাঁকে দেখলেই ধ্যান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬; ১৫ই মার্চ নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ ভক্তদের বলছেন (হৃদয়ে হাত রাখিয়া) দেখছি এর ভিতর থেকে-ই যা কিছু, নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কি বুঝলি?" নরেন্দ্র (যা কিছু অর্থাৎ) "যত সৃষ্ট পদার্থ সব—আপনার ভিতর থেকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের প্রতি আনন্দে—'দেখছিস!" ঐ কথাই স্বামী বিবেকানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা" গীতিতে গাইছেন, (প্রভুর গুণকীর্ত্তণ)—"মোচন অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়, জ্ঞানাঞ্জন বিমল নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।" আবার বলছেন—"সম্পদ তব শ্রীপদ ভবগোষ্পদ বারি যথায়।"

শেষের দিনের কথা, যবনিকা পতন হলো জগত-মঞ্চ থেকে। নিজেকে যেদিন লোক চক্ষুর আড়ালে সরিয়ে নিলেন, শ্রীশ্রীমা এতদিন যিনি নীরবে ঠাকুরের সেবার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন আর থাকতে পারলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরূপ সত্ত্বা তাঁর কণ্ঠে আর্তনাদের শব্দে বেরিয়ে এলো—"মা কালী তুমি কোথায় গেলে।"

স্বামী বিবেকানন্দ কি চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষী বিগ্রহখানা দেখেছিলেন, দেখতেন—একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান করেন নাচেন এটি স্বামীজীর একটা ভয়ঙ্কর আপত্তি ছিল। তিনি বলছেন, "যখন শুনলাম ৪৫ বৎসরের এক ধুমসো মর্দ ধেই ধেই করে নাচে তখন প্রকৃতপক্ষে বিরক্তিতে মন ভরে গিয়েছিল, ভাবলুম, এ আবার কি সাধু? শ্রীচৈতন্যদেব নাচতেন গাইতেন শুনেছি কিন্তু তাতে উৎসাহিত হবার কিছু নেই।

তারপর একদিন চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভেঙ্গে চাক্ষুষ করলুম ঠাকুরের নৃত্য—"সে কি অপূর্ব মূর্ছ্না! মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিমা, সমস্ত অঙ্গ যেন ব্রহ্ম ভাবে তরঙ্গায়িত,—আনন্দ ঝরে পড়ছে সর্ব অঙ্গ দিয়ে, অমন নৃত্য—কোনদিন দেখিনি। চোখ ফেরান যায় না। সেইদিন প্রকৃতপক্ষে নটরাজ শিবের নৃত্যের তাৎপর্য্য বুঝতে পারলাম ভারতীয় নৃত্যের গূঢ় অর্থ কি? নৃত্য কি বলতে চায়। মনের ভাব অত সুন্দর প্রকাশ আর কিছুতেই বোধ হয় করা যায় না। প্রতি অঙ্গ দিয়ে ব্রহ্মানন্দ প্রবাহিত হয়ে যে বাতাবরণ সৃষ্টি করে তাতে কেউ আর নিজেকে সেই দিব্য সঙ্গযুক্ত না করে থাকতে পারে না। এ অনুভূতি আমার বহুবার হয়েছে।" একদিন যে দেখেছে সে উদগ্রীব হয়ে থাকতো আবার কবে দেখবে। তাকিয়ে দেখেছি শ্রীবিগ্রহের দিকে, দেহখানা ব্রহ্মানন্দে র'সে আছে, চোখ-মুখ সেই রসে ভেজা এই সেই 'রসবৈসঃ' মূর্ত্তি।

বুঝতে পারল ভাবীকালের মানুষ, অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীর দল ঐ রামকৃষ্ণ দেহে এতকাল কে অধিবাসী ছিলেন। মা কালীকে কেউ এতকাল দেখেনি, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে হলো তাঁর প্রথম পরিচয়। শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের আর্তনাদে। এ পরিচয় আর কে দিতে পারে, মা ছাড়া। নিজে ঠাকুর অনেকবার বলেছেন বটে কিন্তু অপরকে

জানতে হবে দেখতে হবে তবে তো লোক-স্বীকৃতি পাবে, লোকে বিশ্বাস করবে। মা দেখেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন কালী প্রসাদকে, পরবর্তীকালের অভেদানন্দকে, "দেখ এই দেহের মধ্যে সকল দেবতা আছেন—একে পূজা করলে-ই সব দেবতাকে পূজা করা হয়।"

মাকালী তো স্ত্রীরূপ, ঠাকুর পুরুষ, তবে? না। তিনি প্রকৃতি কি পুরুষ এ সঠিক কেউ বলতে পারেনি। তিনি কখনও পুরুষ কখন ও প্রকৃতি। বলেছেন—স্বামী শিবানন্দ—তারক মহারাজ, তিনি ছিলেন মা, আমরা তাঁর কোলে বসে স্তন পান করেছি। একথা বলেছেন রাখাল মহারাজ ও কালী মহারাজ।

ঐ বিগ্রহখানা এক আজব বিগ্রহ। যে যা চায় সে তাই পায়, পেয়েছে, দেখেছে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঠাকুরের সংতান পরবর্তী জীবনে প্রায়ই বলতেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ (পট দেখিয়ে) ষট্‌চক্রভেদকারী। আমি এর মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পাই। চাই দেখার একটা চোখ, দেখার মন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহে এতো সব আছে, কৈ আমরা কিছু দেখি না কেন? দেখি না তা নয়, দেখি পাঁচটা মানুষের মত একটা মানুষ শরীর কিন্তু ভাল করে খোলা চোখে যেদিন দেখতে শিখব, দেখব ও বিগ্রহ কেবল ঈশ্বর বিগ্রহ, অ-ধরা হ'য়ে জগতের মানুষের কাছে হাত বাড়িয়ে ধরা দিতে এসেছিলেন। চলে গেছেন, বলি বটে, কিন্তু যাবেন কোথায়? আছেন; থাকবেন বলে রেখে গেছেন জীবন্ত পট—যে পট কথা বলে।

উপসংহারে বলি যে কথা একদিন পান্ডব সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে ঘোষণা করেছিলেন, "ধর্মসংস্হাপনার্থায়ঃ সম্ভবামি যুগে যুগে" তেমনি বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "দেখলাম (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা বলছি।" "মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন—দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য। (৭ই মার্চ ১৮৮৫)। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ আর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আলাদা নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপূজা; নিজে নিজেকে পূজা করে জগতের মানুষের কাছে খোদ ঈশ্বরের বিগ্রহ রেখে গেলেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটী।

শরীর খুব অসুস্থ।

শনিবার ৫ই বৈশাখ, চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী। ১৭ই এপ্রিল ১৮৮৬। "ঠাকুরের সম্মুখে পুষ্পপাত্রে ফুল চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। ফুল চন্দন দিয়া আপনাকেই পূজা করিতেছেন। সচন্দনপুষ্প কখনও মস্তকে কখনও কণ্ঠে কখনও হৃদয়ে কখনও নাভি দেশে ধারণ করিতেছেন। ·······ঠাকুর আপনাকে এখনও পূজা করিতেছেন। নিজের গলায় পুষ্পমালা দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নির্মাল্য প্রদান করিলেন। মণিকে একটি চম্পক দিলেন।"

(কঃ মৃ ৪র্থ খণ্ড)

॥ শেষ ॥